# মৃত্যুকাব্য

নবারুণ ভট্টাচার্য

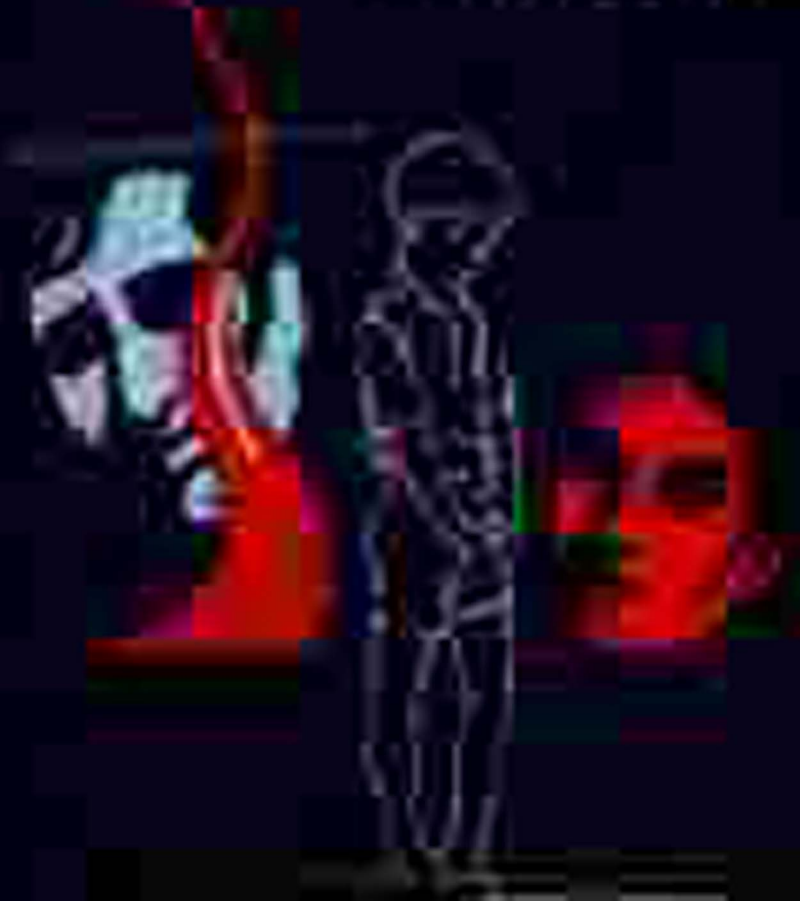

# সত্যকাম

নারায়ণ সান্যাল

কুন্ডু ব্যাক্তিগত পাঠাগার
www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

pathagar.net

আমি অবাক হয়ে বলি : বল কি প্রিয়দা, তুমিও শেষ পর্যন্ত প্রেমে পড়লে ?

প্রিয়দা হেসে বলে : প্রেমে পড়েছি তা তো বলিনি আমি।

আমিও হেসে বলি : আবার কি করে বলে মানুষে ? তোমার চোখমুখ যে বলছে সে কথা। আমি তোমার সঙ্গে পাকা চারবছর একঘরে বাস করেছি। তোমাকে আমি চিনি না ? কিন্তু তোমার মতো ভাল ছেলে—

বাধা দিয়ে প্রিয়দা বলে : গল্পটা শুন্‌বি, না বকবকই করবি শুধু—

আমি চুপ করে গিয়ে বলি : বেশ বল—

প্রিয়দা একটা সিগারেট ধরালো। আমাকেও বার করে দিল একটা। দুজনে জুত করে দুটো সিগারেট ধরালাম। বি. ই. কলেজের রি-ইউনিয়নে এসে ওভাল-মাঠের একান্তে দুটি পুরানো বন্ধু বসেছি আড্ডা দিতে। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে প্রিয়দা আবার শুরু করে : হ্যাঁ, কি যেন বলছিলাম ? আমি ফিরে এলুম আমার ঘরে। দ্বিতলে আমার জন্য নির্দিষ্ট ঘরটা তালাবন্ধই ছিল। তালা খুলে ঘরে ঢুকে দেখি—টেবিলের উপর যথারীতি কেরোসিনের সেজবাতি জ্বলছে—আজ আর আমার বিছানা কেউ সাফা করে রাখেনি। টেবিলের উপর কাচের গ্লাসে বাসিফুলের গুচ্ছটাই মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছে। বোধকরি যে আমার ঘরে নিত্য গোছান-গাছান করে, আজ বিশিষ্ট অতিথিদের আবির্ভাবে সে অন্যত্র বিব্রত। জুতো জামা খুলে ক্লান্ত দেহটা চৌকিতে এলিয়ে দেবার উদ্‌যোগ করছি হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে শিউনন্দন এসে হাজির : কুমার বাহাদুর আপনাকে সেলাম দিয়েছেন।

pathagar.net

বিরক্ত হলাম। কুমার বাহাদুর লোকটিকে ইতিপূর্বে বার দুই দেখেছি। লোকটাকে আমার পছন্দ হয়নি আদৌ। রাজার ছেলে যেমন হয়ে থাকে! দাম্ভিক, মদ্যপ এবং শোনা যায় আরও একটু আনুষঙ্গিক দোষ আছে। তবু তাঁরই গেস্ট-হাউসে যখন আশ্রয় নিয়েছি, তখন তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে হবে বই কি। জামাটা গায়ে চড়িয়ে সেদিক পানে রওনা দিতেই শিউনন্দন পিছন থেকে বললে: সাব—

কি রে?

কুমার বাহাদুরকা মেজাজ শরীফ্ নহী হুজুর!

অর্থাৎ তিনি মত্তাবস্থায় আছেন। বোধকরি এটাই এখানকার রেওয়াজ। রাজসন্দর্শনে যাবার আগে হুজুরদের মেজাজের খবরটা দূতের মুখে জেনে যেতে হয়।

কোণার ঘরের দিকে যেতে তক্‌মাধারী একজন সেপাই লম্বা সেলাম করে বাধা দিলে। সংযত উর্দুতে বললে: মেহেরবানি করে অপেক্ষা করুন। ঘরে লোক আছেন।

বারান্দায় একটিমাত্র টুল—যেটা ছেড়ে স্যালুট করেছে সেপাইটা। বসতে হলে তাতেই বসতে হয়। অথবা ফিরে যেতে হয় নিজের ঘরে। কি করব স্থির করে ওঠার আগেই পিছনে একটা ভারী পদশব্দ শুনলাম। মার্বেল পাথরের প্রশস্ত বারান্দাটা যথেষ্ট আলোকিত। কুমার বাহাদুরের আগমন উপলক্ষ্যে দেওয়ালগিরিতে সারি সারি মোমবাতির খাসগেলাস। অন্যদিনের মতো গেস্ট-হাউসটা আলো আঁধারি নয় মোটেই। তবু একজন লোক পাঁচসেল টর্চের আলো ফেলে কাকে যেন পথ দেখিয়ে আনছে এদিকে। পিছন ফিরতেই চোখাচোখি হল। আগে তাঁকে কখনও দেখিনি। প্রৌঢ় ভদ্র-লোকটির প্রতি অঙ্গে বিচ্ছুরিত হচ্ছে যে জিনিসটা তার সংক্ষিপ্ত অভিধা—আভিজাত্য। গায়ে কালো রঙের একটা শেরওয়ানি—এই জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। পরিধানে চোস্ত। পায়ে শুঁড়তোলা

নাগরা। মাথায় পাগড়ি, কপালে রক্তচন্দনের একটা বড় তিলক। আমাকে দেখে ভ্রূকুঞ্চিত করে হিন্দুস্থানীতে বললেন : কি চাই ?

সে কণ্ঠস্বরে শুধু ভারিক্কি মেজাজই নয়, কেমন যেন উপরমহলের অবজ্ঞামিশ্রিত দম্ভও ছিল। আমি ইংরেজিতে জবাব দিলুম : আপনার কাছে কিছুই চাই না। কুমার বাহাদুর আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

টর্চবাতি-হাতে যে লোকটা পথ দেখিয়ে আনছিল সে ওঁর কানের কাছে এগিয়ে এসে বললে : কাগজকলের এঞ্জিনিয়ার সা'ব।

এতক্ষণে লক্ষ্য করে দেখি লোকটা গুরুবচন মেটা। ভবানীগড় স্টেটের তথাকথিত এঞ্জিনিয়ার। এখানে আসার অব্যবহিত পরেই লোকটার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তারপর থেকে এ কয়দিন সে ছিল সম্পূর্ণ না-পাত্তা।

গুরুবচনের কথা শুনে প্রৌঢ় ভদ্রলোক এবার ইংরেজিতে বললে : ও ! তুমি একটু পরে এস।

আমি বললুম : আমার নাম সত্যপ্রিয় আচারিয়া। কার সঙ্গে আলাপচারির সৌভাগ্য হচ্ছে জানতে পারি কি ?

আমার কেতাদুরস্ত কায়দায় ভদ্রলোক একটু নরম হলেন মনে হল। বললেন : স্বচ্ছন্দে। আমার নাম বজ্রধর তলোয়ার আমি ভবানীগড় স্টেটের দেওয়ান।

অর্থাৎ ভাবখানা—হে কাগজকলের অর্বাচীন এঞ্জিনিয়ার, কখন তুমি রাজসন্দর্শনে যাবে না যাবে নির্ধারণ করে দেবার এক্তিয়ার আমার আছে। সম্ভবত ভদ্রলোক আশা করেছিলেন একেবারে ঝুঁকে পড়ে সেলাম না করলেও এ কথার পর আমি অন্তত একটা সসম্ভ্রম নমস্কার করব। কিন্তু তার পরিবর্তে যখন আমি শুধুমাত্র ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললুম—'সো গ্ল্যাড টু মিট য়ু' তখন আবার ভ্রূকুঞ্চিত হল তাঁর। আমার হাতখানা স্পর্শমাত্র করেই ছেড়ে দিলেন। আমার দিকে দ্বিতীয়বার দৃক্‌পাতমাত্র না করে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে

গেলেন কুমার বাহাদুরের ঘরের দিকে। আর আশ্চর্য, এবারও সেই তক্‌মাধারী সেপাইটি লম্বা স্যালুট করে বললে : মাপ করবেন, ঘরে লোক আছেন।

মনে হল দেওয়ানজী ফেটে পড়বেন বুঝি! কুমার বাহাদুরের মন্ত্রণাসভা যতই গোপন হোক সেখানে স্বয়ং দেওয়ানজীর প্রবেশে কোন বাধা থাকার কথা নয়। বজ্রধর এই স্টেটের মন্ত্রী,—রাজার পরেই তাঁর স্থান। বস্তুত কুমার বাহাদুরের চেয়ে পদমর্যাদা তাঁর কম নয়। জ্বলন্ত একজোড়া চোখ সেপাইটার দিকে তুলে নিঃশব্দে তিনি ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন—পালিশ-করা পেলমেটের অন্তরাল থেকে লম্ববান ভারি মেরুন রঙের পর্দাটার দিকে। আমি স্তম্ভিত হয়ে দেখলুম ঐ দুঃসাহসী সেপাইটা চট করে উঠে দাঁড়ালো চৌকাঠের উপর। খট্ করে শব্দ হল জুতোয় জুতোয়। ক্রুশবিদ্ধ যিশুর ভঙ্গিতে দুইহাত বাড়িয়ে দিল দুদিকে। দেওয়ানজীর প্রবেশের আর পথ রইল না। এক পা পিছিয়ে এলেন তিনি। ঐ ক্রুশবিদ্ধ লোকটার চাকরিই শুধু নয়, ঘাড় থেকে মাথাটাও যে এক্ষুনি লুটিয়ে পড়বে এ বিষয়ে যখন আমার আর সন্দেহমাত্র রইল না ঠিক তখনই দুলে উঠল মেরুনরঙের পর্দাটা। সরে দাঁড়ালো দ্বাররক্ষী। আর ঘর থেকে বার হয়ে এল একটি অপূর্ব বিস্ময়!

আমি বললুম : কে, স্বাতী?

আমার রসিকতাটা মাঠে মারা গেল। প্রিয়দা হয় খেয়াল করল না, অথবা সে সত্যিই তন্ময় হয়ে গিয়েছিল নিজের কাহিনীতে। ও শুধু বললে : না, মেয়েটির নাম রঞ্জনা। দেখলুম তার পরনে ময়ূরকণ্ঠী রঙের সিল্কের শাড়ি। মাথায় ঝুটো-মুক্তো জড়ানো একবেণী। সেই খাটো চোলী, কর্ণমূলে সবুজ-পাথর বসানো সেই জড়োয়া দুল। এক মুহূর্তের জন্য আতঙ্কভরা অবোধ-দৃষ্টি মেলে সে তাকিয়ে দেখল আমাদের দিকে। সে দৃষ্টি চিত্রিতা মৃগতৃষ্ণিকার সরল সারঙ্গদৃষ্টি—অতর্কিতে বিপদের আতঙ্কে আয়ত। মুহূর্তমধ্যে দৃষ্টি হল নত—দুরন্ত

লজ্জায় ওর সারাদেহ যেন থরথর করে কেঁপে উঠল একবার। স্বচ্ছ ওড়নায় বৃথাই মুখ ঢেকে ছুটে পালালো করিডোর দিয়ে—বারান্দার ও প্রান্তে। নিজের ঘরের দিকে।

আমাদের তন্ময় ভাবটা তখনও ভাল করে কাটেনি—পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এলেন কুমার বাহাদুর। তিনিও থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লেন আমাদের দেখে। বোধকরি চিত্রিতা হরিণী শিকারেই মত্ত ছিলেন এতক্ষণ। সামলে নিলেন দেওয়ানজীকে দেখে। আমাকে অবশ্য তাঁর ঘোলাটে রক্তিম চোখদুটো দেখতেই পায়নি। হঠাৎ দু'পা এগিয়ে এসে দেওয়ানজীর হাতদুটি ধরে বললেন : হোয়াট ইফ্‌ আই ক্যারি এ রিভলভর আণ্ডার মাই শ্লিভস্‌? হোয়াট ইফ্‌ অ্যাই শ্যুট ডাউন দ্যাট ডেভিলস্‌ কিংস্‌ কাজিন!

তাকিয়ে দেখি গুরুবচন নিঃশব্দে সরে পড়েছে কখন। দেহরক্ষীটিও আত্মগোপন করেছে একটা স্তম্ভের আড়ালে। আমি কি করব স্থির করে ওঠার আগেই বজ্রগম্ভীরস্বরে দেওয়ানজী বললেন : কুমার, ডোণ্ট বি সিলি।

সিলি। তুমি বলছ কি? এখনও রাজ্য খোয়াই নি আমি—আর এক ফোঁটা মেয়েটা আমার মুখের উপর বলে কি না—

কুমার!—হঠাৎ আমার দিকে ফিরে দেওয়ানজী ধম্‌কে ওঠেন—এখনও দাঁড়িয়ে আছ কেন? বললাম না পরে আসতে?

এতক্ষণে আমার দিকে নজর পড়ল কুমার বাহাদুরের। অনেক দিনের শিক্ষা। মুহূর্তে সামলে নিলেন নিজেকে। একেবারে অন্য সুরে বললেন : না না, ওকে ডেকেছি। কাম্‌ ইন প্লীজ।

দেওয়ানজী আর বাধা দিলেন না। পর্দা সরিয়ে আমরা ঘরে ঢুকলাম। নীলাভ একটা আলোয় ঘরটা মোহময়। উনবিংশ শতাব্দীর একটা চাপা গন্ধ বদ্ধঘরের আটকপড়া বাতাসে। সুদৃশ্য মোমবাতির উপর নীল কাচের ডোম। আবলুশকাঠের গোলাকৃতি টেবিলে শ্বেতাশ্ব-চিহ্নিত একটি বোতল ও কাচের পানপাত্র। একটি চীনামাটির

pathagar.net

কাজকরা পাত্রে ছোট ছোট বরফের টুকরো। সোডার বোতল। রূপার পাত্রে কিছু ভাজা। ছাইদানি। সোফার নিচে বেলফুলের একটা মোটা গোড়ে-মালা লুটাচ্ছে দামী পারশিয়ান গালচেটার উপরে। ঘরে ঢুকে আমরা আসন গ্রহণ করার আগেই কুমার বাহাদুর বললেন : জরীপের নক্‌শাটা হয়ে গেছে ? কই ?

বললুম : জরীপ এখনও শেষ হয়নি। কথা ছিল, আপনার স্টেট থেকে আমি জরীপ করার যন্ত্রপাতি পাব। বার বার চিঠি লেখা সত্ত্বেও কিছুই পাইনি আমি।

সে কথায় কান না দিয়ে কুমার বললেন : কি আশ্চর্য ! এখনও হয়নি। কবে হবে ? তারিখটা আমাকে বল—আমি সেদিন ওদের আসতে বলব।

ভাবলুম, এ তো আচ্ছা বিপদে পড়া গেল দেখছি। দেওয়ানজী সেই যে জানালার ধারে সরে গিয়ে বাইরে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, ঠিক তেমনিভাবেই দাঁড়িয়ে আছেন। বাধ্য হয়ে আবার আমাকে বলতে হল : থিওডোলাইট না হলে—

হ্যাং য়োর থিওডোলাইট ! ধমকে ওঠেন কুমার বাহাদুর—দ্য সার্ভেপ্ল্যান মাস্ট বি রেডি বাই ফ্রাইডে উইক। তারপর ক'ডজন থিওডোলাইট তোমার চাই বল—কিনে দেব !

বুঝলাম এ মদ্যপের সঙ্গে এখন বিতণ্ডা করে লাভ নেই। জ্ঞান ফিরে এলে এর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে। বিনা বাক্যব্যয়ে নমস্কার করে ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই দেখি দেওয়ানজী ঘুরে দাঁড়ালেন। পকেট থেকে পাইপ ও পাউচ বার করে তামাক ভরতে ভরতে বললেন : শোন। জরীপের যন্ত্রপাতি যোগাড় করতে সময় লাগবে। রায়পুরে ওসব পাওয়া যাবে না। কলকাতা থেকে আনতে গেলে আরও দেরি হয়ে যাবে। অত সময় আমরা দিতে পারব না। ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী। কারণ পরের শুক্রবারের মধ্যেই আমরা প্ল্যানটা চাই। দিন দুই আমরা সেটা স্টাডি করব। সোমবার



pathagar.net

রেজিষ্ট্রী হবে। মঙ্গলবারেই জমিটা ফর্মালি হ্যাণ্ড-ওভার করা হবে তোমাদের পেপার-মিলকে। দেখ, এ কথার যেন কোনও নড়চড় না হয়।

এতক্ষণে আমার মেজাজও সপ্তমে চড়েছে। কুমার বাহাদুরের কথা আমি গায়ে মাখিনি। হাজার হোক লোকটা রঙে আছে কিন্তু দেওয়ান বজ্রধর তো আর মদ্যপান করেন নি। তাঁর এ অযৌক্তিক মোড়লিতে আপাদমস্তক জ্বলে উঠল আমার। বললুম: নড়চড় না হবার মতো হুকুমজারি করার বাসনা যদি আপনার জেগে থাকে তাহ'লে অনুগ্রহ করে ঐ গুরুবচন মেহতাকে ডেকে সেটা শোনাবেন আমি এ স্টেটে চাকরি করি না।

লোকটার প্রকৃত পরিচয় আমি জানতুম না। ভবানীগড় স্টেটের ভৌগোলিক সীমানার ভিতরেই কোন দ্বিপদী জীব যে তাঁকে এ ভাষায় আপ্যায়ন করতে পারে, এ ছিল বজ্রধর তলোয়ারের দুঃস্বপ্নেরও অতীত। দু'এক মিনিট সময় লাগল তাঁর, সামলে নিতে। তারপর বললেন: আমরা আজ অত্যন্ত ব্যস্ত। আপনি এখন বিশ্রাম নিতে পারেন। আমরা ত্রিশে জুলাই ফিরে আসছি। তখন আপনার সঙ্গে বোঝাপড়া করা যাবে। আর হ্যাঁ, ঐ শুক্রবারের মধ্যেই আপনাকে সার্ভে প্ল্যানটা সাবমিট করতে হবে···

ফিরে এলুম নিজের ঘরে। এ তো আচ্ছা "শিবঠাকুরের আপন দেশে" এসে পড়া গেছে দেখছি! আমার একমাত্র ভরসাস্থল শ্রীমান রামালু। আমার সহকর্মী, ওভারসিয়ার। কলকাতা থেকে আমার সঙ্গে এসেছে পেপার-মিলের জমি জরীপ করতে। পদমর্যাদার ব্যবধান ভুলে তার সঙ্গেই এখন একটা গোপন পরামর্শ করা প্রয়োজন। কিন্তু তার আগে স্নান করা দরকার। তোয়ালে-সাবান নিয়ে গেস্ট-হাউসের পিছন দিকে বাথরুমের দিকে চললাম। গেস্ট-হাউসের একেবারে সামনের ঘরখানায়, যেথায় কুমার বাহাদুর আছেন, সেটার সঙ্গে লাগাও বাথরুম আছে। আমাকে ব্যবহার করতে হত

pathagar.net

কেয়ারটেকার রুস্তমজীর সঙ্গে ভাগাভাগি করে পিছনের 'কমন-বাথরুমটা'। রুস্তমজীর কোয়ার্টার্স এদিকেই। বাথরুমের কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। রুস্তমজীর অন্দর-মহল থেকে ভেসে আসছে একটা চাপা গর্জন, আর একটা রুদ্ধ কান্নার আওয়াজ। আমার পদশব্দে গর্জনটা থেমে গেল। চাপা-কান্নার শব্দটাকেও কেউ যেন মুখ চেপে ধরল।

রামালু সব শুনে রীতিমতো ঘাবড়ে গেল। দু'মিনিট কি ভেবে নিয়ে বললে: হয়েছে স্যার!

বললুম: কি হয়েছে?

ওরা রাত আটটার ট্রেনে যাচ্ছে। চলুন আমরাও মাঝরাতের ট্রেনে পালাই।

ওদের পিছু পিছু কলকাতা গিয়ে কি হবে?

ওরা কলকাতা যাচ্ছে না স্যার। ওরা যাচ্ছে দিল্লী, পঁচিশে জুলাইয়ের কনফারেন্সে।

কিসের কনফারেন্স?

কাগজে দেখেননি? মাউন্ট-ব্যাটেন সাহেব সারা ভারতবর্ষের রাজা-মহারাজা-নবাবদের ডেকে পাঠিয়েছেন। পঁচিশে জুলাই দিল্লীতে দরবার হবে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে ওঁদের কি গতি হবে তাই স্থির করা হবে এ কনফারেন্সে। একদিকে স্যার কন্‌রাড কন্‌ফিল্ড আর একদিকে সর্দার বল্লভভাই! কি যে হবে কেউ জানে না!

এত কথা আমি জানতুম না, বললুম: তাই নাকি!

রামালু উত্তেজিত হয়ে বললে: যদি সত্যিই এদের রাজ্যনাশ হয় তাহলে এরা ক্ষেপে গিয়ে একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড করবেই। আর আপনি তার আগেই ওদের ক্ষেপিয়ে তুলছেন! চলুন স্যার, আজ রাতেই পালাই!

ঐ 'পালাই' কথাটাতেই আমার আপত্তি। পালাব কেন? কার ভয়ে? বললুম: তা হয় না রামালু!

pathagar.net

রামালু চুপ করে গেল।

···আমি বিরক্ত হয়ে বললুম: কী আজেবাজে বক্‌ছ প্রিয়দা। তোমার রামালুর গল্প কে শুনতে চাইছে? তুমি রঞ্জনার গল্প বল—ময়ূরকণ্ঠী রঙের শাড়ি, মুক্তো-বসানো একবেণী, আর সরল-সারঙ্গ দৃষ্টি—একটু আভাস দিয়েই তুমি যে থেমে গেলে একেবারে!

সত্যপ্রিয়দা হাসল। বললে: তার কথাই বলব এবার। রাত আটটার গাড়িতে ওঁরা দুজন দিল্লী চলে গেলেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে ব্রিটিশ প্যারামাউন্সিরও অবসান ঘটবে। স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের সঙ্গে এইসব করদ-রাজ্যের নূতন সম্পর্কটা কি হবে তাই নির্ধারণ করতে গেলেন ওঁরা। ভবানীগড় তো ক্ষুদ্র জনপদ,—হায়দ্রাবাদ কাশ্মীর, ভূপাল, বিকানীর, যোধপুর—সবাই সেদিন ছুটেছেন দিল্লীমুখো। ভারতীয় রাজন্যবর্গের ভাগ্যাকাশে এতবড় সঙ্কট আসেনি একবারও, গত দু'শ বছরের ব্রিটিশ ছত্রচ্ছায়ায় নিরুপদ্রব শোষণের ইতিহাসে। রামালু আমার জীপটা নিয়ে ফিরে গেল তাঁবুতে। যেখানে আমাদের জরীপটা হচ্ছে আর কি। জায়গাটা গেস্ট-হাউস থেকে মাইল-সাতেক দূরে। আমার যাতায়াতের জন্য স্টেট থেকে একটা জীপ দিয়েছিল। তাতেই রামালু ফিরে গেল। মনটা ভাল নেই। শুয়ে শুয়ে ডায়েরী লিখতে থাকি আহারাদির পর। ক্রমে স্তব্ধ হয়ে এল রাত। গুমট গরম পড়েছে। একটুও হাওয়া নেই। হাতপাখা নাড়ছি ক্রমাগত। রাত তখন এগারোটা। কে যেন দরজায় টোকা দিল। একটু অবাক হলাম। এতরাত্রে কে হতে পারে? উঠে দরজা খুলে দিতেই ঘরে ঢুকল রুস্তমজী। গেস্ট-হাউসের কেয়ারটেকার। বছর পঞ্চাশ বয়স, কিন্তু দেহ-সৌষ্ঠবে তা বোঝা যায় না। মজবুত দেহের বাঁধুনি – শুধু কানের কাছে দু'একটা চুলে পাক ধরেছে। লোকটাকে আগেও দেখেছি। গেস্ট-হাউসের পিছনদিকের ঘর দু-খানা ওর। বিপত্নীক একা মানুষ। ঠিক একা

pathagar.net

নয় ; ওর সংসারেই বাস করত রঞ্জনা। রুস্তমের সঙ্গে তার সম্পর্কটা তখনও জানতুম না আমি।

আলোটা উস্‌কে দিয়েই চম্‌কে উঠি। রুস্তমজীর ঊর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন, নিম্নাঙ্গে একটা ডোরাকাটা পায়জামা। চোখ দুটো রক্তজবার মতো লাল। বাঁ হাতে একটা গ্লাস। বগলে একটা বোতল—তাতে হলদে রঙের কি একটা স্বচ্ছ তরল পদার্থ। রুস্তমজীর স্খলিত-চরণক্ষেপ পানীয়টার জাত নির্ণয়ে অবশ্য ভুল হবার কোন অবকাশ রাখেনি। সবচেয়ে বিস্ময়ের রুস্তমজী ডানহাতে শক্ত করে ধরে আছে সেই মেয়েটির হাত। রঞ্জনা!

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। মাথায় একবেণীটা আর নেই এখন। একরাশ খোলা চুল আছড়ে পড়েছে পিঠের উপর। পরিধানে অবশ্য এখনও সেই সান্ধ্য শাড়িখানাই। বোধ করি এখনও ছাড়বার সুযোগ পায়নি। আমি কিছু বলবার আগেই রুস্তমজী ওকে প্রায় আছড়ে ফেললে আমার বিছানার উপর। আমার বালিশে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে রঞ্জনা। সে কান্নার কোন ভাষা নেই, কোন শব্দ নেই। চুলভরা পিঠটা শুধু থরথর করে কেঁপে উঠছে মাঝে মাঝে।

প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠি আমি : এর মানে কি?

মাতালটা একটা হেঁচকি সামলালো। বোতল থেকে গ্লাসে পানীয় ঢালতে ঢালতে বললে : খামোশ হো যাইয়ে বাবুসাব—মেরী বাত তো শুনিয়ে পহিলে।

রুস্তমজীর বয়স আমার ডবল। প্রায় পঞ্চাশ। কিন্তু ওর স্বাস্থ্য অটুট। মধ্যরাত্রে ও মদ্যপের সঙ্গে হাতাহাতিটা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। আর একবার মনে হল, সৎপরামর্শই দিয়েছিল রামালু—চলুন স্যার, মাঝরাতের ট্রেনেই পালাই।

টলতে টলতে মাতালটা এসে বসল আমার চৌকির প্রান্তে। বললে : বাবুজী, আপনি তো বাঙ্গালী, ওর দেশের লোক। এ



pathagar.net

বেটিকে একটু বুঝিয়ে বলুন দেখি। ও ঠিক আপনার কথা শুনবে। আমার কথা ও মানতে চাইছে না।

বললুম : কি কথা ?

বলছি। কিন্তু তার আগে একপাত্র স্বাস্থ্য পান কর আমার। জান, আজ বাদে কাল আমি আমীর আদমী হতে চলেছি। আর এ ছ্যাঁচড়ামিতে নেই। এস, এ শুভলগ্নে আমরা পরস্পরের স্বাস্থ্য পান করি।

টেবিল থেকে একটা কাচের গ্লাস তুলে নিল রুস্তমজী। তাতে কিছুটা পানীয় ঢালল। গ্লাসটা তুলে দিল আমার হাতে। বিনা প্রতিবাদে সেটা গ্রহণ করলাম। একবারও বললাম না, যে জীবনে ওটা কখনও খাই নি এবং খাবও না। গ্লাসে গ্লাসে ঠক্ করে শব্দ উঠল। পাত্রটা ঠোঁটের কাছে তুলে চুমুক দেবার ভঙ্গি করলাম। রুস্তমজী বাঁ হাতের তালুতে মুখটা মুছে নিয়ে বললে : ব্যস্ খুব ! অব তুম্ মেরা দোস্ত। এবার সব কথা তোমাকে বলতে পারি। কথা আর কিছুই নয়—এ বেটিকে কুমার বাহাদুরের নজরে ধরেছে। ওকে তিনি প্যালেসে নিয়ে যেতে চাইছেন। সোনায় মুড়ে দেবেন বলছেন। এমন সৌভাগ্যের কথা শুনলে ভবানীগড় রাজ্যের যে কোন কুমারী মেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। অথচ ওটা এমন বেওকুফ, এমন বে-সরম যে স্পষ্ট বলছে যে ও রাজি নয়। ঠিক মায়ের মতো হচ্ছে দিন দিন ! জানে না, যে মেজাজ খারাপ হয়ে গেলে আমি ওকে কেটে খণ্ড খণ্ড করে টুংরীতে ভাসিয়ে দিতে পারি। অবাধ্য বদমায়েশ মেয়েছেলেকে কেমন করে শায়েস্তা করতে হয় তা রুস্তমজী বেশ জানে !

ইচ্ছে হচ্ছিল পা থেকে চটি জোড়া খুলে নিয়ে পটাপট বসিয়ে দিই কয়েক ঘা। সে ইচ্ছে দমন করে বললুম : তাজ্জবকী বাত। তা'হলে ও কি চায় ?

হোহো করে হেসে উঠল রুস্তমজী। স্তব্ধ রাত্রের অন্ধকারে সে

pathagar.net

অট্টহাসি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে পাথরের দেওয়ালে। চম্‌কে উঠলুম সে হাসি শুনে। রুস্তমজী শেষে হাসি থামিয়ে বললে: সেটাই আসল তাজ্জব কী বাত বাবুজী! রঞ্জুবিবি কুমার সাহেবের সাথে যাবে না। কেন? না, সে সাদি করতে চায়!···আপনি তো খানদানী ঘরের ছেলে—কখনও শুনেছেন কেউ কখনও কোথাও একটা বেশ্যার মেয়েকে বিয়ে করেছে?

হঠাৎ আহত সর্পিণীর মতো মুখ খুলল মেয়েটি। কপালের টিপটা ধেবড়ে গেছে। সারা কপালটা যেন জ্বলছে। অশ্রুপ্লাবিত মুখখানা হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে সে। রুস্তমজীর শেষ কথাটায় যেন ক্ষেপে গেল সে। টেবিল থেকে তুলে নিলে একটা পাথরের কাগজ চাপা। সবলে সেটা ছুঁড়ে মারলে রুস্তমজীর মাথা লক্ষ্য করে।

কিন্তু রুস্তমজী দুদিনের মধ্যেই আমীর আদমী হতে চলেছে। তার তখন তুঙ্গে বৃহস্পতি। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে রঞ্জনা। পাথরের দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে কাগজ-চাপাটা ঠিকরে গিয়ে পড়ল ঘরের ও প্রান্তে। রুস্তমজী উঠে দাঁড়ালো। টলতে টলতে এগিয়ে গেল ওর দিকে। আমি ছুটে গিয়ে চেপে ধরি রুস্তমজীর হাত। এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিল। দেখলাম লোকটার গায়ে মত্তহস্তীর বল। রঞ্জনাকে সে কিন্তু আর কিছু বলল না। টলতে টলতে এগিয়ে গেল দরজার কাছে। তারপর কি মনে করে ফের ফিরে এল। টেবিল থেকে তুলে নিল শূন্যপ্রায় বোতলটা। আমার কাছে এগিয়ে এসে প্রায় কানে কানে বললে: মেয়েটা বড় জেদী! দেখ, যদি তোমার কথায় ওর সুবুদ্ধি হয়।

আবার টলতে টলতে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। কিন্তু দরজার বাইরে পা দিয়েই কি যেন খেয়াল হল ফের। দাঁড়ালো থমকে। আচম্‌কা হেসে উঠল একবার। আর হাসি থামিয়েই সে যা করল তার জন্যে আমি বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিলাম না। চট করে দরজাটা

pathagar.net

বাইরে থেকে বন্ধ করে শিকল তুলে দিল। আমি ছুটে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম দরজার উপর : এ কি ! রুস্তমজী ! দরজা খোল !

হোহো করে হেসে উঠল মাতালটা। দরজার ওপার থেকে ভেসে এল তার কণ্ঠস্বর: বহ জংলী চিড়িয়াকো অব্ রাতভোর মিঠি মিঠি বোল শিখাও দোস্ত্ !

ক্রমশ তার মোটাগলার কর্কশ হাসি পাথরের বারান্দায় স্তিমিত হয়ে এল দূর থেকে। হাত পা হিম হয়ে এল আমার। কী কেলেঙ্কারী। ঘরে ঐ একটি মাত্রই নির্গমনদ্বার। বাড়িতে তৃতীয় প্রাণী কে কোথায় আছে জানি না। স্তব্ধ নিশুতি রাত। জানালা দিয়ে দেখা যায় এক আকাশ তারা। বিপদের গুরুত্ব ঐ মেয়েটিও আন্দাজ করেছে নিশ্চয়। আর বিপদ তো ধরতে গেলে ওরই। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসে আছে সে আমার চৌকির উপর। মুখে একবিন্দু রক্ত নেই যেন। সেই সরল সারঙ্গ দৃষ্টিতে সচকিত আর্তি। ব্যাপারটা লঘু করবার জন্য বললুম : কী পাগলের পাল্লায় পড়া গেল বলুন তো ? বাড়িতে শিউনন্দন আছে ? ডাকলে দোর খুলে দিতে পারবে ?

শুধু মাথা নেড়ে জানালে—না। অর্থাৎ হয় শিউনন্দন বাড়ি নেই—অথবা একেবারে অন্য প্রান্তে নিদ্রিত।

আমি বললুম : তা হলে ?

ও তরফ থেকে কোন জবাব নেই।

পায়চারি করলুম বার কয়েক। এ কী অভাবনীয় বিপদ। ও যে এভাবে আমাদের দুজনকে একঘরে বন্দী করে পালাতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। একবার চোখ তুলে দেখলুম রঞ্জনার দিকে মাটির প্রতিমার মতো বসে আছে নিশ্চল—সে প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় নি যেন। ও কি এ ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারছে না ? কিন্তু তা কেমন করে হবে ? অন্তত সতের-আঠার বছর বয়স ওর হবেই। ও বয়সের একটি মেয়ের পক্ষে বোঝা শক্ত নয়—কী চরম বিপদের

মুখে তাকে ঠেলে দিয়ে গেছে মাতালটা। আমি না হয় নিজেকে জানি, ও তো আমাকে জানে না। আমি যে এই মুহূর্তে অসভ্য বর্বর হয়ে উঠতে পারি—এ আশঙ্কা কি ওর নেই? তাহলে ওর উদ্ধারের পথ কোথায়? এসব কথা কি ভাবছে না ঐ নিশ্চল প্রতিমা?

বললুম: সারা রাত কি এভাবে দুজনকে বন্দী হয়ে থাকতে হবে নাকি?

ঘরে যেন আমি একলা। কোন উত্তর পেলাম না এ প্রশ্নের।

আবার বলি: কি করবেন এখন?

এবার জবাব দিল। ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বললে: আমি যদি এই মেঝেতে শুয়ে ঘুমাই তাহলে আপনার অসুবিধা হবে?

বললুম: না, তা হয় না! আপনি আমাকে জানেন না, আমিও আপনাকে জানি না। কিন্তু এটুকু আশাকরি বুঝতে পারছেন, রুস্তমজী ইচ্ছা করেই এভাবে আপনাকে বে-ইজ্জত করতে চায়। কাল দিনের আলোয় পাঁচজনকে ডেকে এনে তবে খুলবে দরজা। তাতে আমার কিছু ক্ষতি হোক না হোক আপনার তাতে সর্বনাশ। ঐ কুমার বাহাদুরের হারেম ছাড়া এ দুনিয়ায় আর কোন আশ্রয় থাকবে না আপনার।

মুখটা নিচু করে বসেছিল রঞ্জনা। দেখি টপটপ করে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল তার আনত মুখ থেকে। তাহলে নিষ্প্রাণ নয় ও প্রতিমা। সবই বুঝতে পারছে সে।

আমি বললুম: শুনুন, এ জানালার নিচে টানা কার্নিস আছে। সেটা বেয়ে আমি বারান্দায় পৌঁছাতে পারব। ওদিক দিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দেব।

এতক্ষণে উঠে দাঁড়ালো রঞ্জনা। সোজাসুজি চাইল আমার মুখের দিকে। দেখলুম ওর চিবুকের উপর ছোট্ট একটি তিলচিহ্ন আছে। অতি ছোট, সহজে নজরে পড়ে না, অনেকটা অ্যাণ্ড্রোমেডার নেবুলার মতো—যেন আমার অজানা একটা গোটা ব্রহ্মাণ্ড লীন হয়ে

pathagar.net

আছে ঐ ছোট্ট তিলচিহ্নটায়! ভীত হরিণনয়ন দুটি আমার মুখে মেলে ধরে বললে: আপনি নিচে পড়ে যাবেন!

হেসে বললুম: নাহলে আপনি যে আরও নিচে পড়ে যাবেন।

পাঞ্জাবিটা খুলে রেখে জানালার বাইরে পা বাড়ালাম। রঞ্জনা উঠে এল জানালার ধারে। একবার নিচু হয়ে দেখল নিচের ঘন অন্ধকারের দিকে। তারপর বললে: আমার কিন্তু ভয় করছে।

সান্ত্বনা দেবার কোন চেষ্টা করলুম না। কে যেন বলেছিলেন—উজ্জ্বল আলোর কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে সহস্র দর্শকের করতালি-উদ্ভাসিত উপস্থিতিতে নিতান্ত কাপুরুষও বীর হয়ে ওঠে। কথাটা অসম্পূর্ণ। সেজবাতির অনুজ্জ্বল আলোতেও তা হয়—একজোড়া হরিণনয়নকে সাক্ষী রেখেও। জানালার বাইরে অপ্রশস্ত মোল্ডিংএ দেহভার ন্যস্ত করলুম। চুনবালির মসলা—বহুদিনের পুরানো বাড়ি; ঝরঝর করে পলেস্তারার একটা চাপড়া খসে পড়ল অন্ধকার বাগানে। একটা অর্ধস্ফুট চাপা আর্তনাদ আটকে গেল রঞ্জনার কণ্ঠে। দুহাতে চেপে ধরল আমার দুই হাত। আমি অবশ্য ততক্ষণে সামলে নিয়েছি নিজেকে। ও বললে: বাবুজী, আমি আপনাকে বিশ্বাস করেছি।

হাতটা ছেড়ে নিয়ে নতনয়নে আবার বললে: মেয়েমানুষ এ বিষয়ে কখনও ভুল করে না বাবুসাব। আমি জানি আপনি আমার কোন ক্ষতি করবেন না। কিন্তু ও চেষ্টা আর করবেন না।

অগত্যা ফিরে এসে বসলুম আবার চৌকিতে। মাটিতে ফেলে দিলাম একটা বালিশ। ঘরের দূরতম প্রান্তে গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়ল রঞ্জনা সাবধানে গায়ে কাপড় টেনে।

প্রায় মিনিট পনের কোন সাড়াশব্দ নেই। শুয়ে শুয়ে ভাবছিলুম—কী আশ্চর্য জীবন। কোথায় লাগে এর কাছে পার্থিব নাট্যকার অথবা ঔপন্যাসিকের দুর্বল কল্পনা। একটি পূর্ণযৌবনা অনাত্মীয়া

pathagar.net

মহিলার সঙ্গে একঘরে রাত্রিযাপন করতে হবে একি আজ সকালেও কল্পনা করতে পেরেছি ? ভারি ইচ্ছা হচ্ছিল জানতে—ও কি ভাবছে। ওর মুখটা দেখা যাচ্ছে না, ও পাশ ফিরে শুয়েছে। খোলা চুল লুটাচ্ছে পাথরের মেঝেতে। ধীরে ধীরে ডাকলুম : রঞ্জনা ?

উঁ ?

রুস্তমজী আপনার কে হয় ?

দুশমন।

আপনার বাবা-মা-ভাই-বোন কেউ নেই ?

জী নহী !

অঞ্জনা কার নাম !

চট করে উঠে বসে রঞ্জনা। অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে বলে : আপ কৈসে শুনা ?

আমি কেমন করে জেনেছি সে কথা থাক। অঞ্জনা কে—

মেরী মাতাজী।

মারা গেছেন !

জী হাঁ।

আপ্ বাঙ্গালী হ্যায় ক্যা ?

একটু চুপ করে রইল রঞ্জনা। তারপর হিন্দিতেই বললে : জানি না।—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে : আমাকে মাপ করবেন। আমি সেসব কথা ভুলে থাকতে চাই।

আমাকে চুপ করে যেতে হয়। দুরন্ত কৌতূহল হচ্ছিল, অস্বীকার করব না। এ গেস্ট-হাউসে এসে আছি আজ প্রায় তিন-সপ্তাহ ! দূর থেকে মেয়েটিকে বার বার দেখেছি। এজমালি বাথরুমের দিকে যেতে হলে রুস্তমজীর অন্দরমহলের খানিকটা বে-আব্রু হয়ে পড়ে ! কখনও চকিতে নজরে পড়েছে কর্মব্যস্ত একটি মেয়েকে। প্রথমে ভেবেছিলুম ও রুস্তমজীর কন্যা। পরে বুঝতে পেরেছি সে ধারণাটা ভ্রান্ত। কিন্তু নেকড়ে-পালিত শিশুর মতো হিন্দি

pathagar.net

ভাষী ঐ মেয়েটি যে বাঙালী হতে পারে এ আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। সেটা জেনেছিলাম অনেক পরে। কেমন করে ঐ মেয়েটি এই বর্বর-প্রকৃতি রুস্তমজীর খপ্পরে এসে পড়েছে তা জানা হয়নি। কিন্তু অসহায় মেয়েটির এ বন্দিদশায় সে কৌতূহল চরিতার্থ করা চলে না। শুয়েই পড়লাম। বাতিটা পুরোমাত্রায় জ্বলতেই থাকে। সেটা কমাতে গিয়েও হাতটা টেনে নিলুম। থাক, বাতিটা জ্বলুক। অন্ধকারকে কেমন যেন বিশ্বাস করতে পারছি না।

ঘুম এল না। এমন একটা অদ্ভুত রাতে ঘুম না আসাই স্বাভাবিক। বিনিদ্র রাত্রের অস্থির চিন্তা মানুষকে দুর্বল করে দেয়। মনে হল জীবনের কতটুকু জানি। এমন একটা অদ্ভুত রাত যে আমার জন্যে প্রতীক্ষা করে প্রহর গুনছে তা কি আজ সন্ধ্যাতেই আন্দাজ করতে পেরেছি? তা যেমন পারিনি, তেমনি আজকের বাকি রাতটা কেমন করে কাটবে তাই কি এখন আন্দাজ করতে পারি? নবদ্বীপের নিষ্ঠাবান আচার্য-বংশের সন্তান আমি। পুরুষানুক্রমে ইন্দ্রিয়কে বশে-রাখার শিক্ষা পেয়েছে আমার ধমনীর প্রতিটি রক্তকণা। আদিমতম মানুষের যেসব ইন্দ্রিয়জ বাসনা-কামনা আমার ক্রমোসমে সুষুপ্ত, তাকে সংযত করে রাখার শিক্ষা পেয়েছি আমি মহামহোপাধ্যায় পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদে। তবু মানুষের কতটুকু জানি? নিজেকে কতটুকু চিনি! কে বলতে পারে, আজ এই বিচিত্র রাত্রির সংমোহনে আমার আত্মা ঘুমিয়ে পড়বে কিনা—অন্তরবাসী বর্বরটা এই স্তব্ধ রাত্রের সুযোগে যদি পৈশাচিক উল্লাসে আমার শুভবুদ্ধির গলা টিপে ধরে? আধো-নিদ্রায় তন্দ্রাচ্ছন্ন অপরিচিতার উষ্ণসান্নিধ্যে যদি অর্ধচেতন আমার মতিভ্রম হয়ে যায়। একথা মনে হতেই আমার হাত-পা কেমন যেন হিম হয়ে এল। সাহস করে ভূলুণ্ঠিতা ঐ মেয়েটির দিকে চোখ তুলে আর চাইতেই পারলুম না।

…প্রিয়দা থামতেই আমি বললুম: তারপর!

সে তারপর বলবার সুযোগ আর পায়নি প্রিয়দা।

pathagar.net

দল বেঁধে কয়েকজন আসছিল এদিকে। আমাদের দুজনকে নিরিবিলিতে বসে আড্ডা দিতে দেখে হৈহৈ করে উঠল। চাপা পড়ল গল্পটা।

কথা হচ্ছিল ফোর-শোর রোডের প্রান্তে সেই পরিচিত ঘাসের লনটায়। ওভাল-মাঠের পাশ দিয়ে নিচু জমির কান ঘেঁষে যে রাস্তাটা চলে গেছে পুবমুখো তারই ধারে বসেছিলুম আমরা দুজন। প্রিয়দা আমার রুমমেট ছিল পাক্কা চার বছর। ডাউনিং-ইস্ট হস্টেলে গঙ্গার ধারে একতলার একটি ঘরে পাশাপাশি সীটে কাটিয়েছি ছাত্রজীবন। পাস করে আমি ঢুকলাম সরকারী পূর্তবিভাগে আর প্রিয়দা কোন এক কাগজকলে চাকরি নিয়ে চলে গেল মধ্যপ্রদেশে। একটি বছর কেউ কারও খোঁজ রাখি না। বৎসরান্তে রি-ইউনিয়নে এসে আবার দেখা পেয়েছিলাম তার। সেই বি· ই. কলেজের পরিচিত পরিবেশ। ওভাল-মাঠে শামিয়ানা খাটিয়ে রি-ইউনিয়ন মিটিং হচ্ছে। দেশ সদ্য স্বাধীন হয়েছে। রাষ্ট্রের প্রধানতম জননায়ক নাকি বলেছেন—এখন চাই শুধু কারিগরি কাজ-জানা মানুষ—টেকনিসিয়ানস্ অ্যাণ্ড এঞ্জিনিয়ার্স! গরম গরম বক্তৃতা হচ্ছে প্যাণ্ডেলের ভিতর। ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার আর ঘুষখোরদের নিকটতম ল্যাম্প-পোস্টে ঝোলাবার নানারকম পরিকল্পনা। আমরা দুটি বন্ধু গুটি গুটি পালিয়ে এসেছিলাম। জমিয়ে বসেছিলাম ফোরশোর রোডের সেই একান্ত নির্জনতায়। প্রিয়দা তার গত একবছরের অভিজ্ঞতা শোনাচ্ছিল আমাকে। মধ্যভারতের কোন অজানা অচেনা দেশের পাত্রপাত্রীদের নিয়ে কথার মালা গেঁথে চলেছিল। ছেদ পড়ল সে কাহিনীতে। আমাদের মতো প্যাণ্ডেল-পলাতক আরও কয়েকটি সতীর্থ হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছে আমাদের দুজনকে।

বন্ধুবান্ধবের খবরাখবর আদান-প্রদান করা গেল। খগেন আই. আর. এস. ই. পেয়েছে। অসীম বিলেত গেছে। মঞ্জিম জয়েন করেছে মিলিটারী সার্ভিসে।



pathagar.net

সতীর্থদের অভ্যাগমে সেবার মাঝপথে বাধা পড়েছিল সত্যপ্রিয়দার গল্পটায়। সে আজ বছর ষোল-সতের আগেকার কথা। উনিশ শ' আটচল্লিশ সনের জানুয়ারী মাসের কথা। গল্পের বাকিটুকু শুনেছিলাম তার পরদিন সন্ধ্যায়। সে গল্পই শোনাতে বসেছি আপনাদের। কিন্তু উপসংহার শোনাবার আগে অবতরণিকাটা শোনাতে হয়! বস্তুত সত্যপ্রিয়দার গল্প আমাকে যে একদিন লিখতে হবে এটা আমার জানাই ছিল। কিন্তু আমার ধারণা ছিল, প্রিয়দা আমার কাহিনীর নায়ক হবে আমার সাহিত্যিক জীবনের শেষাশেষি। এত শীঘ্রই যে তার কথা লিখতে বসব—তা আমার নিজেরই ধারণা ছিল না।

কথাসাহিত্যের যাঁরা বেসাতি করেন তাঁদের প্রায়ই শুনতে হয় একটা অনুরোধ 'আমার জীবন নিয়ে একটা গল্প লিখুন না।' সকলেই মনে করে তার জীবনের ঘটনায় আছে নাটকীয়তার উপাদান। সবাই ভাবে সে বুঝি উপন্যাসের নায়ক অথবা নায়িকা হতে পারে। অথচ প্রিয়দার ছিল উল্টোরকম ধারণা। বলত—ভয় তো নরেনটাকে —ও হতভাগা আবার গল্প লেখে। কখন কি বলে বসব, আর ও তা লিখে ছাপিয়ে দেবে!

আমি হেসে বলতুম: দিলেই বা!

ওরে ব্বাস্‌রে! তাহলে লোকসমাজে মুখ দেখাতে পারব না।

মুখচোরা মানুষটাকে বাধা দিয়ে বলতুম: বেশ, কথা দিচ্ছি, তোমাকে নায়ক করে কোন গল্প লিখব না। লজ্জা পেতে হবে না তোমাকে! তুমি নির্ভাবনায় বলে যাও।

কথা দিলি কিন্তু।

···কথা আমি রেখেছি প্রিয়দা। এ কাহিনী পড়ে আজ আর তোমাকে লজ্জা পেতে হবে না।

সত্যপ্রিয় আচার্যের জীবন একটানা একটা ব্যর্থতার ইতিকথা। সর্বনাশের সূচনা করেছিলেন, যিনি জন্মক্ষণে নামকরণটা করেছিলেন

pathagar.net

সত্যপ্রিয়দার। আমি জানতাম না তখন, ওদের বংশের সকলের উপরেই ছিল এ অভিশাপ। জীবনে ওর কাছে সবচেয়ে প্রিয়বস্তু ছিল 'সত্য'। অনেস্টি'কে 'বেস্ট-পলিসি" করে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর একান্তে সদ্য-স্বাধীন এক মহান উপদ্বীপে কর্মজীবন শুরু করেছিল সত্যপ্রিয় আচার্য। কোন কূলে গিয়ে ভিড়েছিল তার জীবন-তরী সে-কথা জানাতেই এ কাহিনীর অবতারণা। পদে পদে লাঞ্ছনা, ব্যর্থতা আর অপমান জুটেছিল বেচারার বরাতে। সে ইতিকথায় নাটকীয়তা আছে স্থানে স্থানে—কিন্তু পুনরুক্তি দোষ তাতে প্রকট। অসত্যের সঙ্গে যদি বেচারা একটা মাঝামাঝি রফা করতে পারত, তাহলে তাকে এভাবে নাস্তানাবুদ হতে হত না। আমরা চেষ্টার ত্রুটি করিনি—কিন্তু ওর রক্তের মধ্যে অনেক গভীরে ছিল এই সত্যপ্রিয়তার বীজ—নানানভাবে তালিম দিয়েও ওকে মানুষ করতে পারিনি আমরা।

সেকেণ্ড-ইয়ারে সার্ভে ক্লাস হচ্ছে। ক্লাস নিচ্ছেন পি. বি. জি। আউট ডোর-ক্লাস। তাঁবু পড়েছে ওভাল-মাঠে। আমরা গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছি প্রফেসারকে। মাঝখানে তে-পায়ার উপর খাড়া করা আছে একটা থিয়োডোলাইট। পার্মানেণ্ট-অ্যাডজাস্টমেণ্ট কেমন করে করতে হয় তাই শেখানো হচ্ছে। ইম্পর্টেণ্ট কোশ্চেন। বারে বারে ঘুরে ফিরে এ প্রশ্ন প্রশ্নপত্রে আসে। তাই মন দিয়ে শুনছি আমরা। হঠাৎ কি খেয়াল হল, ঘোষসাহেব প্রশ্ন করে বসলেন: ওয়েল বয়েস, ক্যান য়ু টেল মি হোয়াট্‌স্ দ্য মোস্ট ইম্পর্টাণ্ট রিকুইসিট্ এ সার্ভেয়ার স্যুড হ্যাভ?

আমরা মনে মনে তর্জমা করে নিলাম—জরীপের কাজে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তুটা কি?

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি আমরা।

অধ্যাপক বললেন: একে একে বলে যাও।

সমরা বললে: মেজারিং টেপ।

রমেন বললে: গাণ্টার্স চেন।

pathagar.net

মুখ বাঁকালেন ঘোষসাহেব। উত্তর মনোমত হয়নি।

একে একে আমরা বিদ্যা জাহির করছি। মেজারমেণ্ট বই, থিয়োডোলাইট, প্লেন-টেব্‌ল্‌, লেভলিং-যন্ত্র। কেউ কেউ বুদ্ধি খরচ করে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনও দাখিল করল—কমন-সেন্স, ইণ্টেলিজেন্স, পার্সিভারেন্স!

মাথা নাড়লেন ঘোষসাহেব। পছন্দ হয় নি উত্তর। হঠাৎ প্রিয়দার দিকে আঙুল তুলে বলেন—য়ু, আচারিয়া, তুমি কিছু বললে না?

সত্যপ্রিয় আচার্য ঘাড় চুলকে লাজুক লাজুক মুখে বললে—আই থিংক, ইট্‌স্‌···ইটস্‌ অনেস্টি স্যার!

রাইট ও! লাফিয়ে ওঠেন অধ্যাপক ঘোষ। এতক্ষণে মনোমত উত্তর পেয়েছেন। সার্ভেয়ারের পক্ষে সবচেয়ে বড় গুণ সততা। সততাকে অবলম্বন করেই নিখুঁত জরীপ করা সম্ভব।

শুধু অবশ্য জরীপ নয়, বললেন, ঘোষসাহেব, জীবনের সব ক্ষেত্রেই সততা হচ্ছে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় রিকুইসিট। কিন্তু সার্ভেয়ারের পক্ষে এ কথা দ্বিগুণ-সত্য। ঘণ্টা বাজতে যে আধঘণ্টা বাকি ছিল তাতে আর জরীপের প্রসঙ্গ আলোচিত হল না। শুনলাম 'নাইন পিলার্স অফ সাকসেস্‌' বলতে কি বোঝায়। সততা, সত্যবাদিতা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি নয়টি স্তম্ভের উপরেই নাকি সাফল্যের অবস্থিতি। অন্তত অধ্যাপক ঘোষসাহেবের এই মত।

মুক্তিদা আমার কানে কানে বললে: অনেস্টি ইন সার্ভেয়ার ইস্‌ অ্যাস আনকোশ্চেনব্‌ল অ্যাজ দি ভার্জিনিটি অব এ হলিউড স্টার!

শ্লীলতার মাত্রা ছাড়ালেও কথাটার মধ্যে সত্য আছে।

শরৎবাবু বলেছিলেন 'যে মদ খায় অথচ বলে জীবনে কখনও মাতাল হই নি—হয় সে মিথ্যা কথা বলে, অথবা মদের বদলে জল খায়।' আমাদের ধারণা ছিল—যে জরীপ করে, অথচ বলে জীবনে

কখনও 'ফার্জিং' করে নি, হয় সে জরীপ করেনি অথবা জরীপ করার নাম করে পাকা কলা খায়।

কথাটার কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে দ্বিতীয় বছরে জরীপ শেখানো হয়। এখন হয় কিনা জানি না। অন্তত আমরা যখন পড়তুম তখন হত। সেকেণ্ড ইয়ারের ছেলেদের নিয়ে জন দুই-তিন অধ্যাপক শীতকাল নাগাদ একদিন বেরিয়ে পড়তেন পশ্চিমে। বিহারে, সাঁওতাল-পরগনায়, উড়িষ্যার—কোন এক প্রান্তরে গিয়ে হানা দিত বিরাট বাহিনী। রাতারাতি গড়ে উঠত ফাঁকা মাঠের মাঝখানে যেন ময়দানবের নগরী। সারি সারি সার্ভে তাঁবু। মাঝখানে একটায় উড়ত নিশান—সেটা অধ্যাপক মশাইদের। সারাদিন মাঠে ঘাটে বনে-বাদাড়ে জরীপ করত ছেলের দল। এক এক দলে ছয়জন ছাত্র। পালা করে একজন বইত থিয়োডোলাইট যন্ত্রটা, দুজন টানত চেন, দুজন ফিতে ফেলে ফেলে অফসেট মাপত, আর একজন মাপগুলো রেকর্ড করত খাতায়। সারাদিন জরীপ করে, বন-জঙ্গল চষা-ক্ষেত ভেঙে সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে আসত ছেলের দল হাঁ-হাঁ করা খিদে নিয়ে। খাওয়ার আয়োজন ছিল রাজকীয়। তারপর সন্ধ্যাবেলায় আগুন জ্বেলে হত ক্যাম্প-ফায়ার। হৈ-হল্লা, গান, মাউথ-অর্গান, ইয়েলিং। জোনাক জ্বলত ঝোপে-ঝাড়ে, শেয়াল ডাকত জঙ্গলে—ছেলেরাও পাল্লা দিয়ে ডাকত তাদের সাথে। বয়স্ক অধ্যাপকরাও সার্ভে কাম্পের ঐ এক মাসের জন্যে পদমর্যাদা ভুলে যেন ছেলেমানুষ হয়ে পড়তেন। বি. ই, কলেজের চার বছরের একটানা পরিশ্রমের মরুভূমিতে ঐ সার্ভে ক্যাম্পের একমাসের জীবন ছিল একটি মরূদ্যান।

দুর্ভাগ্য আমাদের। আমরা যখন সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে দুনিয়া জুড়ে। ডানকার্ক, পার্ল-হারবার আর নর্মাণ্ডিতেই শুধু নয়—যুদ্ধ এসে পড়েছে একেবারে আমাদের দোর-



pathagar.net

গোড়ায়। কোহিমায় ইম্ফলে! ফলে কলেজের বাইরে যেতে দেওয়া হয়নি আমাদের। ওয়ার-এমার্জেন্সি। কলেজ কম্পাউণ্ডেই জরীপের তাঁবু পড়েছে। কেউ মাপছে বোটানিক্যাল গার্ডেন, কেউ বা বাতাইতলা হয়ে পঞ্চান্ন নম্বর বাসরুট। মেজাজ আমাদের সকলেরই খারাপ।

আমাদের দলে ছিলাম আমরা ছয়টি ব্যাকবেঞ্চার। মুক্তিদা, হরভজন সিং, সত্যদা, সমর, মঞ্জিম আর আমি। আমাদের দেওয়া হয়েছে একটা রেলওয়ে প্রজেক্ট। রামরাজাতলা-টু মাকড়দা-ভায়া চামরিল। মেন লাইনের রামরাজাতলা স্টেশনকে যুক্ত করতে ছবে হাওড়া-আমতা লাইনের মাকড়দা স্টেশনের সঙ্গে। কোনপথে পরিকল্পিত রেল-লাইনকে নিয়ে গেলে এই কল্পিত প্রজেক্ট সবচেয়ে সহজে ও সস্তায় রূপায়িত করা যাবে তাই জরীপ করে বার করতে হবে আমাদের। যন্ত্রপাতি ছাড়া আমাদের দেওয়া হয়েছে একটা থানা ম্যাপ। মুক্তিদা প্রথম দিনই বলেছিল: খামোকা মাঠে ঘাটে হাঁপাদাঁপি করে কেন আত্মাকে কষ্ট দেওয়া বাওয়া। ঐ থানা ম্যাপটাকে এনলার্জ করে ঘরে বসেই একটা প্রজেক্ট-প্লেট বানিয়ে ফেলা যাক।

আমরা তৎক্ষণাৎ রাজি। কী দরকার রোদে রোদে দৌড়-ঝাঁপ দৌড়াদৌড়ি করার। হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। এ পরিকল্পনা তো আর সত্যিই বাস্তবে রূপায়িত হতে যাচ্ছে না। কথা হচ্ছে পরীক্ষা পাস করা নিয়ে। তা যিনি পরীক্ষক হবেন তিনি তো আর সত্যিই থিয়োডোলাইট ঘাড়ে নিয়ে মাঠে মাঠে জরীপ কববেন না—তাঁরও ব্রহ্মাস্ত্র হচ্ছে ঐ সার্ভে-অব ইণ্ডিয়ার মৌজা ম্যাপখানা। আমরা যদি ঐ ম্যাপটাকেই এনলার্জ করে ঘরে বসে রেল-লাইনের নক্শা তৈরি করি, তাহলে ধরবে কোন—ইয়ে?

বাদ সাধল সত্যপ্রিয়দা, বললে: তা হয় না।

মুক্তিদা ধমক দিয়ে ওঠে: আলবৎ হয়। কেন, তোমার সেই অনেস্টির থিয়োরি তো?

প্রিয়দাও রুখে উঠে বললে: হ্যাঁ, সেই 'অনেস্টির থিয়োরি'টাই।



pathagar.net

জরীপ না করে জরীপের নক্‌শা সাবমিট করেত পারব না আমি। তাছাড়া 'ফিল্ড-বুকে' কী লিখব ? ডায়েরিতে ?

মঞ্জিম হতাশ হয়ে বলে : কী গাড়োল রে বাবা। আরে বাপু—ডায়েরিতে তো আগড়ম-বাগড়ম লিখতে হবেই। যেদিন 'মেট্রোয়'য় ম্যাটিনী শোতে 'গন উইথ দি উইণ্ডস' দেখবে সেদিন লিখবে—'রিপোর্টেড টু রামরাজাতলা স্টেশন অ্যাট—' টাইম-টেবল দেখে একটা লোকাল ট্রেনের সময় বসিয়ে দেবে। হাঙ্গামাটা কোথায় ? তারপর ডায়েরির খাতাখানা বারকতক ধুলোয় রগড়িয়ে নেবে—যাতে একটু পুরোনো পুরোনো দেখায়, দু-চারটে কাদার ছিটে-ফোঁটা কনে-চন্দন ছিটিয়ে জমা দিয়ে দেবে সার্ভে-প্লেটের সঙ্গে বেঁধে। ব্যাস! ধরবে কোন—

প্রিয়দা পাথরের মতো শক্ত হয়ে বলেছিল : না! তোমাদের সকলেরই যদি এই মত হয়, তাহলে বল, আমি খগেন অসীম কিংবা পৃথ্বীশদের গ্রুপে চলে যাই।

ওরা হচ্ছে ভাল ছেলের দল। পরীক্ষা-পাসের এমন সহজ পথটা ওরা চেনে না। ওরা সারাদিন মাঠে ঘাটে রীলে-রেস দৌড়াবে, আর সন্ধ্যাবেলা বসবে প্যাণ্টের পায়া থেকে চোরকাঁটা ছাড়াতে। প্রিয়দাকে বিশ্বাস নেই। ও গিয়ে পি. জি.-কে নির্ঘাত বলে বসবে গ্রুপ বদলাতে চায়। তাহলেই অধ্যাপক মশাই জানতে চাইবেন তার কারণ। আর সত্যভাষী গাড়োলটা যা জবাব দেবে তার ফলাফল ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়। অগত্যা আমরা একটা মাঝামাঝি রফা করলাম। প্রতিদিন আমাদের মধ্যে তিনজন পালা করে প্রিয়দাকে সাহায্য করবে, আর বাকি দুজন ফ্রেঞ্চলীভ উপভোগ করবে। জরীপ বস্তুত সত্যপ্রিয়দাই করবে এবং শেষাশেষি তার সর্ভে-প্লেটে ডিভাইডার-যোগে কাঁটা মেরে আমরা পাঁচজনে পাঁচখানা প্রজেক্ট-প্লেট দাখিল করব! প্রিয়দা রাজি হল। আমাদেরও ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

pathagar.net

যে কথা সেই কাজ। রামরাজাতলা স্টেশন থেকে মাঠ-ঘাট-খানা খন্দ পেরিয়ে আমরা চলেছি দক্ষিণমুখো। প্রথমেই বেশ বড় একটা চষা ক্ষেত। দিন-তিনেক লাগল পায়ে হেঁটে সেটা 'রেকনয়টার' করতে। তিনটে অলটারনেটিভ রাস্তা আবিষ্কার করেছে প্রিয়দা। তিনটে দিয়েই সে পদব্রজে গিয়েছে রামরাজাতলা থেকে মাকড়দা। আমরা সে তিনদিন কে কি করেছি ঠিক মনে নেই। তবে ডায়েরিতে যা যা লেখা আছে ঠিক তাই তাই যে করেছি এ কথা আজ আর হলপ করে বলতে পারিনে। অনেক ভেবেচিন্তে তিনটে রুটের মধ্যে একটিকে বেছে নিল প্রিয়দা। আমরা এবার মাপতে মাপতে চললাম চষা ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে। দক্ষিণমুখো। মাঘ মাস। সারামাঠ নাড়ামুড়োয় ভরা। ফসল কেটে নিয়ে গেছে চাষীরা। মাঠে জনপ্রাণী নেই। রেল-লাইন থেকে যেটাকে সুদূর সুন্দরবন বলে মনে হয়েছিল, মাইল তিনেক মাঠ ভেঙে এসে দেখলাম সেটা একটা গণ্ডগ্রাম। আম-জাম আর নারকেল গাছের ছায়ায় ঘেরা একটা শান্ত জনপদ। পঞ্চম দিনের শেষে আমরা এসে পৌঁছলাম গ্রামপ্রান্তে। সেদিন ঘটনাচক্রে আমরা ছয়জনই হাজিরা দিয়েছি। মাঠের মাঝখানে এতদিন লাল-নিশান ঘাড়ে আমাদের ঘোরাফেরা করতে ওরা নিশ্চয় দেখেছে। গাঁয়ের কাছাকাছি আসতেই কৌতূহলী জনতা আমাদের দিকে এগিয়ে এল। শান্ত সরল গাঁয়ের মানুষ। কি জানি কোন গুণে মুক্তিদাকেই ওরা দলপতি ঠাউরে প্রশ্ন করল: বাবুমশাই এ মাঠ মাপতিছেন কেন?

দর্শক পেয়ে অভিনয়পটু মুক্তিদা খুশীয়াল হয়ে উঠেছে।

থিয়োডোলাইটের দূরবীনে একটা চোখ লাগিয়ে ডান হাতটা দিয়ে দূরবর্তী নিশানধারী মঞ্জিমকে নির্দেশ দিতে দিতে মুক্তিদা বলে ওঠে: দ্যাট্ নান্ অব য়োর বিসনেস্!

আমি গ্রাম্য লোকটির কানে কানে বললাম: সাহেব চটে আছে।

pathagar.net

কাঁকালে-শিশু খাটো-কাপড়-পরা আদুল গা মানুষটা আর কিছু প্রশ্ন করল না। গাঁয়ের লোক কিন্তু ভিড় করে দেখতে এল মজা। ঠিক মজা নয়; বাচ্চাদের কৌতুক আর কৌতূহল থাকলেও বয়োজ্যেষ্ঠদের মুখ-চোখে কেমন একটা আতঙ্কের ছায়া দেখলাম। ব্যাপার কি? যুদ্ধের বাজার, মুখে মুখে গুজব রটছে—কিন্তু আমরা তো গোরা সৈন্য নই—এত ঘাবড়ে গেল কেন ওরা? দলপতি মুক্তিদা আগেই টিপে দিয়েছিল—আমরা গম্ভীর হয়ে কাজ করে যাচ্ছি, কথাবার্তা চলছে ইংরেজিতে। বেলা প্রায় চারটে। ভারি তেষ্টা পেয়েছিল আমার। প্রৌঢ় লোকটিকে বললাম: একটু খাবার জল পাব?

নিশ্চয়, নিশ্চয়। আসুন বাবুমশাইরা।

মুক্তিদা ধমক দিয়ে ওঠে: নোংরা জল খেয়ে কলেরা বাধাও শেষ পর্যন্ত!

আজ্ঞে না, নোংরা জল কেন। ভাল জলই দেব নে।

একসঙ্গে তিন-চারজন ছোটে জল আনতে।

মুক্তিদা সিংজীকে ডাকল: আই সে সিং হ্যাভ এ লুক।

থিয়োডোলাইটের ছিদ্রপথে চোখ লাগাতে ইশারা করছে। কিন্তু ব্যাপার কি? টেলিস্কোপ গাঁয়ের দিকে মুখ ফেরানো। মাঠের যেদিকে জরীপের নিশান পোঁতা আছে সেদিকে নয়; সিংজী একটু অবাক হয়ে চোখ লাগাল যন্ত্রে। এক মুখ দাড়ি-গোঁফ ভেদ করে তার মুখে ফুটে উঠল বিচিত্র হাস্যরেখা। কি দেখছে ওরা? মাঠে যতক্ষণ ছিলাম প্রিয়দার চোখ এড়িয়ে বারে বারে রামরাজাতলা স্টেশনকে ফোকাস করেছি—দেখেছি লাল-নীল-হলদে-সবুজ শাড়ি পরা জনতার একাংশকে প্লাটফর্মে ঘোরাঘুরি করতে। কিন্তু এখানে ঊর্ধ্বমুখ টেলিস্কোপের লক্ষ্যবস্তুটি কি। প্রিয়দা বাদে আমরা পাঁচজন একে একে চোখ লাগালাম। দেখলাম। প্রিয়দা এসব ছেলেমানুষীতে থাকতে নারাজ। আমিও দেখলাম। দ্রোণাচার্যের শিষ্য আমরা।

অর্জুনের মতো তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এক নজরে লক্ষ্য বস্তুটি ঠিকই দেখে নিয়েছি! দূরবর্তী খড়োচাল ঘর নয়, তৎ-সংলগ্ন বাগান নয়, বাগান সংলগ্ন কলা গাছ নয়, গাছ-সংলগ্ন এক কাঁদি পরিপক্ক মর্তমান কলাই হচ্ছে আসল লক্ষ্যস্থল।

দলপতি মুক্তিদা বললে: ফলো মি!

সবাই ডবল-মার্চ ভঙ্গিতে পায়ে-পা মিলিয়ে চললাম সেদিক পানে। মুক্তিদা আমার কানে কানে একবার শুধু বললে: সত্যকে সামলো!

সে তো বটেই! মিথ্যার কারবার ফাঁদতে চলেছি, সত্যকে তো সামলাতে হবেই। কিন্তু কেমন করে কাজ হাসিল করতে চায় মুক্তিদা? এক গাঁ লোকের চোখের উপর দিয়ে অতবড় একটা কলার কাঁদি হাতসাফাই করা অসম্ভব। কিন্তু মুক্তিদার অসাধ্য কাজ নেই। গুটি গুটি আমরা গিয়ে পৌঁছলাম সেই বাড়ির সামনে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সেই কাঁকালে-শিশু চাষীভাই। তাঁর হাতে ঝকঝকে কাঁসার ঘটিতে একঘটি জল। বুঝলাম এটা তারই বাড়ি। জল নিয়ে আসছিল, সদলবলে আমাদের আসতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কচার বেড়া দেওয়া বাগানে কঞ্চি দিয়ে বানানো গেটটা খুলতে খুলতে মুক্তিদা বললে: ভিতরে আসতে পারি?

হতভম্ভ লোকটা চমকে উঠল: আজ্ঞে আসেন, আসেন!

জলের ঘটিটা হয়তো হাত থেকে পড়ে যেত, যদি না আমি হস্তগত করতাম সেটাকে! অনুমতি পেয়ে আমরা তার বাগানে ঢুকে পড়লাম সদলবলে। সমর প্রায় দাওয়া সই-সই করে পুঁতে ফেলল জরীপের একটা লাল নিশান। হরভজন সিং আর মঞ্জিম লোহার চেনটাকে হিড়হিড় করে টেনে এনে হাজির করল বাগানে। মেজারিং টেপটা বার করে সমর মাপতে শুরু করে খড়োচাল ঘরখানাকে: লম্বা—বাহান্ন ফুট তিন ইঞ্চি, চওড়া—বাইশ ফুট···প্লিন্থ দেড় ফুট··· ফ্রন্ট ডোর ছয়-বাই-আড়াই···

pathagar.net

গম্ভীরভাবে মুক্তিদা খাতায় নোট করে যাচ্ছে মাপ।

আমি এসবের মধ্যে নেই। ভিড়ের পিছনে চেপে ধরে আছি প্রিয়দাকে। কানে কানে বলছি: কোন কথা বললে খুনোখুনি হয়ে যাবে কিন্তু প্রিয়দা!

কৌতূহলী জনতা আমাদের লক্ষ্য করছে অবাক বিস্ময়ে। প্রৌঢ় চাষীটি আর স্থির থাকতে না পেরে হঠাৎ বলে বসল: আজ্ঞে আমার বাস্তু মাপতিছেন কেন?

খ্যাঁক করে ওঠে মুক্তিদা: কেন, মাপলে কি ক্ষয়ে যাবে?

আজ্ঞে না, বলতেছিলাম কি—

বলার কিছু নেই। কত বয়স এ বাড়ির?

আজ্ঞে? বাড়ির বয়স? সে কি রকম?

আবার ধমক লাগায় মুক্তিদা: বাড়ির বয়স বোঝেন না? কত দিন হল তৈরি হয়েছে এ বাড়ি?

আজ্ঞে তা তো জানি না, আমার কত্তাদাদা এ কোঠাখানা তুলেছেন, আর ঐ পিছনের ঘরখানায় জন্মেছিল আমার ঠাকুর।

সামনে দাঁড়ানো চশমা-চোখে এক ভদ্রলোককে হঠাৎ প্রশ্ন করে মঞ্জিম: আপনি আন্দাজ করতে পারেন, কত বছর হল তৈরি হয়েছে এ বাড়ি?

গ্রামবাসী হলেও চেহারা দেখেই বোঝা যায় ভদ্রলোক শিক্ষিত। চোখে চশমা, পায়ে স্যাণ্ডেল, গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবি। ভদ্রলোক বলেন: বলছি, কিন্তু কেন বলুন তো? হঠাৎ এ বাড়িটাকে আপনারা মাপছেনই বা কেন, আর এর বয়সই বা জানতে চাইছেন কেন?

মঞ্জিম অবাক হওয়ার ভান করে—কতদিন তৈরি হয়েছে না জানলে ডেপ্রিশিয়েটেড ভ্যালুটা কষে বার করব কেমন করে?

ডেপ্রিশিয়েটেড ভ্যালু! আপনারা কে মশাই? কি চান এখানে?

pathagar.net

মুক্তিদা এবার এগিয়ে আসে। দলপতি সে। রুমাল দিয়ে মুখটা মুছতে মুছতে বলে : বলছি, কিন্তু আপনি কে? এ গাঁয়ে থাকেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি এ গ্রামের প্রাইমারি স্কুল-টীচার।

ভাল, তাহলে আপনার সাহায্য নিতে হবে আমাদের। আমরা রেলের লোক। শুনুন মশাই। এখান দিয়ে রেলের একটা লাইন যাবে।

এখান দিয়ে?—চমকে ওঠে সকলে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, রামরাজাতলা টু মাকড়দা। ভায়া, ভায়া কি যেন? মনে থাকে না ছাই।

হরভজন পাদপূরণ করে—ভায়া চামরিল।

হ্যাঁ, রামরাজাতলা টু মাকড়দা ভায়া চামরিল।

ইণ্ডেক্স-ম্যাপটা বার করে দেখায়। লাল কালির দাগ দেওয়া আছে প্রস্তাবিত রেলের লাইনটা। গাঁয়ের উপর দিয়ে গিয়েছে দাগটা। কাগজপত্র উল্টে-পাল্টে দেখলেন ভদ্রলোক। সন্দেহ হবার কোন কারণ নেই। আমরা সবাই ভদ্রসন্তান। রামরাজাতলা থেকে মাঠ মাপতে মাপতে আসছি, সবাই দেখেছে। মুখ শুকিয়ে ওঠে সকলের। ওদের মুখপাত্র হিসেবে মাস্টারমশাই বলেন : এখান দিয়ে রেলের লাইন যাবে? আমাদের ঘরবাড়ি বাগান-বাস্তুর কি হবে?

একটা সিগারেট ধরিয়ে মুক্তিদা বললে : তাই তো আপনার সাহায্য চাইছি। প্রত্যেকটি প্লটের হিসাব নিতে হবে আমাকে। কয়েক বছরের মধ্যেই কম্পেনসেসন পেয়ে যাবেন সবাই।

মুক্তিদা থামে। প্রয়োজন ছিল এ বিরতির। এক নিশ্বাসে যে কথাটা বলে ফেলল মুক্তিদা, তা পরিপাক করতে হলে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন। বাপ-পিতামহের আমলের বাস্তু, বাগান, পাঠশালা, চণ্ডীমণ্ডপ, মন্দির সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার সংবাদটা কী ভীষণ মর্মান্তিক তা বুঝতে পারা যায় ওদের মুখের দিকে তাকালে।

pathagar.net

যেন জনতার মনের কথাটাই ধ্বনিত হল মঞ্জিমের কণ্ঠে : এক গ্লাস জল পাওয়া যাবে ?

মাস্টারমশাই সর্বপ্রথম সামলে নিতে পেরেছেন। বলেন : নিশ্চয়ই। ও ষষ্ঠীদাস, জল—আর শুধু জলই বা কেন, ডাব নেই ? সাহেবরা সারাদিন রোদে রোদে ঘুরে—

এল ডাব। এল দা। পাঁচজনে দশটা ডাব সাবাড় করলাম। দাঁতে দাঁত দিয়ে প্রিয়দা একা বসে রইল তেঁতুলতলায়। না, খাবে না ডাব। তেষ্টা পায় নি তার।

আমরা বসলাম বাগানে, গাছের ছায়ায়। ছেলে-ছোকরাদের হটিয়ে দিয়ে গ্রামের মোড়ল শ্রেণীর কয়েকজন ঘনিয়ে আসে। ষষ্ঠীদাসের অন্দরমহলে কেমন করে জানি দুঃসংবাদটা পৌঁছে গেছে। চাপা কান্না ভেসে আসছে সেদিক থেকে। ষষ্ঠীদাস একবার যায় অন্দরে, একবার আসে বাইরে। আর একা কি ষষ্ঠীদাস ? চরণ মণ্ডল, ভূপতি মণ্ডল, শ্রীপতি সাধুখাঁ, মাস্টারমশাই—সবাই অনুনয় বিনয় শুরু করেছেন। একটু বাঁচিয়ে, গ্রামটাকে বাঁচিয়ে রেল-লাইনটাকে নিয়ে যাওয়া যায় না ?

ওদিকে দূরে তেঁতুলগাছ তলার প্রিয়দা লম্বা হয়ে পড়েছে। এদিকে মুক্তিদা তখন আসর জমিয়ে বসেছে : আরে মশাই, আমাদেরই কি তা ইচ্ছে নয় ? আমাদেরও তো ঘরবাড়ি কাচ্চা বাচ্চা আছে—নাকি আমরা সবাই বিলেত থেকে এসেচি ? আমরা তো বলেও ছিলাম গাঁয়ের মাঝখান দিয়ে না গিয়ে যদি গাঁয়ের কান ঘেঁষে রেল-লাইনটা যায় তাহলে কত সুবিধা হত আপনাদের। লেখালিখি করে আপনারা একটা স্টেশানও করে নিতে পারতেন এখানে। শহরে যাওয়া হত তখন হাসিখেলার কাজ। দশ মিনিটের পথ !

চোখগুলো বড় বড় হয়ে যায় ওদের। বলে : দয়া করে যদি—

আরে আমরাও তো তাই চাই। খেসারত আর কতটুকু পাবেন বলুন ? জমি তো—যা দেখচি—সোনা ফলানো।

pathagar.net

আজ্ঞে, তা আর বলতে। আমের সময় এলে দেখাতাম। ভূতো-বোম্বাই যা হয়—তাছাড়া ধরুন—

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। ওঃ! ছাখ নরেন ছাখ, কি বাহার··· অ্যাই আঙুল দেখাসনে!

কি কলা তো? জাত মর্তমান! দেখবেন পরখ করে?

না না, সে কি! গাছেই তো ওর শোভা!

কি যে বলেন! একি ফুল?—ওহে ষষ্ঠীদাস···

আজ্ঞে এক্ষুনি আনছি।

নেমে এল কলার কাঁদি! শুধু কি কলা? কলা খাওয়ার পর নাকি জল খেতে নেই। ফলে এল নাড়ু মুড়ি-পাটালি, মাঁয় চন্দ্রপুলি!

পরিপাটি আহার করিয়ে মাস্টারমশাই হাত দু'টি কচলে বলেন: আপনারা ইচ্ছে করলে কি না পারেন স্যার? লাইনটাকে যদি একটু বাঁকিয়ে—

মুক্তিদা সুরটা নামিয়ে চুপি চুপি বলে: বললাম তো। আমরা কী করতে পারি? আমাদের যিনি বড়কর্তা তিনি যে রাজি নন। ভারী কড়া মেজাজের লোক।

তাঁকে একবার এখানে আনতে পারেন না? আমরা সবাই মিলে তাঁর হাতে পায়ে ধরতাম।

আনব কি মশাই? তিনিও এসেছেন, দেখলেন না একেবারে জলস্পর্শ করলেন না এখানে।

সে কি! কই তিনি?

নির্বিকারভাবে মুক্তিদা দেখিয়ে দিল তেঁতুলগাছ-তলায় লম্বমান সত্যপ্রিয় আচার্যকে।

কী সর্বনাশ। চমকে উঠল জনতা। চন্দ্রপুলি, নারকেল-নাড়ু আর ডাব নিয়ে ছুটল সবাই ঘুমন্ত মানুষটাকে আপ্যায়ন করতে!

pathagar.net

কি কথা থেকে কি কথায় এসে পড়েছি। বলছিলাম যে যারা জরীপ করে, অথচ বলে জীবনে কখনও গোঁজামিল দেয়নি তারা স্রেফ মিছে কথা বলে। এই কথা সত্যপ্রিয়দা মানত না। তার ফলাফলটা কি হয়েছিল এবার তাই বলব।

সেকেণ্ড-ইয়ারে সার্ভে পরীক্ষার দিন। সকাল আটটায় হাজিরা দিলাম কলেজের খেলার মাঠে। পোশাকী নাম 'ওভাল'। অধ্যাপক ঘোষসাহেব দেখালেন মাঠের মাঝখানে হাত তিনেক লম্বা একটা খুঁটি পোঁতা আছে। বললেন, ঐ খুঁটির মাথার ডেটাম লেভ্‌ল হচ্ছে ০′-০″। প্রত্যেকের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল এক একখানা ম্যাপ। তাতে লালকালির দাগ দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন রুট দেখানো আছে। কেউ যাবে বোটানিক্সের দিকে, কেউ যাবে বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে, কাউকে যেতে হবে ফোর-শোর রোড হয়ে শালিমার গেট। চক্রাকারে ঘুরে এসে প্রত্যেকেই যাত্রা শেষ করবে আবার সেই একই খুঁটির মাথায়। পথে নির্দেশিত কালভার্টের উপর, চিহ্নিত বাড়ির প্লিন্থে, অথবা মাইল স্টোনের মাথায় লেভ্‌ল নিতে হবে। দুপুরে একঘণ্টা খাওয়ার ছুটি ও বেলায় এসে এই যাত্রা পথের একটা লেভ্‌ল-সেকসান এঁকে খাতা জমা দিতে হবে।

আমরা যাত্রা করলাম একে একে—কেউ উত্তরমুখো—কেউ দক্ষিণপানে। ব্যাক-ফোর, ব্যাকফোর করতে করতে দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়লাম সবাই। বেলা বারোটা-একটা নাগাদ বিভিন্ন পথের যাত্রী আবার ফিরে এল ওভাল-মাঠে। শেষ মাপ নিল সেই খুঁটির মাথায়। দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর এসে বসলাম হিসাব করতে। অপরের কথা জানি না। আমার নিজের কথা বলতে পারি। আমি গিয়েছিলাম কোম্পানীর বাগানের দিকে। ০′-০″ লেভেল থেকে যাত্রা শুরু করে সাতসমুদ্র তের নদী পার হয়ে ফিরে এসে সেই খুঁটির মাথায় লেভেল পাচ্ছি—৩½ ইঞ্চি! অঙ্কশাস্ত্র অনুযায়ী যা নাকি অসম্ভব। যাত্রা পথে কখনও উঠেছি উঁচুতে—কখনও নেমেছি

pathagar.net

নিচুতে—কিন্তু যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছি সেখানেই যখন শেষ লেভেল নিচ্ছি তখন শেষ মাপ ০´-০″ হওয়া উচিত। নির্ঘাত ভুল করেছি কোথাও। ক্লক-টাওয়ারে দেখলাম নির্দিষ্ট সময়ের অল্পই বাকি আছে। যোগ-বিয়োগ করতেই ভুল হল, না রিডিং পড়তে ভুল করেছি এখন আর তা খুঁজে বার করা যাবে না। কিন্তু অঙ্কের শেষ ফলাফল যখন জানা আছে—তখন আর ভয় কি? প্রত্যেকটি রিডিং-এ এক ইঞ্চির অতি সূক্ষ্ম এক ভাগ খাপিয়ে দিয়ে সাড়ে তিন ইঞ্চি গড়বড় চালিয়ে দিলাম দু মাইল পথের এখানে ওখানে। যাতে শেষ মাপ দাঁড়াল সেই প্রত্যাশিত ০´-০″। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

খাতা জমা দিয়ে ফিরে আসছি হস্টেলমুখো, পথে প্রিয়দার সঙ্গে দেখা।

কেমন পরীক্ষা দিলে? প্রশ্ন করলাম তাকে।

ভাল নয়। সংক্ষেপে বলল ও।

কেন? ভাল নয় কেন?

ভাই আমি কোথাও না কোথাও ভুল করেছি। সাড়ে তিন ইঞ্চি ভুল হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

কেমন যেন খটকা লাগল: সেই সাড়ে তিন ইঞ্চি! বললাম: তা কি করলে তুমি?

লিখে দিয়ে এলুম উত্তর শূন্য-শূন্য হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমি পাচ্ছি মাইনাস ৩½″! সুতরাং বুঝতে হবে জরীপে কোথাও ভুল হয়েছে আমার। ফলে লেভ্‌ল-সেকসান টানার কোন অর্থ হয় না! এই কথা লিখে খাতা সাবমিট করেছি।

গাধা, গাধা! আস্ত গাধা তুমি একটা। ধমকে উঠেছিলাম আমি। মাত্র সাড়ে তিন ইঞ্চি ফাজিং করতে পারলে না?

প্রিয়দা ম্লান হেসে বলল: কই আর পারলুম।

আমি হোহো করে হেসে উঠলুম ওর নির্বুদ্ধিতায়।

pathagar.net

আমার সে হাসি কিন্তু স্থায়ী হয় নি। ফল বের হলে দেখা গেল ক্লাসসুদ্ধ আমাদের সকলেরই এক হাল—একমাত্র হালে পানি পেয়েছে প্রিয়দা—ব্ল্যাঙ্ক-পেপার সাবমিট করে। আমরা সকলে দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবার পর পরীক্ষক মশাই খুঁটির মাথায় হাতুড়ির বাড়ি মেরে সেটাকে সাড়ে তিন ইঞ্চি পরিমাণ মাটিতে বসিয়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ যার অঙ্ক ৩½" পরিমাণ ভুল হবে সেই ঠিক জরীপ করেছে।

ক্লাসসুদ্ধ বুদ্ধিমান ছেলের দল ভুল না করে ফেল করেছে। আর গর্দভ-শিরোমণি সত্যপ্রিয় আচার্য ভুল করে পাস করল।

যাঁরা মনে করেন কথাসাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য হল সত্যের জয় এবং অসত্যের পরাজয় দেখানো, অর্থাৎ যেসব ঈশপ-পন্থী পাঠক গল্পের শেষে 'মরাল' খোঁজেন, তাঁদের কাছে আমার সবিনয় নিবেদন: বই বন্ধ করুন। আমার গল্প শেষ হয়েছে। এ গল্পের যা 'মরাল' তা এখানেই বুঝে নিতে হবে। এর পরবর্তী অংশটা তাঁরা যেন না পড়েন।

কারণ আমার কাহিনীর নায়ক সত্যপ্রিয় আচার্যের জীবনে এই একটি মাত্রই সাফল্যমণ্ডিত খণ্ড-কাহিনী।

প্রিয়দা আমাদের এক ক্লাস ওপরে পড়ত। প্র্যাকটিকাল কেমিস্ট্রিতে ফেল করে আমাদের সতীর্থ হয়ে পড়ে। সে ফেল করার ইতিহাসটা করুণ। তিনটে করে সল্ট থাকতো এক এক পুরিয়ায়। ঈশাক বেহারার অনেকদিনের পুরানো ব্যবসা। সল্ট-পিছু পাঁচটাকা —তে পাঁচে পনের টাকা ঈশাক-বেহারার হাতে দিলেই তিনটে রাসায়নিক সল্টের নাম জানা যায়। অভিধানে যাকে অ্যাসিড-টেস্ট বলে আমরা তাকে বলতুম ইশাক-টেস্ট। ইশাক-টেস্ট অমোঘ অব্যর্থ! সত্যপ্রিয় আচার্য এই পনেরটি টাকা খরচ করতে রাজি হয়নি—ফলে পাস করতে পরেনি সে বছর।

প্রিয়দাকে পরে একদিন প্রশ্ন করেছিলাম: আচ্ছা এখন

তোমার দুঃখ হয় না? মাত্র পনেরটা টাকার জন্যে একটা বছর নষ্ট হল তোমার।

প্রিয়দা বলেছিল: ভুল বললি। ঠিক পনের টাকা নয়, আমাকে দিতে হত তার কিছু বেশী—

কিছু বেশী মানে?

প্রিয়দা হেসেছিল। বলেছিল: তাহলে তোকে একটা গল্প শোনাতে হয়। আমার বুড়ো ঠাকুরদার বাবার গল্প। সত্যসিন্ধু তর্কপঞ্চাননের গল্প।

প্রিয়দার বাড়ি নবদ্বীপে। বিখ্যাত পণ্ডিত-বংশের সন্তান। সত্যপ্রিয়ের পিতামহ সত্যানন্দ তর্করত্ন নবদ্বীপের স্বনামধন্য স্মার্ত পণ্ডিত। প্রিয়দার বাবাকে আমি দেখিনি—বস্তুত প্রিয়দা নিজেই তাঁকে দেখেনি। শৈশবেই সে পিতৃহীন হয়—মাত্র চার বৎসর বয়সে হারায় মাকে। এই তর্করত্নই তাকে মানুষ করে তোলেন। সেই স্থিতপ্রজ্ঞ বৃদ্ধ আচার্যকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। মাত্র একবার। অদ্ভুত পরিবেশে। সেবার আমরা বি. ই. কলেজ থেকে দল বেঁধে বর্ধমান গিয়েছিলাম, রণ্ডিয়া ড্যাম দেখতে। গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোডে ছাত্র বোঝাই গাড়িটায় হল মারাত্মক দুর্ঘটনা। আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয় হরভজন সিং ঘটনাস্থলেই মারা যায়। আর সর্ব-সমেত প্রায় জনা কুড়ি আহত হয়ে আশ্রয় নেয় বর্ধমানের ফ্রেজার হাসপাতালে। আমিও ছিলাম সেই দলে। অলৌকিকভাবে আমার প্রাণরক্ষা হয়। আমার কোন আঘাত লাগেনি। প্রিয়দা আহত হয়েছিল। সংবাদ পেয়ে অশীতিপর বৃদ্ধ তর্করত্নমশাই এসেছিলেন নবদ্বীপ থেকে বর্ধমান। সঙ্গে এসেছিল তাঁর পুরাতন ভৃত্য দশরথ দাশ। প্রিয়দার দশরথদা। সেবার তর্করত্নমশাইকে দেখেছিলাম। সাদা চুল, সাদা দাড়ি—পাকা পেয়ারাফুলি আমটির মতো টুকটুকে চেহারা—টকটক করছে গায়ের রঙ। অত বয়সেও তিনি সোজা হয়ে হাঁটছিলেন। ছয়ফুট লম্বা দীর্ঘকায় পুরুষ। মুখের এবং হাতের

পেশী কুঞ্চিত। তবু মনে হয়েছিল জরা তার দেহটাকে যেন ভাল করে গ্রাস করতে পারছে না—মন আছে সম্পূর্ণ অস্পৃশ্য। ফ্রেজার হাসপাতালের চওড়া করিডরে দেখা সেই বৃদ্ধকে আজও চোখ বুজলে আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। তাঁকে ভোলা যায় না। কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য তাঁর সেদিনের ব্যবহার। সে সব কথা যথাস্থানে বলব।

তর্করত্নের যৌবনে তিনি ছিলেন নবদ্বীপের সবচেয়ে নামকরা পণ্ডিত। তাঁর গৃহেই ছিল চতুষ্পাঠী—বিখ্যাত "পঞ্চানন চতুষ্পাঠী"। সেখানে পড়তে আসত দেশ-বিদেশ থেকে মেধাবী ছাত্রের দল। তর্করত্ন জীবনে কখনও অন্যায় কাজ করেননি—কখনও কারও কাছে মাথা নিচু করেননি। আশ্চর্য যোগাযোগ, এঁকেও মানুষ করেছিলেন এঁর ঠাকুরদা—বাবা নয়।

প্রিয়দার বাল্য আর কৈশোর ছিল প্রায় স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত। একমাত্র জয়দুর্গার স্নেহচ্ছায়া কিছুটা পেয়েছিল বেচারা। গঙ্গার ধারে ওদের সাতপুরুষের ভিটে। পূর্ব-দুয়ারি বড় ঘরখানাই পঞ্চানন চতুষ্পাঠী। মাটির দেওয়াল, খড়ের ছাউনি। জয়দুর্গার সযত্ন গোময় প্রলেপনে ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে। তর্করত্ন খড়মজোড়া খুলে এ চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ করতেন—এখানকার প্রতিটি ধূলিকণা তর্কবাগীশ তর্কপঞ্চাননের পদধূলির স্মৃতি বহন করছে। ভিতরবাড়িতে পাশাপাশি দুখানি খড়ের চালা। একটি রান্নাঘর, অপরটিতে রাত্রিবাস করতেন তর্করত্ন পৌত্রকে নিয়ে। পাকঘরের পাশে গোশালা তারই সংলগ্ন একচালাখানায় থাকত সস্ত্রীক দশরথ। দশরথ দাশ, তর্করত্নের পুরাতন ভৃত্য। শৈশব থেকেই সে এ পরিবারভুক্ত। প্রায় সন্তানের মতোই তাকে মানুষ করেছিলেন তর্করত্নমশাই। বাঘ-আঁচড়া গাঁয়ের একটি যজমানের মহাল থেকে সুলক্ষণা একটি কন্যাকে এনেছিলেন দশরথের বউ করে। জয়দুর্গা। জয়দুর্গার কোন সন্তানাদি ছিল না। ওরা স্বামী-স্ত্রীতে পণ্ডিতমশায়ের বাড়ির যাবতীয় কাজ করে দিত।



Pathagar.net

প্রিয়দা জয়দুর্গাকে বোঠান ডাকত। তার দশরথদা আর বোঠানের অনেক গল্প সে করেছিল আমাকে। সেসব গল্প শুনেও আমি বহুদিন পর্যন্ত জানতে পারিনি যে দশরথদার সঙ্গে ওর কোন রক্তের সম্পর্ক নেই। বস্তুত দশরথদা ব্রাহ্মণই নয়, কায়স্থ। তবু সে ছিল ঐ পরিবারের একজন। শুধুমাত্র রান্নাঘরে তাদের প্রবেশধিকার ছিল না। স্বপাক আহার করতেন তর্করত্ন—প্রিয়দাকেও খেতে হত ঐ হেঁশেলে।

কুলধর্ম অনুসারে নিজের চতুষ্পাঠীতেই ভর্তি করেছিলেন পৌত্রকে। কিন্তু শুধু মুগ্ধবোধে মুগ্ধ হয়ে বসে থাকবার মতো ছেলে প্রিয়দা নয়। যুগের হাওয়া পাল্টাচ্ছে। খড়োচাল চতুষ্পাঠীর সামনেই উঠেছে হাইস্কুলের দ্বিতলবাড়ি। সেখানে দেওয়ালে দেওয়ালে ছবি, ম্যাপ। সেখানকার ছেলেরা দলবেঁধে ফুটবল টুর্নামেণ্ট খেলতে যায় কৃষ্ণনগরে, শান্তিপুরে, দিগনগরে, রানাঘাটে। প্রিয়দা মুগ্ধ হয়ে দেখত ওদের কাণ্ড-কারখানা। স্কুলবাড়ির সংলগ্ন হেডমাস্টারমশায়ের কোয়ার্টার্স। চতুষ্পাঠীর পাশেই। হেডমাস্টারমশায়ের ছেলে দুলাল, ওর প্রায় সমবয়সী। বন্ধুর সঙ্গে মাস্টারমশায়ের বাড়ি খেলতে যেত যখন তখন। দেখে আসত ছবির বই, গ্লোব, ইংরেজি গল্পের বই। দুলাল বই পড়ে শোনাত—ও শুনত। আর এক দুনিয়া প্রিয়দাকে হাতছানি দিয়ে ডাকত যেন। ওর উৎসাহ দেখে হেডমাস্টার সুকমল মিত্রমশাই ওকে দিয়েছিলেন খানকয়েক ইংরেজি বই, তর্করত্নের অজ্ঞাতে। প্রিয়দা বলে, তার জীবনের মোড় ঘুরে যায় একখানা ইংরেজি বইয়ে—ক্যারলের অ্যালিস্ অ্যাডভেঞ্চার ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড। প্রচণ্ড ভাল লেগেছিল ওর। অভিধান দেখে সব অজানা কথার মানেগুলো পেন্সিলে আগে লিখে নিয়েছিল মার্জিনে। পড়ে পড়ে প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছিল বইখানি। প্রিয়দার মনে হত ইংরেজি শিখতে পারলে তবেই সে ঢুকতে পারবে ঐ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডে। সেই আজবদেশে ঢোকার ঐ যে ছোট্ট দরজা—ওর চাবিটা সে দেখতে পাচ্ছে স্ফটিকের টেবিলের উপর। অথচ বেচারা

নিরুপায়। হাত বাড়িয়ে সেই সোনার চাবিটা হস্তগত করবার কোন উপায় নেই।

একদিন হেডমাস্টারমশায়ের বাড়িতে বসে সে বইখানা পড়ছে। মিত্রমশাই কখন ঘরে ঢুকেছেন তা সে জানতে পারেনি। উনি কাছে এসে উঁকি মেরে দেখলেন বইখানা কি। তারপর সস্নেহে বললেন : ছবি দেখছ? এর একটা বাংলা অনুবাদ আছে আমার কাছে। পড়বে?

প্রিয়দা উত্তরে বলেছিল : আমি এ বইখানাও পড়তে পারি।

তাই নাকি। কই পড়তো।

গড় গড় করে খানিকটা রিডিং পড়ে গিয়েছিল প্রিয়দা। স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন হেডমাস্টারমশাই। নিজ আয়াসে যে ছেলে এতদূর এগিয়ে যেতে পারে—একটু সাহায্য করলে সে ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পাবেই। সেদিনই তিনি দেখা করলেন তর্করত্নমশায়ের সঙ্গে। সব কথা বলে অনুরোধ করলেন : এমন মেধাবী ছাত্রকে ইংরেজি-শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করলে অন্যায় করা হবে।

ভ্রূকুঞ্চিত হয়েছিল তর্করত্নের। উত্তরে বলেছিলেন : শুধু মেধাবী ছাত্ররাই ইংরেজি শিখবে আর নির্বোধ ছাত্রের দল সংস্কৃত টোলে পড়তে আসবে এ ধারণা হল কেন আপনার?

মিত্রমশাই বলেছিলেন : আমি সে কথা বলিনি পণ্ডিতমশাই। আমি বলি, আপনি ওকে সংস্কৃত ইংরেজি দুটি ভাষাই শেখবার সুযোগ দিন। আপনার কাছে দিনের বেলা ও সংস্কৃত শিখছে শিখুক—সন্ধ্যার পর ও আমার কাছে ইংরেজিও শিখবে। ওর জ্ঞানবুদ্ধি হলে যে পথে ও যেতে চাইবে ওকে সেই পথেই যেতে দিন। অপরিণত একটি বালকের উপর আপনার বা আমার ধ্যানধারণার বোঝা চাপিয়ে দেবার অধিকার আপনারও নেই, আমারও নেই।

অনেকক্ষণ কি যেন চিন্তা করে সম্মত হয়েছিলেন তর্করত্ন। শুরু হল প্রিয়দার দু-নৌকায় পা দিয়ে চলা। দিনে কৃৎ-তদ্ধিত-সন্ধি

Pathagar.net

সমাস আর রাত্রে ল্যাম্বস্ টেলস্ ফ্রম শেক্সপীয়র, রবিনহুড, জুলে ভার্ন।

মাত্র এগারো বৎসর বয়সে ওর উপনয়ন হল। এতে আপত্তি জানিয়েছিলেন মিত্রমশাই, বলেছিলেন আর একটু বড় হোক। ব্রহ্মচর্য পালন করান—কিন্তু শব্দটার অর্থ আগে ওকে বুঝতে দিন।

তর্করত্ন রাজি হননি। এই বয়সে তাঁর নিজেরও উপনয়ন হয়েছিল। কৌলিক প্রথা মেনে চলেছিলেন তিনি। নিজেই গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। তিনিই হলেন আচার্য। এই উপলক্ষ্যেই বাধল প্রথম সংঘাত। একাদশবর্ষীয় দণ্ডী সত্যপ্রিয় আচার্য বনাম একাত্তর বৎসরের বৃদ্ধ সত্যানন্দ তর্করত্ন।

আচার্যের আদেশ ছিল ব্রহ্মচারী যেন দণ্ডীঘরের বাইরে না আসে। সূর্যের মুখ দেখবে না, অব্রাহ্মণের ছায়া মাড়াবে না। সে আদেশ অমান্য করেছিল কিশোর ব্রহ্মচারী। জেনে শুনেই অমান্য করেছিল। হেডমাস্টারমশাই ব্রতভিক্ষা দিতে এলেন। একটি কাঁসার রেকাবিতে চাল কাঁচকলা, পৈতা। একগলা ঘোমটা দিয়ে প্রিয়দা ঝোলাটি বাড়িয়ে ধরল। হেডমাস্টারমশাই বললেন? না বাবা, তোমার ঝোলায় ভিক্ষা দেব না আমি।

ব্রহ্মচারীর পায়ের কাছে নামিয়ে রাখেন তিনি রেকাবিখানা। সত্যদা মুহূর্তে তুলে নিল সেখানা—চাল-কলা সব ঢেলে দিল নিজের ঝোলায়।

বাধা দিতে গিয়ে থেমে পড়েছিলেন মিত্রমশাই : ছি ছি ছি—কী করলে তুমি! অব্রাহ্মণের দান যে তোমার আজ নিতে নেই।

মাথার ঘোমটা খুলে ফেলে প্রিয়দা বলেছিল : আপনিও আমার গুরু। আচম্‌কা নত হয়ে সে প্রণাম করতে গেল মিত্রমশাইকে।

না না না, আর্তনাদ করে শিউরে সরে গেলেন হেডমাস্টার-মশাই। তুমি ব্রাহ্মণ, আমাকে প্রণাম করতে নেই। লজ্জায় মুখ লুকিয়ে একরকম ছুটেই পালিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

pathagar.net

একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলেন তর্করত্ন। একটি কথাও বলেননি তিনি। শুধু জয়দুর্গা যখন এসে বললে : 'খোকাবাবুর চরুর ব্যবস্থাটা এবার করে দিন আপনে', তখন তিনি বলেছিলেন·····আজ আমাদের দুজনেরই উপবাস। ও অন্নে চরু হয় না!

প্রিয়দার সঙ্গে দশদিন কোন কথা বলেননি। দণ্ডীঘরের রুদ্ধকারায় ছটফট করত প্রিয়দা···কিন্তু উপায় নেই। তার নিঃসঙ্গ বন্দী জীবনের কেউ ভাগীদার এল না।

দণ্ডীঘর থেকে মুক্তি পেতেই তর্করত্ন ওকে নিয়ে গেলেন হেডমাস্টারমহাশয়ের কাছে, বললেন, আপনারই জয় হয়েছে। নিন, ওকে আপনার হাতেই তুলে দিলাম।

শশব্যস্তে হেডমাস্টারমশাই তর্করত্নের পদধূলি নিয়ে বলেন : ছি ছি ছি? এ কী বলছেন আপনি। জয়পরাজয় কিসের? ওকে যদি আপনি আমার হাতে দেন সে তো আমার সৌভাগ্য—কিন্তু তাতে তো আপনারই গৌরব। প্রমাণ হবে আপনি সংস্কারান্ধ নন। পণ্ডিতমশাই···ইংরেজি ভাষাটা অস্পৃশ্য নয়—আজকের দুনিয়ায় মানুষ হতে হলেই ইংরেজি বিদ্যার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

তর্করত্ন হেসে বলেছিলেন : মিত্রমশাই, ঈশোপনিষদে একটি শ্লোক আছে, "অন্ধংতমঃ প্রবিষ্যন্তি যেবিদ্যামুপাসতে, ততো ভূয়ঃ এযতে তমঃ য উ বিদ্যায়াম্ রতা।" অর্থাৎ যে অবিদ্যার উপাসনা করে সে অন্ধকার তমে প্রবেশ করে, কিন্তু যে বিদ্যার উপাসনা করে সে আরও অন্ধকার তমে প্রবেশ করে। শ্লোকটার বিষয়ে আমার কিছু অনুপপত্তি ছিল। যে উপনিষদকার বারে বারে বলেছেন 'বিদ্যয়া অমৃতমশ্নুতে'—কেন তিনি হঠাৎ বললেন, অবিদ্যার চেয়ে বিদ্যা আমাদের অন্ধকারতম তমতে নিয়ে যায়? আপনার মুখে ঐ ইংরেজি শিক্ষার অপরাবিদ্যা মানুষ হবার একমাত্র পথ একথা শুনে আজ আমার সে অনুপপত্তি ঘুচল!

নবদ্বীপের উচ্চ ইংরেজি স্কুল থেকে স্কলারশিপ নিয়ে পাস করল

pathagar.net

একদিন। স্থির হল এবার সে কলকাতা যাবে। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়বে। তর্করত্নমশাই ওকে কাছে ডেকে বলেছিলেন: এতদিন তুমি আমার প্রভাবের ভিতর ছিলে, এখন বৃহত্তর জীবনে প্রবেশ করতে চলেছ। আমি কি চাই তা তুমি জান, কিন্তু শুধু আমার সন্তোষবিধানের জন্যই যদি তুমি বিচার-আচারগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে মেনে চল তাহলে শান্তি আমি পাব না। আমি চাই তুমি নিজের বিচার বুদ্ধি দিয়ে এগুলি ভাল বলে অনুভব কর এবং নিজ-বিবেকের নির্দেশ অনুসারেই এসব আচার মেনে চল।

প্রিয়দা কোন উত্তর দেয়নি।

তোমাকে আমার পূর্বপুরুষদের কাহিনী আজ কিছু শোনাব। এখন তুমি বড় হয়েছ, সব বুঝতে পারবে। তুমি অনুভব করতে পারবে পূর্বাচার্যের কোন ঐতিহ্যের ধারা বহন করবার কঠিন দায়িত্ব দিয়ে মদনমোহন তোমাকে এ সংসারে পাঠিয়েছেন। বস তুমি। শোন সব কথা।

প্রিয়দা চুপ করে বসে শুনেছিল। গল্প নয়, সত্য ঘটনা। ওর পূর্বপুরুষদের কাহিনী। সত্যানন্দ, সত্যশরণ, সত্যসিন্ধুর কাহিনী। বৃদ্ধ বলেছিলেন: তোমার সঙ্গে আমার জীবনের একটা আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। তুমি শৈশবেই হারিয়েছ তোমার বাবাকে—বাল্যেই হারিয়েছে তোমার মাকে। জ্ঞান হয়ে তুমি দেখতে পেয়েছিলে একমাত্র আমাকেই। তোমার পিতামহকে। আমি তোমার চেয়েও দুর্ভাগা। বাল্যে নয়, শৈশবে নয় একেবারে জন্ম মুহূর্তে আমি একই সঙ্গে হারিয়েছি আমার বাবা আর মাকে। জ্ঞান হবার পর আমিও দেখতে পেয়েছিলাম, আমার পিতামহকে! শালপ্রাংশু মহাভুজ ব্যক্তি ছিলেন তিনি। তাঁর নাম তুমি শুনেছ—তিনি সত্যসিন্ধু তর্কপঞ্চানন। তাঁরই নামানুসারে আমাদের চতুষ্পাঠীর নাম পঞ্চাননের চতুষ্পাঠী।

pathagar.net

একটু চুপ করে থেকে আবার বলেন : না, সব কথাই বলব তোমাকে। আমার বয়স তখন ষোল-সতের। উপাধি পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি আমি। আমার ঠাকুরদা তর্কপঞ্চানন তখন আশি পার হয়েছেন। দীর্ঘকায় মানুষ ছিলেন তিনি। সারা নবদ্বীপ তাঁকে সম্ভ্রম করত, সমীহ করত। সারা জেলার লোক নাম জানত তাঁর। তাঁরই চতুষ্পঠীতে—ঐ বাইরের আটচালায় পাঠ নিতাম তাঁর কাছে। একবার ঠাকুরদার এক যজমান এলেন আমাদের বাড়িতে শান্তিপুর থেকে। নামটা আর করব না, সঙ্গে এলেন তাঁর বিধবা বোন, স্ত্রী আর মেয়ে। মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী। শান্তিপুরে রাসের মেলায় রাইরাজা সাজতো সে। দিন সাতেক তাঁরা ছিলেন আমাদের বাস্তুতে। আমিই তাঁদের সব দেখিয়ে নিয়ে আসতাম। পোড়ামাতলা, সোনার গৌরাঙ্গ, অক্ষয় বট। তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছ তোমার কাছে সঙ্কোচ করব না। মেয়েটির প্রতি আমার অনুরাগ সঞ্চারিত হয়েছিল। তার কথা জানি না, কিন্তু তার বাবা নিজে থেকেই প্রস্তাব করেছিলেন—আমাকে জামাতারূপে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তিনি। ওঁরা শান্তিপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পরিবার। আমাদেরই স্বজাতি। স্বঘর। তবু সম্মত হননি আমার ঠাকুরদা। পট্টন্তরী করবেন না তিনি।

বাধা দিয়ে প্রিয়দা বলে : পট্টন্তরী কি ?

আমরা নিরাবিল পটি। আমাদের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের আটটি পটি আছে। কেউ উচ্চ কেউ নীচ। নিরাবিল পটির সর্বোচ্চে স্থান। ওঁরা ছিলেন ভূষণে পটি। ঠাকুরদা পট্টন্তরী করতে রাজি হলেন না। আমি মর্মাহত হয়ে ছিলাম, কিন্তু বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছিলাম তাঁর নির্দেশ।

আবার বাধা দিয়ে প্রিয়দা বলেছিল : কিন্তু সে কি তাঁর সন্তোষবিধানের জন্যই না কি নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী ?

তর্করত্ন চোখ দুটি বুজে আত্মসমীক্ষা করে নেন কয়েকটা মুহূর্ত।

pathagar.net

তারপর বলেন : না, নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী মেনে নিয়েছিলাম পট্টস্তরী করা ভাল নয়।

এখনও আপনার সেই মত আছে ?

না নেই। সমাজ পট্টস্তরী মেনে নিয়েছে। নাটোরের স্বনামধন্য মহারাজা উদ্যোগী হয়ে আটপটি সমন্বয় করেছেন।

তাহলে এখন তো বোঝেন যে ভুল হয়েছিল আপনাদের।

তা কেন ? সেদিনকার বিচারে সেটাই সত্য ছিল, আজকের বিচার যেমন এটা।

সত্য কি তাহলে আপেক্ষিক ?

লৌকিক সত্য তো বটেই। লক্ষহীরার গল্প শুনে তুমি সেদিন চঞ্চল হয়ে উঠেছিলে—বলেছিলে লক্ষহীরা নির্বোধ। তোমাদের যুগের ধারণায় তোমরা তাই বল—আমাদের যুগের ধারণায় লক্ষহীরার আদর্শ শ্রদ্ধার্হ।

প্রিয়দা এ তর্ককে এড়িয়ে গিয়ে বলেছিল : আপনি তর্কপঞ্চাননের কি গল্প বলেছিলেন, বলুন।

হ্যাঁ বলি। দেখ, আজকের দিনে তোমাদের আদর্শের সঙ্গে মেলে কিনা।

তর্কপঞ্চাননের কাহিনী এবার শুনিয়েছিলেন তিনি।

সত্যসিন্ধু তর্কপঞ্চানন ছিলেন তাঁর আমলে নবদ্বীপের উজ্জ্বলতম রত্ন। শিবনাথ বাচস্পতি আর বুনো রামনাথের দেহরক্ষার পর নবদ্বীপের জ্ঞানচর্চায় যে ছেদ পড়েনি তার জন্য তর্কপঞ্চানন নদীয়ার নমস্য। কলকাতায় রাজা নবকৃষ্ণের প্রাসাদে বুনো রামনাথ একবার পশ্চিমাগত এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের গর্ব খর্ব করেন। ত্রিবেণীর বিখ্যাত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননও উপস্থিত ছিলেন সে সভায়। সত্যসিন্ধু তখন কিশোর। তিনিও এসেছিলেন বিতর্ক সভায় রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের প্রিয় শিষ্যরূপে।

গুরুর দেহান্তে গুরুর আদর্শে তিনি গঙ্গাতীরে অনাড়ম্বর এক

pathagar.net

চতুষ্পাঠীতে নব্যন্যায়ের চর্চা শুরু করেন। আজীবন ডুবে ছিলেন, জ্ঞানচর্চায়। বিবাহ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর দাম্পত্যজীবন ছিল সংক্ষিপ্ত। প্রথম সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়েই পণ্ডিত গৃহিণীর লোকান্তর ঘটে। সে বহুবিবাহের যুগেও সত্যসিন্ধু কিন্তু দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নি। বুকের পাঁজরের মতো মানুষ করেছিলেন একমাত্র বংশধরকে। পণ্ডিতের গৃহে আশ্রিতা ছিলেন জগু ঠাকরুণ। কুলীনঘরের বাল্যবিধবা। গ্রাম সম্পর্কে তর্কপঞ্চাননের দিদি। ভ্রাতৃজায়ার মৃত্যুর পর মাতৃহীন শিশুকে তিনি বুকে তুলে নিলেন। স্ত্রী-বিয়োগের পর সেই প্রথম যৌবন থেকেই তর্কপঞ্চানন বিধবাদের পালনীয় সমস্ত বিধিনিষেধ মেনে চলতেন। একাহারী ছিলেন তিনি। অধ্যয়ন আর অধ্যাপন ছিল তাঁর বৃত্তি। চতুষ্পাঠীতে দেশ-দেশান্তর থেকে ছাত্ররা আসত—তাদের ঘিরেই ছিল তাঁর সংসারাশ্রম। নবদ্বীপের জ্ঞানচর্চার খ্যাতি তখনও ছিল ভারতবিখ্যাত।

অতি শৈশব থেকেই ছেলেকে মুখে মুখে নানান বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। পুত্রের চূড়াকরণ হল—ব্যাকরণ, অভিধান, কাব্য, ন্যায় ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে জ্ঞানমার্গের পথে অগ্রসর হতে থাকেন কিশোর পণ্ডিত। পুত্রের নাম রেখেছিলেন সত্যশরণ। উপনয়ন হল, দ্বিজত্ব লাভ করলেন সত্যশরণ। পিতার উপযুক্ত পুত্র তিনি—বংশের গৌরব। মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে চতুষ্পাঠীর যাবতীয় শিক্ষা সমাপ্ত হল তাঁর। উপাধি পরীক্ষাতেও সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ সত্যশরণকে উপাধিদান করলেন—তর্কবাগীশ। কানভট্ট শিরোমণি, অদ্বৈত-নিমাই, বুনো রামনাথ, শিবনাথ বাচস্পতির দেশ নবদ্বীপ—গুণীর আদর জানে। তর্কপঞ্চানন তরুণ পুত্রকে নিয়ে যেতেন পণ্ডিতসভায়। বিচারসভায় নব্যন্যায়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাষ্য নিয়ে তর্ক হত, বিচার হত। তাতে তর্কপঞ্চানন নিজে আর অংশগ্রহণ করতেন না, কিন্তু তীব্র আগ্রহ নিয়ে শুনতেন পুত্রের

pathagar.net

বিচারপদ্ধতি। ঘরে ফিরে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলা আধো-অন্ধকারে পিতাপুত্রে তাই নিয়ে আলোচনা হয় রাত্রির তৃতীয় যাম পর্যন্ত।

মনে শান্তি ছিল না তর্কপঞ্চাননের। সন্তানলাভ করার পর জাতকের কোষ্ঠীবিচার করেছিলেন। সচারাচর তিনি ফলিত জ্যোতিষে বিচার করতেন না—যদি কখনও করতেন দেখা যেত তাঁর সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত। তাই তাঁর মনে শান্তি ছিল না। ফলিত জ্যোতিষের অমোঘ নির্দেশ অকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন সত্যশরণ!

নিমাই-এর দেশের মানুষ উনি—জানতেন ভাগ্যের এ নির্দেশ কতদূর অমোঘ! তবু নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে তো থাকা যায় না। পরমাসুন্দরী একটি স্বজাতের পাত্রীর সন্ধান করতে থাকেন। রাজা শুদ্ধোদন পারেননি, শচীমাতা পারেননি, সত্যসিন্ধুও যে পারবেন তার স্থিরতা নেই—তবু যে দুদিন ধরে রাখা যায় আর কি!

জগু-ঠাকরুণ একদিন এসে বললে: ওরে ও সতু, তোর পাগল ছেলে কি বলে শোন! বলে সে বিয়ে করবে না।

সত্যসিন্ধু সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। দ্বিগুণ উৎসাহে পাত্রীর সন্ধান করতে থাকেন। কিন্তু একদিন রুদ্ধদ্বার কক্ষে কি যেন কথাবার্তা হল পিতাপুত্রে। সেদিন থেকে ক্ষান্ত হলেন বৃদ্ধ। বিবাহে পুত্রের অভিরুচি নাই। তার মতে বিবাহের বন্ধন তার সত্যান্বেষণের পথে বাধা হবে মাত্র। তর্কপঞ্চানন বলেছিলেন: কিন্তু তুমি কি চাও, তোমার পর আমাদের এই চতুষ্পাঠী উঠে যাক?

নৈয়ায়িক পুত্র উত্তরে বলেছিলেন: তা কেন? আমার শ্রেষ্ঠ ছাত্রকে আমি দিয়ে যাব সে অধিকার। এ চতুষ্পাঠীর সঙ্গে আচার্য-বংশের রক্তের সম্পর্কটাই বড় কথা নয়—আচার্যবংশের জ্ঞানের ধারাটাই বড়। সে ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখব আমি।

কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষের তর্পণ বন্ধ হয়ে যাবে? লুপ্ত-পিণ্ডোদক হয়ে যাবেন তাঁরা?

pathagar.net

তর্কবাগীশ বলেছিলেন : জন্মকালে মায়ের সঙ্গে যদি আমিও মারা যেতাম তাহলে আপনি কি করতেন ?

পুত্রের কাছে পরাজয় নাকি কাম্য। পরাজয়ই স্বীকার করতে হল তর্কপঞ্চাননকে। বলতে পারেননি, দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করতাম। তা তিনি পারতেন না—কুলীনদের বহু বিবাহের বিরুদ্ধে ছিলেন তিনি। যা পারতেন না, তাই তর্কের খাতিরে পারতাম বলা হচ্ছে অনৃতভাষণ। সে ওঁদের বংশের ধারায় নেই।

ভাগ্যের নির্দেশই মেনে নিলেন শেষ পর্যন্ত। এ পুত্র সংসারী হবার নয়। নাতি-নাতনী নিয়ে সুখের সংসার পাতবার স্বপ্ন তাঁর সফল হবে না কোনদিন। মনে হল, আর কেন এবার বানপ্রস্থ নেওয়া চলতে পারে। স্থির করলেন আগামী চৈত্র পূর্ণিমায় বৃন্দাবন যাত্রা করবেন পদব্রজে। তখনও রেললাইন হয়নি। বৃন্দাবন তখন সুদুর্গম এক তীর্থ। পৌঁছতে পারলে, সেখানেই, মদনমোহনের চরণতলে জীবনের শেষ নিশ্বাসটি নিবেদন করবেন।

এই সময়ে ঘটল এমন একটা ঘটনা যাতে তর্কপঞ্চাননের তীর্থ-যাত্রার পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখতে হল। একটি অনূঢ়া অরক্ষণীয়া কন্যাকে নিয়ে এক দুর্যোগরাত্রির তৃতীয় যামে বাড়ি ফিরলেন যুবক-পুত্র তর্কবাগীশ !

একটু আগে থেকে বলতে হয়। আচার্যবংশের কুলদেবতা মদনমোহন। ধর্মমতে ওঁরা বৈষ্ণব। সত্যশরণ তর্কবাগীশ গিয়েছিলেন কৃষ্ণনগরে। চৈত্র মাসের শুক্লা একাদশীতে কৃষ্ণনগরের রাজবাড়িতে নদীয়া জেলার দ্বাদশটি বিখ্যাত কৃষ্ণমূর্তির একত্রে ঝুলন হয়। নবদ্বীপ থেকে কৃষ্ণনগর পাঁচ ছয় ক্রোশ পথ। স্থলপথে যাওয়ার বিপদ আছে। ডাকাতের ভয়। সত্যশরণ যাত্রিদলের সঙ্গে গিয়েছিলেন জলপথে, নৌকাযোগে। ভাগীরথী থেকে জলাঙ্গী হয়ে। চৈত্র পূর্ণিমায় তর্কপঞ্চানন তীর্থযাত্রা করবেন, তাই দ্রুত ফিরে আসছিলেন তিনি। এক প্রহর বেলায় যাত্রী বোঝাই নৌকা ছাড়ল কৃষ্ণনগরের



pathagar.net

খেয়াঘাটে। ছয় ক্রোশ পথ—সন্ধ্যার আগেই পৌঁছে যাবেন নবদ্বীপে। পথে ডাকাতির ভয় আছে। তাই দিনে দিনেই যাতায়াতের ব্যবস্থা। নৌকায় তর্কবাগীশের পরিচিত কোন যাত্রী ছিল না, তিনি বসেছিলেন পাটাতনের একান্তে। বসে বসে লক্ষ্য করছিলেন নদী পারের দৃশ্য। চৈতালী শীর্ণ নদী। বালির চর পড়েছে এক দিকে। অসংখ্য শীতালী পাখির জটলা হয় ওখানে। এখন অবশ্য নাই। কয়েকটা জলপিপি আর কাদাখোঁচা ঘুরে বেড়াচ্ছে বালির উপর বিচিত্র আলপনা এঁকে। একটা পানকৌড়ি ডুব দিচ্ছে টুপ-টুপ করে। ক্রমে বাঁকের মুখে মিলিয়ে গেল কৃষ্ণনগরের পাকাবাড়ির মিছিল। নলখাগড়ার বন। চষাভূঁই ক্ষেত। নৌকা চলেছে অলস মন্থর গতিতে। অল্প পরেই রৌদ্রতাপ খরতর হয়ে উঠল। ছৈ-এর ভিতর যাত্রীদের ভিড়। বাইরে গলুই-এর মাথায় বসেছিলেন তর্কবাগীশ, মাথায় একখানা ভিজে গামছা চাপিয়ে।

কৃষ্ণনগরে এক যজমানের গৃহে রাত্রিবাস করেছেন পূর্বরাত্রে। যজমানের একটি ছেলে কলকাতায় হিন্দু কলেজে পড়ত। একটা পাস দিয়ে এখন কৃষ্ণনগরে নিজের বাড়িতে থাকে। নদীয়া রাজ-সরকারে চাকরি করে। ছেলেটির মুখে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত খবর শুনেছেন তর্কবাগীশ। কিছু কিছু নবদ্বীপে বসেই শুনেছিলেন। রামমোহন সতীদাহ প্রথা রদের যে আন্দোলন করেন, তাতে সক্রিয় যোগাযোগ না থাকলেও স্বয়ং তর্কপঞ্চানন চিঠি লিখেছিলেন রাজা রামমোহনকে তাঁর সমর্থন জানিয়ে। তারপর রামমোহন গত হয়েছেন, তর্কবাগীশ তখন শিশু। ইতিমধ্যে ডিরোজিও গত হয়েছেন। দ্বারকানাথের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠার কথাও শুনেছেন। ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের বিরুদ্ধে রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-ধর্মের কথাও শুনেছেন মন দিয়ে। কিন্তু তাঁর মনে হয়েছে এ ব্রাহ্ম-ধর্মও ভারতবর্ষের প্রাণের জিনিস। বহু শতাব্দী আগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে একবার যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল বৌদ্ধধর্ম। তাতে



pathagar.net

ভারতীয় সংস্কৃতি ভেঙে পড়ে নি। বৌদ্ধধর্ম হয়েছিল ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারক। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ এবং শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্মও তো তদানীন্তন ধর্মে ব্যভিচারের প্রতিবাদ থেকেই উপাদান পেয়েছে। ভারতীয় চিন্তাধারার বাইরে টেনে নিয়ে যায় নি কাউকে। কিন্তু এ ছেলেটি কাল যা শোনাল তাতে অভিভূত হয়ে পড়েছেন তর্কবাগীশ। হিন্দু কলেজের ছেলেরা জাত-অজাত মানে না—ব্রাহ্মণ সন্তান ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী পাঠ করে না, একথা আগেই শুনেছিলেন; কিন্তু ছেলেটি বললে সম্প্রতি হিন্দু কলেজের একটি ছাত্র, যশোরে দত্তবাড়ির একটি মেধাবী ছেলে নাকি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্টান হয়ে গেছে। সে নাকি খ্রীষ্টানদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে—

আঃ! মনে মনে চিন্তা করতেও কেমন যেন ন্যক্কারজনক একটা অনুভূতি জাগে।

একটু সন্দেশ মুখে দাও, ও ছেলে!

চম্‌কে ফিরে দেখেন একটি বিধবা বৃদ্ধা ওঁর দিকে বাড়িয়ে ধরেছেন পিতলের রেকাবীতে চতুষ্কোণ একটি হলদে রঙের মিষ্টান্ন। কৃষ্ণনগরের একটি বিশেষ ধরনের সন্দেশ। কি যে নাম তার।

সকাল থেকে ঠায় বসে আছো রোদে। মুখে তো কুটোটি কাট নি।

না থাক, খেতে ইচ্ছে করছে না এখন।

এইমাত্র মনে মনে একটি অখাদ্য ভক্ষণের কথা চিন্তা করেছেন। এখনও যেন স্বাভাবিক হতে পারেন নি।

কেন মিষ্টিতে আর আপত্তি কি? ওতে ছোঁয়াছুঁয়ি হয় না। আর তাছাড়া বৃহৎ-কাষ্ঠে দোষ নেই।

তর্কবাগীশ হাসেন: আপনি বিধান দিচ্ছেন?

হ্যাঁ দিচ্ছি? তা অত হাসি কিসের? চেহারা দেখেই বুঝেছি তুমি পণ্ডিত; কিন্তু আমিও কম যাই না। কুলীন ঘরের বিধবা আমি। স্বরূপগঞ্জের লাহিড়ী বাড়ির বউ। বুঝলে? জল-অচল নই!

না না, সেকি?—হাত বাড়িয়ে পাত্রটা গ্রহণ করেন। আহ্নিক



pathagar.net

করেই নৌকায় উঠেছিলেন। আলগোছে মিষ্টান্ন মুখে ফেলে দিয়ে তৃষ্ণার্ত পণ্ডিত এক ঘটি জল খেলেন।

কোথা গিইছিলে? বারোদোলের মেলায়?

তর্কবাগীশ ম্লান হাসলেন। যার উত্তর হাঁ-ও হতে পারে, না-ও হতে পারে।

কি যে তোমরা দেখতে আস মেলায়, বুঝি না বাপু। এ আবাগীও তো মেলা মেলা করে পাগল করে তুলেছিল আমাকে।

আঃ! জেঠীমা, কী যা তা বকছো।

তর্কবাগীশ চোখ তুলে তাকাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। আশ্চর্য মেয়েটি। কাজলকালো দুটি চোখ মেলে সে এতক্ষণ দেখছিল তর্কবাগীশকে। চোখাচোখি হতেই নত করল দৃষ্টি। চমকে উঠেছিলেন তর্কবাগীশ। মেয়েটির মাথায় ঘোমটা নাই, সীমন্তে নাই সিন্দুর-চিহ্ন। এত বড় মেয়ে এখনও অনূঢ়া! শান্তিপুরে একটা ডুরে শাড়ি পরেছে, সুতরাং বিধবা নয়। তাহলে এতদিন বিয়ে হয় নি কেন ওর? কোন কলঙ্ক রটেছে? নাকি স্বরূপগঞ্জের লাহিড়ী বাড়ির কেউ আবার হিন্দু কলেজ থেকে নব্যযুগের কুশিক্ষা নিয়ে এসেছে! বাল্যবিবাহ ওদের কাছে তাই হয়তো কুপ্রথা মনে হয়েছে। না হলে এত বড় মেয়ে—

স্বরূপগঞ্জে থাকেন আপনারা? কোন লাহিড়ী বাড়ি?

এ আবাগীর বাপের নাম বললে তুমি চিনবে না। তাঁরা কর্তা-গিন্নি ওই জগদ্দল পাথরটি আমার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে অকালেই সরে পড়েছেন। আমার শ্বশুরের নাম করলে অবশ্য চিনবে তুমি। বল্ না রে পুলু—

পাটাতন-নিবদ্ধ দৃষ্টি মেয়েটি মুখ না তুলেই বললে: আমার পিতামহের নাম ঈশ্বর কৃষ্ণজীবন তর্কতীর্থ।

ও তর্কতীর্থমশায়ের নাতনী তুমি? তাঁকে আমি দেখি নি, তবে নাম শুনেছি।

pathagar.net

তুমি দেখবে কোত্থেকে ? বিশবছর আগেই তো তিনি দেহরক্ষা করেছেন। তোমার বয়স কত হবে ?

প্রায় ঐ সময়েই জন্মেছি আমি।

তবে ?

কথা বলার মানুষ পেয়ে বৃদ্ধা এক নাগাড়ে বক্‌বক্ করে চলেন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ওঁরা। সাণ্ডিল্য গোত্র। রোহিলা পটি। নৈকষ্য কুলীন। কুলীনের ঘর বলেই তো এতবড় মেয়ের আজও বিয়ে হয় নি। যদি কোনও সুপাত্রের সন্ধান পান উনি তাহলে যেন সংবাদ দেন। স্বরূপগঞ্জ তো গঙ্গার ওপার মাত্র।

নবদ্বীপেই বাস তো তোমার ? নাকি ? এই দেখ আপন মনেই বক্‌বক্ করে যাচ্ছি। তোমার পরিচয় নেওয়া হয় নি।

সে আমলে শুধু নাম দিয়েই মানুষের পরিচয় হত না। বলতে হত নিবাস, আদি নিবাস, ঠাকুরের নাম, জাতি—ইত্যাদি।

তর্কবাগীশও নিজ পরিচয় দিলেন।

ওমা, তাই নাকি ! তোমার বাপকে যে এক ডাকে চেনে সারা ন'দের লোক। আর বাপ কেন, তোমারও তো শুনি খুব নাম যশ। ওমা তুমি সত্যশরণ তর্কবাগীশ ! এতটুকু ছেলে ! ওলো, ও পুলু—পেন্নাম কর !

না না, সেকি !—শশব্যস্ত হয়ে পড়েন পণ্ডিত।

সে কি ? কত বড় পণ্ডিতের বংশ তোমাদের !

গলুই থেকে বেরিয়ে আসে মেয়েটি। সেও অবাক হয়ে গেছে জেঠিমার ভাবভঙ্গি দেখে। নিচু হয়ে পদধূলি নেয় পণ্ডিতের।

তর্কবাগীশ আশীর্বাদ করলেন :

আখণ্ডলঃ সম ভর্তা জয়ন্ত প্রতিমো সুতঃ
আশীরস্যা ন তে যোগ্যা পৌলমী মঙ্গলা ভব।

মেয়েটির ডানহাত তখনও স্পর্শ করে আছে নিজের সাদা সিঁথি—অবাক হয়ে সে চেয়ে আছে সত্যশরণের মুখের দিকে—যেন অদ্ভুত

pathagar.net

কিছু সে শুনেছে এই মাত্র। যেন তর্কবাগীশের মুখে সস্কৃংত ভাষা সে প্রত্যাশাই করে নি একেবারে।

চোখাচোখি হতেই সলজ্জে ঢুকে পড়ে ছৈ-এর ভিতর।

বৃদ্ধা প্রশ্ন করেন : তোমরাও তো বারেন্দ্র, নয় ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

গোত্তর কি তোমাদের ?

এ কি বিড়ম্বনা তর্কবাগীশ একটা ঢোঁক গিলে বলেন : বাৎস্য।

উৎসাহী হয়ে ওঠেন বৃদ্ধা : ওমা, তাই নাকি ! তা তুমিই তো তর্কপঞ্চাননমহাশয়ের একমাত্র বংশধর ? তাই না ?

তর্কবাগীশ বুঝতে পারেন ছৈ-এর ওপারে একজোড়া কান উৎকর্ণ হয়ে শুনছে এ আলাপ, একজোড়া চোখ লক্ষ্য করছে ওঁদের।

কয়টি বিবাহ করেছ তুমি ?

কী মুশকিল ! উঠে যাবার উপায় নেই, মিথ্যা কথাও বলতে পারেন না। কণ্ঠস্বর নিচু করে অস্ফুটে বলেন : আমি দার-পরিগ্রহ করি নি, এবং করবও না।

ওমা সেকি ! তুমিই একমাত্র বংশধর,—তুমি বিয়ে না করলে বংশরক্ষা হবে কি করে ?

তর্কবাগীশ এবার প্রকাশ্যেই বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন : এবার আমি জপ করব। সত্যই উত্তরমুখী হয়ে উপবীতটা আঙুলে জড়িয়ে জপ করতে থাকেন তর্কবাগীশ।

বেলা দ্বিপ্রহরে নৌকা লাগানো হল একটা আ-ঘাটায়। মাঝিরা এখানে দুটি ভাত ফুটিয়ে খেয়ে নেবে। একটানা রৌদ্রে সকলেই কমবেশী ক্লান্ত। শুধু মেয়েরাই বসতে পেরেছে ছৈ-এর ছায়ায়। তাই ছায়াঘন এ নির্জনপ্রান্তরে একদণ্ড জিরিয়ে নেবার প্রস্তাবে প্রশ্নবানের হাত এড়াতে তিনি নেমে পড়লেন নৌকা থেকে। যাত্রীরা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ল। মেয়েটি বললে : কাল তো একাদশী গেছে জেঠিমা, দুটি চালে ডালে ফুটিয়ে নিন না।

pathagar.net

বৃদ্ধা বললেন : না, থাক্ বাপু। একটানা রোদে আমার বড় মাথা ধরেছে। আমি বরং একটু গড়িয়ে নিই।—শূন্য ছৈ-এর মধ্যে তিনি হাত-পা মেলে শুয়ে পড়েন।

মেয়েটি বললে : আপনি এখনই কেন উঠবেন ? আমিই চড়িয়ে দিচ্ছি ঘাটে নেমে। চাল-ডাল মাটির হাঁড়ি সবই তো সঙ্গে আছে। ফুটে গেল আপনি নামিয়ে নেবেন বরং।

বৃদ্ধা বলেন : তবে ও ছেলেকেও জিজ্ঞেস কর—তোর হাতে যদি খায়, তবে ওর তরেও একমুঠো চাল নিস। তেমন ভাগ্যি তো আর করিস নে হতভাগী। একটা দিনও অন্তত ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে নে।

মেয়েটি অস্ফুটে বললে : দেখুন জেঠিমা, আপনি অমন করবেন না কিন্তু ! উনি কতবড় বংশের ছেলে—

ওলো, থাম থাম। আজ তোর বাপ-জ্যেঠা-ঠাকুর্দা বেঁচে থাকলে দেখতাম কতবড় ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি এসেছেন ! ঘর হিসাবে আমরাও কিছু কম যাই না—কিন্তু কি করব, এই বিধবার গলায় তোকে গেঁথে দিয়ে সব যে সরে পড়েছে !

তর্কবাগীশ শুনতে না পাওয়ার ভঙ্গি করে চলে যাচ্ছিলেন, মেয়েটি হঠাৎ বেরিয়ে এসে বললে : নেব ?

থেমে পড়তে হল ওঁকে, বলেন : কি নেবে ?

আপনার জন্যেও দুটি চাল। আপনি খাবেন আমার হতে ?

কেন, তুমিও তো ব্রাহ্মণকন্যা।

সে জন্য নয়, কিন্তু—

এতক্ষণে মনে পড়ল তর্কবাগীশের। লজ্জা পেলেন তিনি। মেয়েটি অনূঢ়া, অরক্ষণীয়া—নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ তার হাতে রান্না করা অন্ন গ্রহণে অসম্মত হতে পারেন। তাই এ দ্বিধা। তর্কবাগীশ সংস্কারমুক্ত নন। তর্কপঞ্চানন ঐ মেয়েটির পাক করা অন্ন নিশ্চয় গ্রহণ করবেন না। ঠিক এ পরিবেশ না হলে বোধকরি সত্যশরণও স্বীকৃত হতেন না ; কিন্তু কি যেন হল তাঁর। মনে হল মেয়েটির

pathagar.net

দুচোখে প্রত্যাশা কাঁপছে—ঝড়ো হাওয়ায় পাখির বাসার মতো। আর কিছু নয়—ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণকে দুটি অন্ন পাক করে খাওয়ানো। ওকে বঞ্চিত করতে মন সরল না। নব্য নৈয়ায়িক হেসে বললেন : তোমার জেঠিমা-ই তো বিধান দিয়েছেন···বৃহৎ-কাষ্ঠে দোষ নাই। তুমি পাড়ে বসে চড়িয়ে দাও—আমি না হয় নামিয়ে নিয়ে নৌকায় বসে খাব। কিন্তু শোন, এত খোলা জায়গায় তো আগুন জ্বলবে না। ঐ দূরের গাছতলায় যেতে হবে। চল, আমিও তোমাকে সাহায্য করছি।

উন্মুক্ত নদীর তীর থেকে কিছু দূরেই আসতে হল ওঁদের। দু-তিনটি বড় গাছের আড়ালে। তর্কবাগীশ শুক্‌নো কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে এলেন। তিনটি বড় মাটির ঢেলায় বসানো হল মাটির হাঁড়ি। নদীর জলে চাল ধুয়ে আনতে গেল মেয়েটি। ফিরে এল ভিজে কাপড়ে।

একি স্নান করলে কেন এমন অবেলায় ?

না হলে আপনি আমার হাতে খেতেন কি করে—কত জাত অজাতের ছোঁয়া লেগেছে !

কিন্তু কাপড়টা ছাড়বে না তুমি ?

না থাক। এখানে কোথায় ছাড়ব ?

তর্কবাগীশ একবার ভাবলেন বলেন : ঐ গাছের আড়ালে গিয়ে কাপড় ছেড়ে এস, আমি না হয় দূরে যাচ্ছি। তারপর মনে হল এমন অজানা জায়গায় মেয়েটিকে একলা রেখে দূরে যাওয়া উচিত হবে না। বললেন : ঠাণ্ডা লাগবে না তো !

মেয়েটি হাসলে, বললে : শুনলেন না আমরা কুলীন। কুলীনের মেয়েকে যমেও ছোঁয় না।

তর্কবাগীশের মনে হল মেয়েটি মুখরা। এতটুকু মেয়ে—কিন্তু এতটুকুই বা কই ? অন্তত তের-চৌদ্দ বছর হবেই।

জল গরম হয়ে উঠেছে। চাল ছেড়ে দিল মেয়েটি।

pathagar.net

তোমার নাম কি ?

সে তো আপনি জানেন।

জানি ? ও, পুলু ? কিন্তু সে তো ডাক নাম। পোশাকী নামটা কি ?

তাও তো জানেন আপনি !

কই না তো !

উঃ। কী মিথ্যুক আপনি !

হাসলেন সত্যশরণ। জীবনে এ অভিযোগ এই প্রথম শুনলেন সত্যশরণ তর্কবাগীশ। শুধু তিনি কেন, বোধকরি আচার্যবংশের তিনিই প্রথম মানুষ যাকে অপরিচিত একজন মিথ্যাবাদী বলে তিরস্কার করল।

কেন, মিথ্যুক হতে যাব কেন ?

আমি সব বুঝতে পেরেছি। আপনি ভৃগু জানেন, নয় !

ভৃগু জানি মানে ?

আর চালাকি করতে হবে না মশাই। আমি সব বুঝতে পেরেছি। যারা ভৃগু জানে তারা মানুষের মুখ দেখেই সব বলে দিতে পারে। আপনি আমাকে দেখেই যখন আমার নাম বলে দিলেন, তখনই বুঝতে পেরেছি আপনি ভৃগু জানেন।

বিতর্ক-সভায় ন্যায়ের অনেক সূক্ষ্মভাষ্যের কূট প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে তর্কবাগীশকে ; কিন্তু এ মেয়েটির এই কঠিন প্রশ্নের মর্মোদ্ধার করতে পারলেন না তিনি ; বললেন : কখন তোমার নাম বললাম ? যখন প্রণাম করলাম আপনাকে। আপনি শোলক আউড়ে আমার নাম বললেন।

কি নাম ?

আহা জানেন না যেন ? আমার নাম পৌলমী !

এতক্ষণে সমস্যাটির সমাধান হল। হেসে বললেন : কিন্তু আমি কি বলে আশীর্বাদ করেছিলাম জানো ? বুঝতে পেরেছিলে আমার কথা !

pathagar.net

না। কি?

আমি আশীর্বাদ করেছিলাম : তোমার স্বামী হবেন ইন্দ্রের মতো দীপ্তকান্তি, জয়ন্তের মতো ত্রিভুবনবিজয়ী সন্তান হবে তোমার, তুমি রাজেন্দ্রাণী হবে! তোমার মতো কল্যাণময়ীর এ ছাড়া অন্য আশীর্বাদ প্রয়োগযোগ্য নয়।

মেয়েটি দুই হাতে মুখ ঢাকল।

তর্কবাগীশ বললেন : তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছ, কিন্তু আমাদের বংশে কেউ কখনও মিছে কথা বলে না, তা জান? আমরা বাক্‌সিদ্ধ! দেখে নিও, আমি যে আশীর্বাদ করছি তা ফলবেই।

এ পর্যন্ত পরিষ্কার মনে আছে সত্যশরণের। তারপর অত্যন্ত দ্রুত পট পরিবর্তন হয়েছিল। একটা মত্ত কোলাহল কানে যেতেই উনি উঠে দাঁড়ালেন। দেখতে পান বিপরীত দিক থেকে একদল সশস্ত্র লোক ছুটে আসছে নদীর দিকে। ওঁদের দুজনকে তারা লক্ষ্য করে নি —ওঁরা ছিলেন একটু দূরে, ওদের দৃষ্টিপথের বাইরে। রামদা, বল্লম আর লাঠি হাতে একদল উন্মত্ত ডাকাত আক্রমণ করল নিরস্ত্র যাত্রিদলকে। ভয়ে আতঙ্কে চীৎকার করে উঠতে গেল পৌলমী। তীক্ষ্ণধী সত্যশরণ মুহূর্তে লাফ দিয়ে পড়লেন তার ওপর। সবলে তাকে আলিঙ্গন করে হাত দিয়ে চেপে ধরলেন ওর মুখ।

ডাকাত পড়েছে। চেঁচিও না—পালাও শিগ্‌গির!

কিন্তু জেঠিমা?

তাঁকে ওরা প্রাণে মারবে না। জিনিসপত্র সব কেড়ে নেবেই, ঠেকানো যাবে না। কিন্তু তোমাকে ধরতে পারলে—কী আশ্চর্য, বুঝছ না কেন তুমি?

মেয়েটি বুদ্ধিমতী। আর বাধা দেয় নি সে।

ঝোপঝাপ কাঁটা জঙ্গল ভেঙে ওঁরা দুজনে ছুটতে থাকেন প্রাণপণে। পৌলমীর একটা হাত দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে আছেন সত্যশরণ প্রায় আধক্রোশ পথ দৌড়ে এসে দেখতে পেলেন নলখাগড়ার একটা

pathagar.net

ঘন জঙ্গল। নিরাপদ আশ্রয় নয়, সাপ থাকতে পারে। তবু তাতেই আত্মগোপন করে রইলেন দুজন।

আতঙ্কের তুঙ্গশীর্ষে উঠে এমন নিস্তব্ধ নির্জন প্রান্তরে আত্মগোপন করে লুকিয়ে থাকলে সময়ের মাপ হারিয়ে যায়। খেয়াল নেই কতক্ষণ কেটে গেছে। মাথা তুলতে সাহস হয় নি কারও। যদি এ পথেই ফিরে আসতে থাকে ডাকাতরা? ভূ শয্যায় দুটি আতঙ্কতাড়িত মানুষ পাশাপাশি শুয়ে প্রহর গুণছে। অন্ধকারকে মানুষ ভয় পায়—আলোতেই ওদের ভরসা। এদের অবস্থা আজ অন্যরকম। দিনের আলো মিলিয়ে গেল ক্রমে—জোনাক জ্বলতে শুরু করল ঝোপে-ঝাড়ে। স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল সত্যশরণের। মেয়েটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে—চাপাকান্না। সত্যশরণের ইচ্ছা হল একটি হাত রাখেন ওর মাথায়—কিন্তু পারলেন না। যদি ভুল বোঝে মেয়েটি। আর্দ্র-কণ্ঠে বললেন: কেঁদ না, ওঠ, এবার এখান থেকে পালাতে হবে।

কিন্তু জেঠিমার কি হল?

চল খোঁজ নিয়ে দেখি।

মেয়েটির শাড়ি ছিঁড়ে গেছে পায়ের কাছে। হাতে মুখে লেগেছে কাদার কনেচন্দন। শুক্লাদ্বাদশীর জ্যোৎস্নায় নদীতীর রূপালী চাদর জড়িয়েছে গায়ে। কে বলবে কয়েকদণ্ড আগে এখানে একটি বীভৎস নাটক অভিনীত হয়ে গেছে। নির্জন নদীতীরে এসে দাঁড়ালেন দুজনে, সেখানে জনমানবের চিহ্নমাত্র নাই।

এতক্ষণে আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল মেয়েটি।

আর ইতস্তত করে লাভ নেই। ওর হাতটা তুলে নিলেন সত্যশরণ। সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: ভেঙে পড়লে তো চলবে না। পৌলমী। এখান থেকে নবদ্বীপ নদী-পথে অনেকটা রাস্তা। হেঁটেই পাড়ি দিতে হবে আমাদের। এস আমার সঙ্গে। ভয় করো না।

আশেপাশে গ্রাম আছে। আলো জ্বলছে দূরে দূরে—কিন্তু কে জানে, হয় তো এ গ্রামেই ঐ ডাকাতদের আস্তানা। খোঁজ করতে

pathagar.net

সাহস হল না। মেয়েটির হাত ধরে তীরে তীরে চলেছেন জলাঙ্গীর নদীস্রোত লক্ষ্য করে।

বাড়িতে এসে পৌঁছালেন রাত্রির তৃতীয় প্রহরে।

দ্বার খুলে দিয়ে দুরন্ত বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন জগু-ঠাকরুণ—আলোটা উঁচু করে বলেন : এ কে ?

তর্কবাগীশ বলেন : বলছি, আগে একে ঘরের ভিতর নিয়ে যান।

সিক্ত-বসনা, কর্দমালিপ্তা মেয়েটির আর শক্তি ছিল না। লুটিয়ে পড়ল জগু-ঠাকরুণের পায়ের কাছে। জগু-ঠাকরুণ ওকে নিয়ে উঠে গেলেন ঘরের ভিতর।

সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে তর্কপঞ্চানন বললেন : উপায় নেই। তোমাকে বিবাহ করতে হবে ঐ মেয়েটিকে।

তর্কবাগীশ চমকে উঠে বললেন : সেকি, কেন ?

তুমি ওর সঙ্গে রাত্রিবাস করেছ। তুমি ওকে বিবাহ না করলে ঐ কন্যার আর বিবাহ হবে না।

কেন হবে না। আমি ওঁর গাত্রস্পর্শ মাত্র করি নি।

সমাজ সে কথা বিশ্বাস করবে কেন ?

করবে। আমি বলছি বলে করবে।

কিন্তু কোন প্রমাণ তো নেই।

প্রমাণ !—উঠে দাঁড়ালেন তর্কবাগীশ, বললেন—মহামহোপাধ্যায় সত্যসিন্ধু তর্কপঞ্চাননের পুত্রের মুখের কথাই কি যথেষ্ট প্রমাণ নয় ?

তর্কপঞ্চাননও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, বলেন : না ! তা যদি হত তাহলে মহাকবি রাজর্ষি জনকের আত্মজার অগ্নিপরীক্ষার পরিচ্ছেদটি রচনা করতে পারতেন না। তুমি ভুল করেছ সত্যশরণ,—সংস্কার অন্ধ ! লোকাচার ন্যায়শাস্ত্রের বিধানে চলে না।

দুরন্ত ক্রোধে স্থান ত্যাগ করবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালেন তর্কবাগীশ। সঙ্গে সঙ্গে নজরে পড়ল শুকতারা-জ্বলা প্রভাতের পশ্চাদপটে দ্বারের

pathagar.net

সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন দুজন মহিলা। মাতৃসমা জগু-ঠাকরুণ, আর তাঁর পিছনে ম্লানমুখী একটি কিশোরী।

তর্কপঞ্চাননের ঘরে শাড়ি নাই। কর্দমাক্ত শাড়িটি ত্যাগ করে পৌলমী পরেছিল জগু-ঠাকরুণের একটি সাদা থান। বিধবার বেশ। তর্কবাগীশের মনে হল, ঐ নতমুখী মেয়েটিকে উদ্ধার করেছেন তিনি—প্রাণদান করেছেন, ধর্ম রক্ষা করেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে ওর কামনা-বাসনার শেষ সম্ভাবনাটুকু পর্যন্ত অবলুপ্ত করে ঐ কুমারী মেয়েটির অঙ্গে তুলে দিয়েছেন চিরবৈধব্যের বেশ। তিনিই।

জগু-ঠাকরুণ ছুটে এসে চেপে ধরলেন তর্কবাগীশের দুটি হাত। অশ্রু-আর্দ্র কণ্ঠে বললেন: আমি তোর মা নই খোকা, তবু মায়ের মতোই মানুষ করেছি তোকে। আমি ভিক্ষা চাইছি। ওকে তুই চরণে ঠাঁই দে!

তর্কবাগীশ কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েন। মহাকালের এ কী নাটকীয় পরিকল্পনা! পিছনে প্রস্তরকঠিন আচার্য—সম্মুখে বেতস-পত্রের মতো বেপথুমানা একটি বালিকা—মাঝখানে মাতৃসমা জগু-ঠাকরুণের হাত ধরে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।

রাত্রির অন্ধকার বিদীর্ণ করে গায়ত্রী নেমে আসছেন পূর্বদিগন্তে!

আপনারা আমাকে একদিন ভেবে দেখার সময় দিন।—হাত ছাড়িয়ে তর্কবাগীশ বের হয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে।

পরদিন সংবাদ পেয়ে ভাগীরথীর ওপার থেকে এল লোকজন। স্বরূপগঞ্জের লাহিড়ী বাড়ি থেকে এলেন পৌলমীর জেঠিমাও। যাত্রিদলের কারও প্রাণহানি হয় নি। তর্কপঞ্চাননের পদধূলি নিয়ে লাহিড়ী-বাড়ির বিধবা একগলা ঘোমটা টেনে বললেন: আপনার ছেলে ওর প্রাণ দিয়েছে, ধর্মরক্ষা করেছে—আপনাকে আর কি বলব বাবা;—পাপী তাপীকে তরানোই তো আপনাদের বংশের কীর্তি।

তর্কপঞ্চানন কি জবাব দেবেন ভেবে পেলেন না।

সকাল থেকেই পুত্র নিরুদ্দেশ। এদিকে নবদ্বীপের বিশিষ্ট



pathagar.net

ব্যক্তিদের শুভাগমন ঘটছে ক্রমাগত। অলৌকিকভাবে তর্কবাগীশ রক্ষা পেয়েছেন এ কথা মুখে মুখে রটে গেছে সারা নবদ্বীপে। তর্কপঞ্চাননের মুখের কথাই সকলে মেনে নিয়েছেন, কেউ বলছেন না —ঐ মেয়েকে বিবাহ করতে হবে সত্যশরণকে। দেখা গেল ওঁর আশঙ্কা ভিত্তিহীন, পৌলমীকে অগ্নিপরীক্ষায় দাঁড়াবার প্রস্তাব কেউ করলেন না। ঐ মেয়েটির অন্যত্র বিবাহে সমাজ আপত্তি করবে না তা নিশ্চিত বোঝা গেল। তবু খুশী হতে পারলেন না জগু-ঠাকরুণ। যেন এ বিধান ওঁরা না দিলেই খুশী হতেন তিনি। একগুঁয়ে ছেলেটাকে তাহলে ঠিক জব্দ করা যেত।

তর্কপঞ্চাননের মনোভাব অবশ্য বোঝা গেল না। আর পৌলমী? কিন্তু তার কথা কে খেয়াল করেছে?

সন্ধ্যাসমাগমে ফিরে এলেন সত্যশরণ। চতুষ্পাঠীর প্রাঙ্গণে তখনও নবদ্বীপের সমাজপতিরা অনেকেই আসীন। সত্যশরণ তাঁদের প্রণাম করলেন একে একে। প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করলেন সকলে। মুক্ত-কণ্ঠে তাঁরা জানালেন—তর্কবাগীশের মৌখিক প্রতিশ্রুতিই যথেষ্ট, এ কন্যার অন্যত্র বিবাহ শাস্ত্রসম্মত।

তর্কবাগীশ দেখলেন, দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটি গো-শকট। নতমুখী একটি কিশোরী বসে আছে ছৈ-এর ভিতর। লাহিড়ী বাড়ির বিধবাও দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকেও প্রণাম করলেন সত্যশরণ। অস্ফুটে তিনি আশীর্বাদ করলেন। তর্কবাগীশ সরে এলেন পিতার কাছে, বললেন: আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল।

তর্কপঞ্চানন সমবেত পণ্ডিতদের অনুমতি নিয়ে একান্তে সরে এসে বলেন: বল। মনস্থির করেছ তুমি?

আজ্ঞে না। মনস্থির করতে পারি নি। কিন্তু একটা কথা। এখন ভেবে দেখছি, কাল আপানাকে আমি ভুল বলেছিলাম।

ভুল বলেছিলে? কি ভুল বলেছিলে?

বলেছিলাম, ঐ মেয়েটির গাত্রস্পর্শ করি নি!

pathagar.net

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তর্কপঞ্চানন। মদনমোহনের এ কী অপূর্ব লীলা। রসসমুদ্রের কোথায় কখন জোয়ার উঠবে কে তা বলতে পারে! কিন্তু! ভ্রূ-কুঞ্চিত হল তর্কপঞ্চাননের। এ সত্য গতকাল সত্যশরণ প্রকাশ করতে পারে নি কেন? লজ্জায়? সত্যের চেয়ে লোকলজ্জা বড় হল তার কাছে! গম্ভীর হয়ে শুধু বললেন: তবু মনস্থির করতে পার নি তুমি?

আজ্ঞে না। আপনি জানেন, কেন বিবাহে আমার অভিরুচি নাই—

না, জানি না। তোমার যুক্তি আমি মানি না। আমি অদ্বৈত বৈদান্তিক নই, আমি বৈষ্ণব। বিবাহকে সাধনমার্গের অন্তরায় বলে আমি মনে করি না—সে কথা থাক। কিন্তু এইমাত্র তুমি যা বললে—

পিতার বক্তব্যের মাঝখানে কখনও বাধা দিতেন না সত্যশরণ; কিন্তু আজ যেন ধৈর্যচ্যুতি ঘটল তাঁর। ওঁর বক্তব্যের মাঝখানেই বলে ওঠেন: না না না! সে অর্থে আমি বলি নি! ডাকাতদের দেখতে পেয়ে ভয়ে ও আর্তনাদ করে উঠতে চেয়েছিল। আমি বাধা দিতে বাধ্য হয়েছিলাম স্পর্শ করেছিলাম ওকে। এই মাত্র!

পিতাপুত্র উভয়েই নীরব।

আপনি আমাকে পথনির্দেশ করুন। কী আমার কর্তব্য?

নিমীলিত নেত্রে চিন্তা করতে থাকেন তর্কপঞ্চানন। আবেগের বশে তিনি কখনও কোন নির্দেশ দিতেন না। ধীর স্থির মস্তিষ্কে সব দিক চিন্তা করেই বিধান দিতেন। তিনি স্থির নিশ্চয় জানতেন, তাঁর আদেশ শিরোধার্য করবেন সত্যশরণ। জানতেন, তাঁর নির্দেশমাত্রেই উৎফুল্ল হয়ে উঠবেন জগু-ঠাকরুণ, মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠবে অন্দরমহলে· মেয়েটি সর্বগুণান্বিতা, লক্ষ্মীর প্রতিমা যেন। এমন একটি সুলক্ষণা কন্যাই এতদিন সন্ধান করেছেন। ওঁরা পালটি-ঘর, সব দিক থেকেই এ সম্বন্ধ মঙ্গলকর। একটি দিনের সান্নিধ্যেই ঐ কল্যাণময়ীর প্রতি

pathagar.net

কেমন যেন অন্ধস্নেহ সঞ্চারিত হয়েছে বৃদ্ধের। শুধু তাই নয়, তর্ক-বাগীশের সিদ্ধান্ত তিনি মেনে নিতে পারেন নি। স্ত্রীভূমিকাবর্জিত কঠোর সন্ন্যাসজীবনই যে ঈশ্বরপ্রাপ্তির চরমপথ, একথা তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন না। এই একটিমাত্র বিষয়ে তাঁর মতানৈক্য ছিল পুত্রের সঙ্গে। বেদান্তদর্শন বৃদ্ধের কণ্ঠস্থ—কিন্তু বৈষ্ণব রসসাগরেই তিনি ডুবে আছেন। সত্যশরণকে তাই তিনি সংসারী করতে চান। মনে হল, এ মদনমোহনের গোপন নির্দেশ। না হলে সাণ্ডিল্য গোত্রের রোহিলা পটির একটি কুলীন কন্যার এমন অলৌকিক আবির্ভাব ঘটবে কেন তাঁর সংসারে! ননীচোরা এর চেয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত আর কি দিতে পারেন?

আপনি আমাকে আদেশ করুন! আমি কি বিবাহ করতে বাধ্য?

তর্কপঞ্চাননের মনে হল, সত্যশরণ কিছুটা অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। পিতার নির্দেশ যাচ্ঞা করে প্রতীক্ষা করার শিক্ষা আছে সত্যশরণের। এভাবে তাগাদা সে কখনও দেয় না। তবে কি মদনমোহন ওর অন্তরেও অনুরাগ সঞ্চারিত করেছেন? শুক্ল দ্বাদশীর পূর্ণালোকিত জ্যোৎস্নায় একটি কুমারী মেয়ের ধর্মরক্ষা করতে গিয়ে কি অন্তরের আগল খুলে গেছে তাঁর যুবক পুত্রের? লোকলজ্জায় অভিভূত হয়ে সে কি পিতার কাছে আদেশ চাইতে এসেছে? কিন্তু না। পুত্র নয়—ও জিজ্ঞাসু। ও জানতে চায় শাস্ত্রের বিধান। ও শুনতে চায়, এ অবস্থায় বিবাহ করতে সে বাধ্য কিনা। সত্যভাষণ থেকে বিচ্যুত হতে পারেন না তিনি। বললেন: না, বিবাহ করতে তুমি বাধ্য নও। তুমি অন্যায় কর নি কিছু—

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল সত্যশরণের।

কিন্তু সে কথা তোমাকে সর্বসমক্ষে স্বীকার করতে হবে। ওঁরা তোমার কথায় বিশ্বাস করে বিধান দিয়েছেন। ওঁরা মেনে নিয়েছেন যে তুমি ঐ কুমারী মেয়েটির গাত্রস্পর্শ কর নি।

pathagar.net

একটু যেন বিচলিত হয়ে পড়েছেন সত্যশরণ : এ কী বলছেন আপনি ! একথা কি সর্বসমক্ষে বলা যায় ?

বলতেই হবে তোমাকে। সত্য-প্রকাশে সঙ্কোচ থাকা উচিত নয়।

তর্কবাগীশ বলেন : সত্যের চেয়েও বড় হচ্ছে 'শিবম্,' 'সুন্দরম্'। একটি ভয়ত্রস্তা বালিকাকে কী ভাবে আমি শান্ত করেছিলাম, তারই উপস্থিতিতে সর্বসমক্ষে সে কথা প্রকাশ করার মধ্যে যে স্থূলতা আছে —তাতে না আছে কোন মঙ্গল না সুন্দরের প্রকাশ। সে আমি পারব না।

তর্কপঞ্চানন বললেন : আচার্যবংশে সবার উপরে স্থান 'সত্যের'।

রুখে উঠলেন তর্কবাগীশ : না ! তাহলে আমি বলব আচার্যবংশ সত্যকে ভালবাসে না, সত্যপ্রকাশের দম্ভকেই ভালবাসে !

সত্যশরণ !

আমিও আচার্যবংশীয়। আমি প্রমাণ দেব, সত্যের চেয়ে আমার কাছে শিব এবং সুন্দর বড়। সত্য যেখানে রূঢ়, সত্য যেখানে স্থূল কদর্য, তার চেয়ে সুন্দর আমার কাছে শ্রেয়।

তর্কপঞ্চাননের বাক্যস্ফূর্তি হল না।

পিতার পদধূলি গ্রহণ করলেন তর্কবাগীশ : আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন, একথা প্রকাশ্যে উচ্চারণ করতে পারব না—

স্থানত্যাগ করে গেলেন তর্কবাগীশ।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বৃদ্ধ সত্যসিন্ধু। তাঁর বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল জগু-ঠাকরুণের কথায় : ওরে, ও সতু ! খোকা রাজি হয়েছে ! ঐ মেয়েটিকেই বিয়ে করবে সে !

বাসরঘরের জনান্তিকে তর্কবাগীশ নববধূকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি বিয়ে করব না বলাতে তুমি খুব ভয় পেয়েছিলে, নয় ?

কাজলকালো হরিণ নয়ন দুটি তুলে নববধূ বলেছিল : মোটেই না ! আমি জানতাম আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হবেই।



pathagar.net

কেমন করে জানলে ? তুমিও কি ভৃগু জান নাকি ?

তা কেন ? কিন্তু আপনি যে মিছে কথা বলেন না। আপনি বলেছিলেন—যাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে তার শৌর্য ইন্দ্রের মতো। শুনেছি, নবদ্বীপের পণ্ডিতসভায় আপনিই এখন রাজেন্দ্র।

এবার আর মুখরা মনে হয়নি মেয়েটিকে। তর্কবাগীশ বলে ছিলেন : তাই শুনেছ বুঝি ? তাহলে আমার আশীর্বাদের দ্বিতীয় চরণটাও তুমি সার্থক করবে' নিশ্চয়।

দ্বিতীয় চরণটা কি ?

'জয়ন্ত প্রতিমো সুতঃ !'

রক্তচীনাংশুকে মুখ লুকিয়েছিল নববধূ।

··মনে আছে এখানে সত্যপ্রিয়দাকে বাধা দিয়ে বলেছিলাম—তোমাদের বংশে শুনেছি কেউ মিছে কথা বলেনি। তুমিও নাকি বল না। কিন্তু এটা তো স্রেফ এক-নম্বর গুল ঝাড়লে দাদা ! বাসর-ঘরের জনান্তিকে তোমার বুড়ো-ঠাকুর্দা কিভাবে প্রেম-সম্ভাষণ করেছিলেন তোমার বুড়ো-ঠাকুরমাকে তার ভার্বাটিম রিপোর্ট তুমি পেলে কেমন করে ?

প্রিয়দা হেসে বলেছিল : কি করে যে তুই গপ্প-টপ্প লিখিস্ নরেন ! এই সোজা কথাটা তোর মাথায় ঢুকল না ? মহামুনি নারদের উপদেশ মনে নেই : কবি তব মনোভূমি রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেন !

তর্কপঞ্চাননের গৃহে আনন্দের জোয়ার এসে লাগল যেন। জগু-ঠাকরুণ নতুন করে ঘরদোর সাজালেন। সংসারে তাঁর খোকার মন হয়েছে। সংসারের কাজও অনেক হালকা হয়েছে জগু-ঠাকরুণের নববধূ একেবারে বালিকা নয়। নিরলস সেবায় সে যথাসাধ্য সাহায্য করে ঠাকরুণকে। প্রতিদিন প্রাতে উঠে সে স্বামীর পাদোদক গ্রহণ করে, প্রণাম করে শ্বশুরকে—তারপর নেমে পড়ে সংসারের দৈনন্দিন

pathagar.net

কাজে। মাঝে মাঝে তর্কপঞ্চানন পঞ্জিকা দেখে জগু-ঠাকরুণকে বলেন : আজ খোকা ভিতর বাড়িতে শোবে।

সেদিন পাখির পালকের মতো হালকা মন নিয়ে পৌলমী সমস্ত দিন যেন হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়।

তর্কপঞ্চাননের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তির কাছে কিছুই গোপন ছিল না। পুত্র-পুত্রবধূর গভীর প্রণয়ের সংবাদ তিনি রাখতেন। চতুষ্পাঠীর যাবতীয় দায়িত্ব দেওয়া ছিল পুত্রের উপর। মীমাংসা নিয়ে যখন মতানৈক্য ঘটত তখনই শুধু পিতার দ্বারস্থ হতেন পুত্র। সুন্দরী স্ত্রীর একান্ত প্রণয় সত্ত্বেও চতুষ্পাঠীর কাজে বিন্দুমাত্র অবহেলা ছিল না। বৃদ্ধ নিশ্চিন্ত ছিলেন। কাটল আরও দুটি বৎসর। নূতন করে বৃন্দাবন যাত্রার আয়োজন করলেন আবার। মায়ার বন্ধন বাড়ছে! পুত্রকে সংসারী করেছেন। চতুষ্পাঠীর সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। আর কি কাম্য থাকতে পারে সংসারী সত্যসিন্ধুর? আগামী অক্ষয়-তৃতীয়ার পুণ্য তিথিতে এবার যাত্রা করতেই হবে। সে-যুগে এতে আপত্তি করার রেওয়াজ ছিল না। পিতার এ সংকল্প শুনে নীরব থাকতে হল পুত্রকে।

বাদ সাধলেন জগু-ঠাকরুণ। বৃন্দাবন যাত্রার আয়োজন যখন সম্পূর্ণ তখন তিনি এসে দাঁড়ালেন মহড়া নিয়ে : তোর কি বুদ্ধিসুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছেরে সতু? এ সময় তুই তীর্থে যেতে চাস্ কোন আক্কেলে? আমি মেয়েমানুষ, একা কতদিক সামলাব?

সত্যসিন্ধু আকাশ থেকে পড়েন : কেন? কি হল আবার?

কি হল মানে? এই বোশেখী পুন্নিমেতে আমি পঞ্চামৃতের ব্যবস্থা করেছি, আর তার আগেই তুই তীর্থে চলে যাবি, মানে?

বিস্মিত পণ্ডিত বলেন : পঞ্চামৃত! পঞ্চামৃত কি?

জগু-ঠাকরুণ খুক্‌খুক্ করে হেসে উঠে বলেন : পণ্ডিত না হাতী, পঞ্চামৃত কাকে বলে জানিস না?

pathagar.net

নবদ্বীপগৌরব তর্কপঞ্চানন ঢোক গিলে বলেন : না, না, পঞ্চামৃত হল দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু আর শর্করা, কিন্তু—

ওসব কিন্তু-টিন্তু আমি শুনছি না, এই লক্ষ্মীবারে পুন্নিমে পড়েছে। তোকে দিয়ে তো আর এসব হবে না, তাই আমি শিরোমণিমশাইকে পাঁজি দেখিয়েছি, বেলা আড়াইদণ্ডে উত্তর-ফাল্গুনী নক্ষত্রে বৌমাকে পঞ্চামৃত দান করতে হবে। তোর তীর্থে যাওয়া এখন হবে না বাপু।

অর্কফলায় একটা করবী ফুল বাঁধতে বাঁধতে তর্কপঞ্চানন শুধু বললেন : তাইতো। একথা তো জানা ছিল না আমার জগুদিদি!

তা জানবে কোত্থকে? সংসারের দিকে কি তোর একটুও নজর আছে? আমার সোনার পিতিমে গিয়ে ইস্তক—চোখে আঁচল দিলেন জগু-ঠাকরুণ। শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ পার করে আজ কেন যে ওঁর ভ্রাতৃজায়াকে মনে পড়েছে তা বুঝতে পারেন তর্কপঞ্চানন। যাত্রা স্থগিত রাখতে হল আবার।

কাটল আরও তিন চার মাস।

আচার্যগৃহে নূতন মানুষ আসছে। তর্কপঞ্চানন লক্ষ্য করছেন আসন্ন মাতৃত্বের গৌরবে বধূমাতা দিনে দিনে বিকশিত হয়ে উঠছেন। এসময় নানান সাধ জাগে আসন্ন মাতার মনে। সে সাধ পূরণ করতে হয়। জগু-ঠাকরুণ তাই নিয়ে ব্যস্ত! গোয়ালঘরের পাশে নূতন চালাঘর উঠেছে একখানা। নবাগতের জন্য নূতন গৃহ! এমন যে তর্কপঞ্চানন, তিনিও যেন কিছু চঞ্চল কিছু অন্যমনস্ক। বারে বারে উঠে যান ভিতর বাড়িতে, হাঁক পড়ে জগুদিদির। হাতের কাজ ফেলে ছুটে আসেন দিদি। বৃদ্ধ বলেন : বৌমা ভাল আছেন তো?

জগু-ঠাকরুণ মুখ টিপে হাসেন, বলেন : আছেন; কিন্তু খোকা হওয়ার সময় তুই তো এতটা উতলা হসনি সতু।

তর্কপঞ্চানন সত্যই লজ্জা পান। কোন একটা ছুতায় আবার বেরিয়ে যান বা'র-বাড়িতে—অর্থাৎ চতুষ্পাঠীতে।

pathagar.net

পুত্র সত্যশরণও কেমন যেন অন্যমনস্ক। যে কোন দিন, যে কোন মুহূর্তে মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠতে পারে অন্দর মহলে। বিন্দা নাপতিনীকে খবর দেওয়াই আছে, তৈরী হয়ে আছে সেও।

আচার্যবাড়িতে যখন এই রকম অবস্থা তখন নবদ্বীপে আবার ঘটল একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পশ্চিমাগত এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এসে উপস্থিত হলেন নদীয়ার পণ্ডিতসমাজে। দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত—শঙ্করপন্থী। পঞ্চাশোর্ধ্বে বয়স মুণ্ডিতমস্তক—জ্ঞানবৃদ্ধ সন্ন্যাসী। পরিধানে তাঁর গৈরিক বস্ত্র, হাতে দীর্ঘ সন্ন্যাসদণ্ড। দণ্ডী তিনি। উত্তরখণ্ড বিজয় সম্পূর্ণ করে—কাশী, মিথিলা, ত্রিবেণী, গুপ্তিপাড়া, শান্তিপুর হয়ে সন্ন্যাসী এসে উপস্থিত হয়েছেন খাস নবদ্বীপে। অদ্বৈত-বেদান্তের ধ্বজাধারী এসে উপস্থিত হয়েছেন রসসমুদ্র সৈকতে। রাধাকৃষ্ণের দ্বৈতলীলার মঞ্চভূমে। নবদ্বীপ বিজয় সমাপ্ত হলে তিনি পণ্ডিত-চক্রবর্তী বলে গণ্য হবেন।

নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ তর্কপঞ্চাননের দ্বারস্থ হলেন।

হাত দুটি জোড় করে জ্ঞানবৃদ্ধ বললেন: আপনারা আমাকে মার্জনা করবেন। আজ বিশ বৎসর আমি কোনও বিতর্ক সভায় যোগদান করিনি। সংসারাশ্রম মনে মনে ত্যাগ করেছি আমি। সত্যানুসন্ধানের যে পর্যায়ে আমি আছি, সেখানে বিতর্ক নিরর্থক। সে ধ্যানের জগৎ, উপলব্ধির জগৎ। বিচারতর্কে সেখানে মীমাংসা নাই।

কিন্তু নবদ্বীপের সম্মান?

সে সম্মানরক্ষার দায়িত্ব এখন নব্যপণ্ডিতদের। আমাদের কাল গত হয়েছে।

তাহলে বলুন, নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ কাকে প্রতিনিধিত্ব দেবে?

তর্কপঞ্চানন বলেন: নবদ্বীপের যাবতীয় নব্যপণ্ডিত আপনাদের পরিচিত। আপনারাই বিচার করে প্রতিনিধি নির্বাচন করুন।

আমরা যদি নবদ্বীপ-গৌরব সত্যসিদ্ধ তর্কপঞ্চাননের সুযোগ্য পুত্র সত্যশরণ তর্কবাগীশকে এ দায়িত্ব দিই?

pathagar.net

সত্যশরণের উচিত সে দানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা। এ তার সৌভাগ্য।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসেন তরুণ নৈয়ায়িক। পদধূলি গ্রহণ করেন—শুধু পিতার নয়, শুধু আচার্যের নয়—নবদ্বীপের শেষ গৌরব-রবির।

সে রাত্রে দীর্ঘ আলোচনা হল পিতাপুত্রে—রুদ্ধদ্বার কক্ষে। বারে বারে দ্বারের কাছে এসে ফিরে গেলেন জগু-ঠাকরুণ—বলি বলি করেও জরুরী কথাটা বলার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারলেন না। পিলসুজের উপর ঘৃতপ্রদীপ জ্বলছে—গুরু-শিষ্য তন্ময় হয়ে আছেন আলোচনায়। ত্রিযামা রাত্রি নিঃশব্দ চরণে বিদায় নিল সকলের অজান্তে।

নবদ্বীপরাজের সভামণ্ডপে আয়োজন করা হয়েছে বিতর্কসভার। সমস্ত নদীয়ার পণ্ডিতমণ্ডলী উপস্থিত। শুধু নদীয়াই বা কেন, নৌকাযোগে এসে পৌঁছলেন ত্রিবেণী, গুপ্তিপাড়া, তেঘরার মহামহোপাধ্যায়রা। তর্কপঞ্চানন সভামণ্ডপটিকে দেখছিলেন। তাঁর মনে পড়ে গেল যৌবনের এক বিতর্কসভার স্মৃতি। কলকাতায় রাজা নবকৃষ্ণের রাজসভায় সেদিন তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন তার দীক্ষাগুরু রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের শিষ্যরূপে। সেবার পশ্চিমাগত পণ্ডিতের গর্বচূর্ণ করেছিলেন অনাড়ম্বর সরল বুনো রামনাথ!

নবদ্বীপরাজের দক্ষিণে বসেছেন দাক্ষিণাত্যের দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত—সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। পরিধানে গৈরিক কাষায়, মুণ্ডিত-মস্তক—এক হাতে কমণ্ডলু, অপর হাতে শঙ্করপন্থীর সন্ন্যাসদণ্ড! রাজার বামদিক কাষ্ঠাসনে বসে আছে পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় যুবক—উন্নতনাসা, গৌরবর্ণ, ঘৃতপ্রদীপের অচঞ্চল দীপশিক্ষার মতো তরুণ পণ্ডিত।

দাক্ষিণাত্যের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী উঠে দাঁড়ালেন। মুহূর্তে নীরব হয়ে গেল সভাস্থ সবাই। পণ্ডিত বঙ্গভাষা জানেন না—কথাবার্তা, আলোচনা, বিতর্ক সমস্তই হবে সংস্কৃতে। সন্ন্যাসী বললেন: আমার তিনটি প্রশ্ন আছে।

pathagar.net

জনাকীর্ণ সভা কর্ণময় ; কোন শব্দ নাই কোথাও।

তর্কপঞ্চানন বলেন : বলুন, কি আপনার জ্ঞাতব্য ?

প্রথম কথা, ঐ তরুণ পণ্ডিতকে আপনারা প্রতিনিধিত্ব দিয়েছেন। একমাত্র এঁকে পরাস্ত করতে পারলেই আপনারা আমার নবদ্বীপ-বিজয় সুসম্পন্ন হয়েছে বলে স্বীকার করবেন তো ?

তর্কপঞ্চাননের শুকচঞ্চু নাসার দুটি পাশ ফুলে ওঠে। তিনি কোন প্রত্যুত্তর করলেন না। তাঁর মনে হল সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী সত্যানুসন্ধানের জন্য ভূ-ভারত প্রদক্ষিণে বার হননি। তাঁর উদ্দেশ্য হল দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হওয়া। অহং-বোধ ! সভার সমস্ত আয়োজনকে প্রহসন মনে হল তাঁর।

নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ কিন্তু ঐ উদ্ধত প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর দান করলেন : প্রতিনিধি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের ভিতরেই কি আপনার প্রশ্নের উত্তর নাই ?

সন্ন্যাসী মৃদু হেসে বলেন : আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, এই বিতর্কসভার একজন বিচারক চাই—কে হবেন বিচারক ?

নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী একবাক্য বলেন : মহামহোপাধ্যায় সত্যসিন্ধু তর্কপঞ্চানন !

চম্‌কে ওঠেন বহিরাগত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত : সে কি ! তিনি তো আমার তরুণ প্রতিযোগীর পিতা !

বাধা দিলেন স্বয়ং নবদ্বীপরাজ। তিনিও সংস্কৃতজ্ঞ। বলেন ; শুধু পিতা নন, তিনি ওঁর গুরু, আচার্য ! কিন্তু আপনি ভুলে গেছেন, ওঁর নাম সত্যসিন্ধু আর ওঁর পুত্রের নাম সত্যশরণ। আপনি বিস্ময় প্রকাশ করে নদীয়ার সত্যাশ্রয়ী পণ্ডিতসমাজকে অপমান করছেন।

সন্ন্যাসী লজ্জা পেলেন। ত্রুটি স্বীকার করলেন। মার্জনা চাইলেন সর্বসমক্ষে তর্কপঞ্চাননের কাছে। উদ্গার-উন্মুখ আগ্নেয়-গিরির মতো স্থির হয়ে বসে আছেন সত্যশরণ। নাকের দুটি পাশ

pathagar.net

ফুলে উঠেছে তাঁর—কপালের গোলাকৃতি চন্দনের ফোঁটাটা দেখাচ্ছে লম্বাটে—

সভায় চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। অপমান গলাধঃকরণ করে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বলেন: বেশ ওঁকেই আমি বিচারক বলে মেনে নিলাম।

খড়ম জোড়া খুলে রেখে তর্কপঞ্চানন নীরবে উঠে বসলেন বিচারকের উচ্চ আসনে।

নবদ্বীপরাজ বলেন: এবার বিতর্ক শুরু হতে পারে।

বাধা দিয়ে আগন্তুক বলেন: আমার তৃতীয় প্রশ্নটি বাকি আছে। বিচারসভায় এখন বিচারক এসেছেন, তাঁকেই প্রশ্ন করছি আমি। বিজয়ীর পুরস্কার কি?

জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ডের মতো দুটি চক্ষু মেলে সত্যশরণ বলেন: আগন্তুকের অভিরুচি আমরা পূর্বে শুনতে চাই।

আমি যদি তর্কে পরাস্ত হই তবে সর্বসমক্ষে আমি এই ভারতজয়ী সন্ন্যাসদণ্ড দ্বিখণ্ডিত করব। ঐ নব্যপণ্ডিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ওঁরই নির্দেশে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করে নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী খুলে বসব।

সভাস্থ সবাই চমকে ওঠে সে অঙ্গীকার শুনে।

আর যদি আপনি বিজয়ী হন?

তাহলে ঐ নব্যপণ্ডিত আমার কাছে দীক্ষা নেবেন। গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগ করে চলে যাবেন আমার সঙ্গে সংসার ত্যাগ করে।

ঝাড়-লণ্ঠন সমেত সমস্ত সভামণ্ডপটা দুলে উঠল যেন তর্কপঞ্চাননের চোখের সম্মুখে। মনে পড়ল গৃহে তাঁর আসন্নপ্রসবা পুত্রবধূ। মনে পড়ল, শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ পূর্বেকার একটি রাত্রির কথা। ফলিত জ্যোতিষের নির্দেশ পেয়েছিলেন তিনি—নবজাতক অকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করবে। মনে পড়ল, চতুষ্পাঠীর ভার পুত্রের উপর ন্যাস্ত করে তিনি নিজে বানপ্রস্থে যাবার আয়োজন সম্পূর্ণ করে রেখেছেন। বৃন্দাবনের বাঁশী শুনেছেন তিনি!

pathagar.net

সভাস্থ সবাই স্তব্ধ, মূক। এ কি কঠিন শর্ত! সত্যশরণ যে শিশু! সংসারাশ্রমের কিছুই যে সে দেখেনি—সন্ন্যাস নেবার মতো তার মানসিক গঠনই যে হয়নি এখনও। কামনা-বাসনা রাগ-অনুরাগের রশি যে তার মজ্জায় মজ্জায় জড়ানো। সে কেন সন্ন্যাস নেবে? সেই স্তব্ধ মৌন সভামণ্ডপে মহারাজের বামপার্শ্ব থেকে উঠে দাঁড়ালেন একজন। তরুণ নৈয়ায়িক সত্যশরণ তর্কবাগীশ। বললেন: আমি মেনে নিলাম এ শর্ত!

জ্ঞাননিধু তকল্মষ তর্কপঞ্চানন নিজ ইন্দ্রিয়কে বশে রাখতে জানেন, বললেন: তথাস্তু।

শুরু হল বিচার।

সভা উৎকর্ণ আগ্রহে শুনছে বসে। প্রহরের পর প্রহর অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। ন্যায়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারের সে ক্ষুরধার পথে সকলে প্রতিযোগী পণ্ডিত দু'জনকে অনুসরণ করতে পারলেন না। মুষ্টিমেয় কয়েকজন শুধু বুঁদ হয়ে রইলেন সে আলোচনায়। নস্যদানী থেকে ঘন ঘন নস্য গ্রহণ করার শব্দও বন্ধ হয়ে গেল ক্রমে।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই উপলব্ধি করলেন, কঠিন প্রতিযোগীর সম্মুখীন হয়েছেন তিনি আজ। বুঝলেন, ব্যঙ্গ আর শ্লেষে প্রতিপক্ষকে বিচলিত করা যাবে না। তাঁর সমস্ত ব্যঙ্গোক্তি, সমস্ত শ্লেষকে তরুণ নৈয়ায়িক অসীম ক্ষমায় উপেক্ষা করে যাচ্ছেন—শুধু যুক্তি-নির্ভর ঋজু বক্তব্যে এগিয়ে চলেছেন চরম সিদ্ধান্তের দিকে। ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব-প্রতিযোগিতার ঊর্ধ্বে উঠেছেন তর্কবাগীশ অনায়াসে। সন্ন্যাসী লক্ষ্য করে দেখলেন, সভাস্থ সকলেই নবীন পণ্ডিতের এই অনাসক্ত উপেক্ষাকে মনে মনে প্রশংসা করছেন। ফলে তিনিই ছোট হয়ে যাচ্ছেন ক্রমে। সংযত হলেন সন্ন্যাসী। সংহত হলেন। তর্কের ধারা পরিবর্তন করতে বাধ্য হলেন।

pathagar.net

নিমীলিতনেত্র বিচারক বসে আছেন ধ্যানস্থ হয়ে। একেবারে সমংকায়শিরোগ্রীব। নাসিকাগ্রে নিবদ্ধ দৃষ্টি। সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম তাঁর কর্ণময়, মনোময় হয়ে আছে যেন।

বিচলিত হয়ে পড়লেন সন্ন্যাসী। তাঁর তরুণ প্রতিপক্ষ এতক্ষণ শুধু উত্তর দান করে যাচ্ছিলেন—যে মুহূর্তে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করে থামলেন ঠিক সেই মুহূর্তেই শুরু হল নবীন তার্কিকের প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ। একটি একটি করে কূট প্রতিপ্রশ্ন পেশ করতে থাকেন তর্কবাগীশ। কেমন যেন অসহায় বোধ করলেন সন্ন্যাসী। উত্তর দান করলেন—কিন্তু নিজেরই মনঃপূত হল না সে ব্যাখ্যা। মৃদু গুঞ্জন উঠল সভায়। সমস্ত বুদ্ধি, শিক্ষা, জ্ঞান একত্র করেও বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ঐ নব্য নৈয়ায়িকের ক্ষুরধার যুক্তি খণ্ডন করতে পারলেন না। পায়ের তলায় দুলে উঠল মাটি, চরম সর্বনাশকে প্রত্যক্ষ করলেন যেন।

উপর্যুপরি বিজয়ে তাঁর পরম আত্মবিশ্বাস জন্মেছিল, তারই ফলে আজ ঐ অপরিণত যুবকটিকে প্রতিযোগীরূপে পেয়ে তিনি কঠিন শর্ত করে বসেছেন। হঠাৎ মনে হল ভাল করেননি।

আজকের পরাজয়ের অর্থ ঐ নাবালকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হবে—সর্বসমক্ষে দ্বিখণ্ডিত করতে হবে তাঁর ভারতজয়ী সন্ন্যাসদণ্ড! একটা অব্যক্ত রুদ্ধ কান্নায় কণ্ঠরোধ হয়ে এল বৃদ্ধের। আপ্রাণ চেষ্টা করলেন ঐ তরুণ পণ্ডিতের যুক্তি খণ্ডন করতে। কিন্তু তীক্ষ্ণধী নব্য পণ্ডিতের বক্তব্য যেন লৌহজালিকে সুরক্ষিত—স্পর্শমাত্র করতে পারলেন না তাকে একবারও।

বিচারের প্রথম পর্যায় সমাপ্ত হল।

কলগুঞ্জন উঠল সভায়।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মুখটা আর তুলতে পারলেন না। মনে হল, সভায় সকলে তাঁরই দিকে তাকিয়ে আছে। পরাজয়ের গ্লানি এতকাল প্রতিপক্ষের বুকে কী নিদারুণভাবে বেজেছে আজ যেন

pathagar.net

তা তিনি প্রথম অনুধাবন করতে শুরু করেছেন। বিচারের ফলাফল সম্বন্ধে এতক্ষণে নিঃসন্দেহ হয়ে পড়েছেন। বুঝতে পেরেছেন, বিচারের দ্বিতীয় পর্যায়েও ঐ তরুণ পণ্ডিতকে পরাজিত করা তাঁর পক্ষে সাধ্যাতীত।

সংক্ষিপ্ত বিরতির অবসানে আবার সবাই যে যার আসনে এসে বসলেন। বিচারক আসন ত্যাগ করেননি। সন্ন্যাসী অধোমুখে গিয়ে বসলেন নিজ আসনে। ঠিক সেই সময়ে কে যেন এসে সত্যশরণকে কানে-কানে কিছু নিবেদন করল। তীক্ষ্ণদৃষ্টি সন্ন্যাসী লক্ষ্য করলেন, শ্রবণমাত্রেই তাঁর প্রতিযোগীর সর্বাবয়ব একবার যেন থরথর করে কেঁপে উঠল, পরমুহূর্তেই কিন্তু সংযত হলেন তিনি। নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতোই অচঞ্চল স্থির হয়ে গেলেন আবার।

তর্কপঞ্চানন জানতেও পারলেন না।

বিতর্কসভার দ্বিতীয় পর্যায়ে কিন্তু ফলাফল হল অচিন্তনীয়।

কেমন যেন উদাসীন হয়ে পড়েছেন তর্কবাগীশ। যেন তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধির উপর করাল রাহুর ছায়াপাত ঘটেছে ইতিমধ্যে। ভ্রূ কুঞ্চিত হল তর্কপঞ্চাননের। নিমীলিত চোখ দুটি খুলে এই প্রথম তিনি পূর্ণ-দৃষ্টিতে চাইলেন প্রিয় শিষ্যের দিকে। তাকালেন সভাস্থ পণ্ডিতেরাও। এ যেন সেই তর্কবাগীশ নন। যেন আর কেউ। অত্যন্ত অসহায় বোধ হল তর্কবাগীশকে। উদ্যত এক প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসকে যেন কোনক্রমে রোধ করে তিনি সমাপ্তির প্রতীক্ষায় প্রহর গণছেন! যেন এ আলোচনায় তাঁর মন নেই—যেন উঠে যেতে পারলে বাঁচেন।

দীর্ঘ বাদানুবাদ শেষ হল। দ্বৈরথসমর সমাপ্ত। জয়পরাজয় যে কি হয়েছে তা কেউ অনুমান করতে পারলেন না। বিরতির পরবর্তী অংশে তর্কবাগীশ অনেকগুলি প্রশ্নের প্রত্যুত্তর করেননি —এমনকি অনেকবার অপ্রাসঙ্গিক উত্তর করেছেন। তিনি নিজে একটিও প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। অথচ অর্ধ-বিরতির পূর্ব-অংশে নিঃসংশয়ে তর্কবাগীশ সন্ন্যাসীকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন।



pathagar.net

সমস্তটা মিলিয়ে ফলাফল কি হল একথা বলা অত্যন্ত দুরূহ। ন্যায়-বিচারের ভারসাম্য শেষ পর্যন্ত কোনদিকে তিলমাত্র বেশী ঝুঁকেছে কে বলতে পারে? তর্কের সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু অবশ্য অনেকেই সম্যক প্রণিধান করতে পারেননি। মুষ্টিমেয় যে কজন পেরেছেন তাঁরা ভাবছিলেন দ্বৈরথসমর অমীমাংসিতই রয়ে গেল বুঝিবা।

ধ্যানস্তিমিত নেত্রে বসে আছেন বিচারক। নিমীলিত নেত্রে বসে আছেন তর্কবাগীশও। তাঁর দু চোখে নেমেছে জলের দুটি ধারা। অন্তরের কোন অন্তস্তলের উৎসমুখ থেকে এ ধারা নেমে এসেছে কেউ তা জানে না। আগ্রহে উন্মুখ দুটি নয়ন বিচারকের দিকে মেলে ধরে প্রতীক্ষা করছেন আগন্তুক সন্ন্যাসী। সমস্ত সভায় তিলমাত্র শব্দ নাই।

ধীরে ধীরে চোখ খুললেন তর্কপঞ্চানন। উঠে দাঁড়ালেন। সভাস্থ সবাই অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। দক্ষিণবাহু প্রসারিত করে তর্কপঞ্চানন নীরবে নির্দেশ করলেন আগন্তুক সন্ন্যাসীকে—

তার অর্থ?

নবদ্বীপাধিপতি সভাস্থ সকলের সেই উন্মুখ প্রশ্নটিকে বাঙ্ময় করে বললেন: আগন্তুক সন্ন্যাসী—?

—বিজয়ী?

সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রামকে সংযত করে ঐ একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করতে পারলেন তিনি। আর ঐ একটি মাত্র শব্দের প্রতিধ্বনিতে থরথর করে কেঁপে উঠল বৃদ্ধের দেহ। সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন তর্কপঞ্চানন।

জ্ঞান ফিরল দুদিন পরে। যেন নূতন এক পৃথিবীতে জেগে উঠলেন তিনি। হ্যাঁ, নূতন পৃথিবী, নূতন পরিবেশ। বদলে গেছে সব। আমূল পরিবর্তন! নবদ্বীপ অন্ধকার হয়ে গেছে। নব্য নৈয়ায়িক সত্যশরণ তর্কবাগীশ তার আগেই ত্যাগ করে গেছেন নবদ্বীপ।

pathagar.net

সংজ্ঞাহীন পিতার পদপ্রান্তে যে অশ্রুআর্দ্র প্রণামটি রেখে গেছেন তা যেন আজও লেগে আছে তর্কপঞ্চাননের চরণমূলে। সংসার শূন্য হয়ে গেছে একেবারে। না, শূন্য হয়নি! সংসার শূন্য হবার নয়। আচার্য বংশের পূর্বপুরুষ লুপ্ত-পিণ্ডোদক হননি। আঁধার ঘর আলো করে এসেছে নূতন চাঁদ। নূতন বংশধর। যে বংশধরকে জন্ম দিতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে তাঁর প্রাণাধিক পুত্রবধূ! ঈশ্বর করুণাময়—পুত্রের নির্বাসন দণ্ডদান করে পুত্রবধূর সম্মুখীন হতে হয়নি তর্কপঞ্চাননকে। সে দুর্ভাগ্য থেকে তাঁকে মুক্তি দিয়েছেন মঙ্গলময়। পরে জানতে পেরেছিলেন, এই দুঃসংবাদটাই কোন নির্বোধ পৌঁছে দিয়েছিল তর্কবাগীশের কাছে, খণ্ড-বিরতির অশুভলগ্নে।

জগু-ঠাকরুণ আবার নূতন করে কোলে তুলে নিলেন সদ্যোজাত শিশুকে। এ যেন তাঁদের নিয়তি! বজ্রাহত অশ্বত্থ বৃক্ষের মতোই সত্যসিন্ধু সমস্ত সহ্য করে খাড়া দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন ঐ কোমল মাংস-পিণ্ডটিকে যষ্টি করে। না, কোমল নয়, বজ্র-কুলীশ! আচার্য-বংশের রক্ত বইছে ওর ধমনীতে। হার মানবেন না সত্যসিন্ধু। নবদ্বীপের নব্যন্যায়ের চর্চাকে অবলুপ্ত হতে দেবেন না। আবার মানুষ করে তুলতে হবে পৌত্রকে! চতুষ্পাঠীকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে—বাঁচিয়ে রাখতে হবে বংশগৌরব! কিছুতেই হার মানবেন না তিনি।

না, হার তিনি মানেননি। অসম্ভবকেই সম্ভব করে তুলেছিলেন। দীর্ঘ পঁচানব্বই বছর বেঁচেছিলেন তিনি। তর্ক-বাগীশকে দেশছাড়া করে যে ক্ষতি করেছিলেন নবদ্বীপের, তার পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করে গিয়েছিলেন নিজের জীবিতকালেই। পৌত্রকে করে তুলেছিলেন বংশের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী। চতুষ্পাঠীর জ্ঞানচর্চার ধারাও অবলুপ্ত হতে পারেনি তর্কবাগীশের অকাল প্রস্থানে। সত্যসিন্ধুর সব ইচ্ছারই পূরণ হয়েছিল। শুধু একটিমাত্র ইচ্ছাই অপূর্ণ ছিল তাঁর—বানপ্রস্থ নেওয়া, বৃন্দাবনে যাওয়া। বৃন্দাবনের



pathagar.net

বাঁশী মনে মনেই শুধু শুনেছিলেন তিনি। অন্তর্জলীযাত্রা করেছিলেন, নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে,—সজ্ঞানে। অর্ধঅঙ্গ গঙ্গাতীরে, অর্ধঅঙ্গ গঙ্গানীরে রেখে, ইষ্টনাম জপ করতে করতে অস্তমিত হয়েছিলেন নবদ্বীপের শতাব্দী-সূর্য। পায়ের কাছে বসে মোহমুদ্গর পাঠ করে শুনিয়েছিলেন নবদ্বীপের নব্যপণ্ডিত—তর্কবাগীশের সুযোগ্য পুত্র—বিংশতিবর্ষীয় সত্যানন্দ তর্করত্ন। আমাদের প্রিয়দার ঠাকুরদা। যাঁকে আমি একবারমাত্র দেখেছিলাম বর্ধমান ফ্রেজার হাসপাতালে উনিশ শ চুয়াল্লিশ সনে। তখন তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ।

পূর্বপুরুষদের ইতিকথা শেষ করে প্রিয়দা সেদিন হেসেছিল মনে আছে। বলেছিল—তিনটে ইন-অর্গ্যানিক সল্টের পরিচয়ের দাম তোদের কাছে ছিল তে-পাঁচে পনের টাকা। কিন্তু তোর এই নির্বোধ প্রিয়দার কাছে সেটা ঠিক পনের টাকা মনে হয়নি, বুঝলি নরেন—দিতে হলে আরও কিছু বেশি দিতে হত আমাকে। বেণীর সঙ্গে মাথা! সে কথা আর কেউ বুঝবে না। তুই লিখিস-টিকিস, পারলে তুই বুঝবি হয়তো।

সত্যদার কাছে এসব গল্প শুনেছিলাম ছাত্রজীবনে। আমরা তখন ছিলাম বি. ই. কলেজের ফাইনাল ইয়ারের দুটি ছাত্র। ডাউনিং ইস্ট হস্টেলের একতলার দশ নম্বর ঘরে পাশাপাশি দুটি সীট দখল করে বাস করতাম আমরা। কেউ ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলে বলতাম 'টেন ডাউনিং স্ট্রীট!' সকাল সাতটার মধ্যে কলেজে গিয়ে হাজিরা দিতে হত। সাতটা থেকে বারোটা পর্যন্ত থিওরেটিক্যাল লেকচার। বারোটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত স্নানাহারের ছুটি। তখন ছুটি হস্টেল পানে। সব ছাত্রাবাসের ছেলে জড়ো হত ডাইনিং-হলে। এখনকার ছাত্রদের মতো পৃথগন্ন ছিলাম না আমরা সে-যুগে। সব হস্টেলের ছেলে খেতে আসত একই ডাইনিং-হলে। অবশ্য সব হস্টেল বলতে তখন ছিল কুল্লে আড়াইটি। ডাউনিং, শ্লেটার আর শ্লেটারের বাচ্চা বেবী-শ্লেটার। ওভাল-মাঠের পূবে আর পশ্চিমে ছিল আরও দুটি



pathagar.net

ছাত্রাবাস। য়ুরোপীয়ায় ব্যারাক আর হিটন হাউস। সে আমলে এটায় থাকত খ্রীষ্টান আর ওটায় মুসলমান ছাত্র। তাদের অবশ্য পৃথক ডাইনিং হল ছিল। তা সে যাহোক, দ্বিপ্রহরে সব হিন্দু ছাত্রই আমরা একত্র হতাম। যুদ্ধের আমল। লীগ মিনিস্ট্রি। আহারের আয়োজন খুব জুতের ছিল না। আমাদের স্বনামধন্য দাদাদের মুখে শুনেছি, তাঁদের আমলে নাকি বি. ই. কলেজ ছাত্রাবাসে আহারের আয়োজনটা ছিল রাজসিক। সপ্তাহান্তে বাড়ি গেলে, বাড়ির খাবার তাঁদের মুখে রুচত না। যদিও বড়লোকের ছেলে ছাড়া বড় একটা কারও সুযোগ হত না বি. ই. কলেজে পড়ার। আমাদের সে-যুগ ছিল কাঁকরমণির যুগ। রীতিমতো 'ডেণ্টাল-ফোর্স অ্যাপ্লাই' না করলে সে চালে দন্তস্ফুট করে কার সাধ্য। সপ্তাহে একদিন প্রতি শুক্রবার, হত মাংসের আয়োজন। মাছ অবশ্য দু-বেলাই হত। না হলে ডিম। সত্যদা অবশ্য খেত টোটাল*। আমরা ঠাট্টা করে বলতুম—জাত বোষ্টম যে।

বেলা দেড়টা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত সাধারণত সেশানাল প্লেট করতে হত। সত্যদার পাশাপাশি সীট ছিল আমার। চারটের পর ছুটি। হস্টেলে ফিরে আসতুম দুজনে ক্লক-টাওয়ারের তলা দিয়ে। হস্টেলের বেয়ারার নাম ছিল শুখা। উৎকলবাসী। শুখা সে মোটেই নয়, বেশ রসস্থ মন তার। আমাদের বৈকালিকী ভোগের আয়োজনটা তারই হেপাজতে। গোগ্রাসে গিলে আমরা দুটিতে বেরিয়ে পড়তুম বোটানিক্সের দিকে।

---

* বি. ই. কলেজের অভিধানে 'টোটাল' অর্থে নিরামিষ খাদ্য। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আমার জানা নেই। দুটি মত আছে। কেউ কেউ বলেছেন এটি 'টিটোটাল' শব্দের অপভ্রংশ, মদের বদলে মাংসের ক্ষেত্রে 'টি'কে বাদ দেওয়া হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, প্রাচীন যুগে একবার নাকি এক সাহেব সিবিল সার্জেন রিপোর্টে লিখেছিলেন—The vegetarian dish should have the 'total' calorific value of the non-vegetarian meals. সেই থেকে উৎকলবাসী বড়ঠাকুর ওটাকে 'টোটাল' বলে।

Pathagar.net

সত্যদাকে পিউরিটান বলতে পারব না, মর্বিড তো নয়ই। সিগারেট খেত মাঝে মাঝে। ধরে নিয়ে গেলে সিনেমাও যেত। সিনেমা তারকাদের নিয়ে আলোচনা উদ্দাম হয়ে উঠলে কানে আঙুল দিয়ে উঠে যেত না। কিন্তু আলোচনাতে যোগও দিত না। বোঝা যেত সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষটির এসব পছন্দ নয়, নেহাত দলে পড়ে করছে। তাস খেলত, তবে রাত এগারোটার পর মোমবাতিজ্বলা তে-তাস নয়—তের-তাস। সে আমলে ছাত্রাবস্থায় আমরা কেউ টাই পরতুম না—সত্যদাও পরত না।

অরিওডোজা অ্যাভিনুতে শ্যাম তৃণাচ্ছাদিত একটি পরিচিত কোনায় গিয়ে বসতাম আমরা দুজন। গল্প হত। ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করতাম দুটি বন্ধুতে মিলে। পাস করে আমরা কারও কাছে চাকরি করব না। একটা স্বাধীন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান খুলব আমরা দুটি বন্ধুতে মিলে—একটি ছোট্ট সৎ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান। প্রিয়দা আমার চেয়ে বয়সে বড়, পনেরটা টাকার মায়ায় পড়ে বেচারী সিনিয়র হতে পারেনি। তাকে দাদা ডাকি—তাই ও হবে সিনিয়ার পার্টনার, আমি জুনিয়ার। জাল জুয়াচুরি ঘুষ-ঘাষ এসব কারবারে থাকব না আমরা। মাথাও নিচু করব না কারও কাছে! যুদ্ধের বাজারে চোখের উপরেই অনেককে লাল হয়ে যেতে দেখেছি ঠিকাদারী করে; সমাজে ঠিকাদার-শ্রেণী মাত্রেই হেয় হয়ে গেছে। আমরা দেখাব সৎপথে থেকেও যথেষ্ট রোজগার করা যায়।

আমি বলতুম, কিন্তু একদিকে ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার ঠিকাদারের দল আর একদিকে ঘুষখোর অফিসারদের ব্যূহ—আচারিয়া অ্যাণ্ড সান্যাল কোম্পানী কি করতে পারে?

প্রিয়দা বলত: বেশ, গদা ঘোরাতে না পারি ঘোরাবো না। গাণ্ডীব তুলতে না পারি তুলব না—কিন্তু 'বিকর্ণের' রোলটা তো উৎরে যেতে পারব?



pathagar.net

আমি বলতুম : অস্যার্থ ?

সভাস্থলে যখন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করার আয়োজন হচ্ছিল তখন ভীষ্ম দ্রোণ পর্যন্ত নীরব ছিলেন—প্রতিবাদ করতে যে উঠে দাঁড়িয়েছিল তার আর কোন ক্ষমতা ছিল না—সেই বিকর্ণের নাম মহাকাব্যে দ্বিতীয় বার পাইনি। তবু তাকে শ্রদ্ধা করি আমি। প্রতিবাদে সে সভাস্থল ত্যাগ করে গিয়েছিল। আর কিছু না পারে শুধু বলে যাব : দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয় গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।

আমি বলতুম : তা ঠিক! অন্তত সেটুকু মুখ ফুটে বলবার সৎসাহস যেন থাকে!

কখনও কখনও অতীত যুগে ফিরে যেতাম আমরা। সত্যপ্রিয়দা তার পূর্বপুরুষদের গল্প শোনাতো। সত্যসিন্ধু, সত্যশরণ, সত্যানন্দদের কাহিনী। কখনও বা আমিও বলতাম। আমার বাবাও ছিলেন এঞ্জিনিয়ার। আঠার শ' চুরানব্বই সালে এই বি. ই. কলেজ থেকেই পাস করেন। তাঁর গল্প শোনাতাম প্রিয়দাকে। বলতাম, জান প্রিয়দা, বাবার কাছে গল্প শুনেছি ছাত্রজীবনে তিনি একবার এই বোটানিক্সে একজন সন্ন্যাসীর দেখা পেয়েছিলেন! সন্ন্যাসীর নামটা আজও মনে আছে আমার। ধ্রুবানন্দ অগ্নিহোত্রী। বাবার ডায়েরিতে পড়েছি তিনি বাবাকে বলেছিলেন—দিনান্তে অন্তত একবার নির্জনে গিয়ে নিজের মুখোমুখি দাঁড়াবে তাহলে নিজেকে চিনতে পারবে। প্রকৃতির কোন বিরাট মহৎ প্রকাশের সামনে যখন আমরা দাঁড়াই তখন আত্মার বিরাটত্ব উপলব্ধি করতে পারি। ধ্যানস্তিমিত পর্বতশ্রেণী, গহন অরণ্য, বিশাল সমুদ্র—এরা মানুষের মনের আগল সরিয়ে দেয়। সেই অর্গলমুক্ত মনে ভূমার স্পর্শ পাওয়া যায়। বাবা তখন সন্ন্যাসীকে প্রশ্ন করেছিলেন—সংসারী মানুষ আমরা, দিনান্তে অমন অরণ্য-পর্বত সমুদ্রের সাক্ষাৎ পাব কেমন করে? উত্তরে ধ্রুবানন্দ বলেছিলেন : উপর দেখতে রহো বেটা,

pathagar.net

ইসলিয়ে বহ তুমকো দে চুকা এক বিশাল নীলাকাশ ! ইন্ সে বড়া, ইন্ সে বিশাল ঔর ক্যা হ্যায় ?

প্রিয়দা তাকিয়ে থাকত সেই বিশাল মুক্ত নীল আকাশের দিকে। বোধকরি ভূমার স্পর্শ পাওয়ার চেষ্টা করত।

হাজার হাজার লাইট-ইয়ার দূর থেকে অসীমের ইশারা বয়ে আনছে সদ্য ফুটে-ওটা তারার দল। মাথার উপর ফুটে উঠেছে হংস-মণ্ডল — অনন্তকাল ধরে উড়ে চলেছে তারার হংস বলাকা, 'অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।' হংস-মণ্ডলের মাথায় শ্রাবণা—পাশে জ্বলজ্বল করছে স্বর্গীয় বীণায় অভিজিত। দক্ষিণ দিগ্বলয়ে বোটানিক্সের বিশাল বটবৃক্ষের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে বৃশ্চিকরাশিটা। তিনটে তারা চেনা যাচ্ছে মাত্র—অনুরাধা, মূলা আর জ্যৈষ্ঠা। বাকিগুলি ফুটে ওঠার আগেই ঘণ্টা বাজবে কোম্পানীর বাগানের পেটা ঘণ্টায়। গেট বন্ধ হয়ে যাবার সংকেত।

প্রিয়দা বলত : চল, এবার ওঠা যাক।

আমি বলতুম : আর একটু বস। চিত্রা অস্ত যাক্।

প্রিয়দা হাসত, বলত ; ঠিক আছে বন্ধু-পত্নীর খাতিরে আরও আধঘণ্টা বসছি না হয়।···কী ছেলেমানুষ ছিলাম আমরা তখন। আজ ভাবলেও হাসি পায়। আমাদের দু'জনের তখন ছিল তারা চেনার বাতিক। আমরা দু'জনেই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম বিবাহ করব না কেউ। স্ত্রী মানেই শাড়ি-গাড়ি-গহনা। এবং তার মানে জাল জুয়াচুরি ঘুষ। আমাদের ও পথ নয়। আমাদের সাত্ত্বিক ঠিকাদারী নাটকের নেপথ্যেও থাকবে না কোন স্ত্রী-চরিত্র। এখন স্বীকার করতে লজ্জা হয়, কিন্তু সত্যদার গল্পের খাতিরেই শুধু নয়, সত্যর খাতিরেও স্বীকার করছি সে ছেলেমানুষী। আমরা দুটি বন্ধু মনে মনে ভালবেসেছিলাম দুটি নক্ষত্রকে। রোজ রাতে ওরাই হবে আমাদের সঙ্গী। কর্মক্লান্ত দিবসান্তে ওরাই হবে আমাদের নর্ম-সহচর। প্লেটনিক লাভের ধ্বজাধারী আমাদের কাছে সে রোমান্টিক

Pathagar.net

যুগে এটা মোটেই অস্বাভাবিক অদ্ভুত মনে হয় নি। প্রিয়দার প্রিয়া ছিল ব্যুটিশ নক্ষত্র-মণ্ডলের একনম্বর ম্যাগ্‌নিচুডের তারকা—আর্কটরাস যার বাঙলা মিষ্টি নাম হচ্ছে—স্বাতী। আমি মনে মনে মন দিয়েছিলাম কন্যারাশির উজ্জ্বলতম নক্ষত্র স্পাইকাকে ;—চিত্রাকে।

রাত বাড়তো। বাগানের দারোয়ান আমাদের চিনতো। মাঝে মাঝে সিকিটা আধুলিটা বকশিশও পেত। তাই নির্গমনের পথে কোন বাধা ছিল না। আমরা হাত ধরাধরি করে ফিরে আসতাম আবার আমাদের সেই "টেন ডাইনিং স্ট্রীটে"।

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান খোলার সংকল্পটা পাস করার পরেও আমরা ভুলি নি। সদ্য-পাস করা দুটি বন্ধু মিলে রীতিমতো ছুটোছুটি করেছিলাম কিছুদিন। মনে আছে, দু'জন গিয়ে হানা দিয়েছিলাম ঝানু হালদারের বাড়ি। 'ঝানু' তাঁর নাম নয়—সতীর্থরা এ নামকরণ করেছিল। আমাদের আমলে যেমন ছিল কালোজাম, বাঙ্গালদা, গেটদা। বি. ই. কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র। এখন পোড়-খাওয়া ঠিকাদার। টেলিফোনে যোগাযোগ করে একদিন দু'জনে গিয়ে হানা দিলাম দক্ষিণ কলকাতায় দাদার প্রাসাদোপম ভবনে। দাদা ছিলেন না—আমরা বৌদির খোঁজ করলাম। তিনি আপ্যায়ন করে বসালেন—চা মিষ্টি খাওয়ালেন। আজকাল যুগের হাওয়া পালটেছে। সে আমলে শিবপুর কলেজে প্রাক্তন ছাত্রদের 'দাদা' ডাকার রেওয়াজ ছিল—তাঁরা প্রথম পরিচয়ে তুমি বলতেন। চিনি না চিনি দাদাদের অন্দর মহলে সরাসরি প্রবেশের অলিখিত আইন ছিল। একটু পরেই অবশ্য দাদা এসে পড়লেন। আমরা দু'জনে ঠিকাদারী ফার্ম খুলতে চাই, এবং সেজন্য তাঁর পরামর্শ নিতে এসে তাঁকে না পেয়ে বৌদির দেওয়া মিষ্টান্ন ধ্বংস করছি শুনে খুশী হলেন। টাইটা খুলতে খুলতে গম্ভীরভাবে বললেন : প্রথমেই দেখতে হবে ভাঁড়ে কতটা ভবানী আছে। দ্বিতীয়ত বিবেচনা করতে হবে ইন্‌-ল'র ইনফ্লুয়েন্স-

লাইন কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তৃতীয়ত জানতে হবে কতদূর আউট-ল হবার মতো তাগদ আছে তোমাদের।

দুই বন্ধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বসেছিলাম বোকার মতো। ওঁর বক্তব্যের মধ্যে একমাত্র "ইনফ্লুয়েন্স-লাইন" শব্দটা চেনা চেনা লাগল। স্ট্রেস্-স্ট্রেনেই অঙ্ককষতে হলে ইনফ্লুয়েন্স-লাইন ডায়াগ্রামটা কাজে লাগে। সে কথা বলতেই হোহো করে হেসে উঠলেন দাদা। চুরুটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন: ওসব অঙ্ক-টঙ্ক স্রেফ্ শিকেয় তুলে রাখ ব্রাদার। এখন নতুন নতুন ফর্মূলা মুখস্থ করতে হবে।

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম: দু'একটা উদাহরণ যদি দিতেন।

যেমন ধর, "সি ইস্যুক্যালটু কে-জি।" সি স্ট্যাণ্ডস্ ফর সিমেণ্ট, জি ফর গঙ্গামাটি। কে ইস্ এ কন্সট্যাণ্ট, ডিপেণ্ডিং অন দি ভিজিলেন্স অফ দি সুপারভাইসারি স্টাফ!

পাশে ফিরে দেখি প্রিয়দার চোয়ালের নিচের দিকটা ঝুলে পড়েছে। দাদার সেদিকে দৃষ্টি নেই। লেকচার দেবার ভঙ্গিতে বলে চলেছেন: ঠিকদারী করতে হলে চারটি কাজ করতে হবে। একনম্বর—কলেজের লেকচার নোটগুলি পুড়িয়ে ফেলতে হবে। দু'নম্বর, ক্যাপিটাল যোগাড় করা। আর তিন নম্বর কাজ—হ্যাঁ লিখে নাও, এই তিন নম্বরটাই হচ্ছে ইম্পর্টেণ্ট কেশ্চেন। এটির ব্যবস্থা হলে এক আর দু'নম্বর প্রবলেম আপ্সে সলভ্ড্ হয়ে যাবে।

দাদা থামলেন। চুরুটটা নিবে গিয়েছিল—সেটা জ্বালাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

দুরুদুরু বুকে বললুম: সেই তিন নম্বরটা কি?

দাঁতে জ্বলন্ত সিগারটা চেপে দাদা বললেন: লালদীঘির উতোর পাড়ে লালরঙের একটা বড় বাড়ি আছে দেখেছ! ওখানকার কোন এয়ার কাণ্ডিসান্ ঘরে অফিস করেন এমন একটি ভদ্রলোকের



pathagar.net

কন্যার সন্ধান কর। ইন সর্ট—দু'জনে দুটি শাঁসালো শ্বশুর যোগাড় কর। তাহলেই দেখবে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। ক্যাপিটালের জন্য আর ভাবতে হচ্ছে না, কনট্রাক্টের জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে না। মায় তোমাদের উন্নতির পথে প্রধান যে বাধা—ঐ কলেজের লেকচার নোটগুলি, ওরও গতি করে ফেলবেন তোমাদের খোকার মা, রাতবিরেতে দুধ জ্বাল দিতে।

নমস্কার করে উঠে চলে আসব মনে করছি, প্রিয়দা বললে : আর চার নম্বর আইটেম ?

বোধকরি এ অধ্যায়ের শেষ না দেখে সে যাবে না।

দাদা বললেন : ডান-বাঁ দোহাত্তা চুরি করেও কাম-অ্যাণ্ড-কুল থাকবার মতো মর‍্যাল-কারেজ থাকা চাই।

মর‍্যাল-কারেজ! আর কোন কথা আমি বলিনি। প্রিয়দা অবশ্য বলেছিল। সব শুনে প্রিয়দা বলেছিল : এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাব!

বুঝলাম ঠিকাদারী হবার নয়। স্বাতী আর চিত্রা থাকতে শাঁসালো শ্বশুরের প্রশ্নই ওঠে না। আর তা ছাড়া অতটা মর‍্যাল কারেজ আমাদের দু'জনের কারও নেই। ভো-মারা ঘুড়ির মতো ভেসে ভেসে বেড়ালাম কিছুদিন। তারপর ঝট করে হয়ে গেল আমার চাকরি, সরকারী পূর্তবিভাগে। প্রিয়দা ঢুকেছিল বুঝি কোন ভুঁইফোঁড় নতুন প্রাইভেট ফার্মে। কি একটা সদ্য গড়ে ওটা পেপার মিলে।

দেখা হয়েছিল ঠিক একবছর পরে। উনিশ শ' আটচল্লিশের জানুয়ারী মাসে। বি. ই. কলেজের রি-ইউনিয়নে। মন খুলে গল্প করা হয় নি সেদিন। প্রিয়দাকে বললুম :

পেপার মিলের চাকরি কেমন লাগছে ?

পেপার মিল ? কোথায়-পেপার মিল। এখন আমি ডি. ভি. সি-তে।

pathagar.net

তার মানে? সেই পেপার মিলের চাকরি খুইয়েছ?

তা খুইয়েছি। সেই গল্পই তো বলতে বসেছিলাম। কিন্তু আর এখন হবে না দেখছি!

কদিন আছ কলকাতায়?

কালকের দিনটাও আছি। পরশু ফিরে যাব মাইথনে।

কাল কোথাও দেখা হয় না? সন্ধ্যায়? ধর কফি হাউসে—

না, ওখানে বড় ভিড়, বরং আউটরাম ঘাটে গঙ্গার ধারে সাড়ে পাঁচটায়। কেমন!

আমি হেসে বলি: ভিড়কে তুমি ভয় পাও—না প্রিয়দা?

প্রিয়দাও হেসে বলে: সে জন্য নয়। দিনান্তে একবার নির্জনে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। মনে নেই ধ্রুবানন্দের উপদেশ?

কিন্তু তাহলে আবার আমাকে ডাকছ কেন? দু'জনে কি নির্জন হয়?

প্রিয়দা বললে: হয়! আমি তো ধ্রুবানন্দের মতো অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী নই। আমি নবদ্বীপের বোষ্টম—দুয়ে মিলে এক। দ্বৈতবাদী। আসিস, কেমন?

পরদিন সন্ধ্যায় আউটরাম ঘাটে গঙ্গার ধারে বসে শুনেছিলাম প্রিয়দার চাকরি জীবনের প্রথম অধ্যায়। ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। ওর মতো ভালো ছেলের পক্ষে এমন দুঃসাহসিক প্রেমের গল্প কেমন যেন বেমানান। সত্যপ্রিয় আচার্য ভিন্ন অন্য কারও কাছে এ কাহিনী শুনলে নিছক আষাঢ়ে গল্প বলে উড়িয়ে দিতাম। প্রথম যৌবনের সে রোমান্টিক যুগে তিলকে তাল করা ছিল সাধারণ রীতি। একটু কথা, একটু ছোঁয়া, একটু 'ওঃ-সরি'-র উপাদানে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে আমরা কল্পনায় গড়ে তুলতাম স্কাইক্রেপার। কিন্তু প্রিয়দা হচ্ছে প্রিয়দা। বানিয়ে সে গল্প বলবে না। আউটরাম ঘাটে

Pathagar.net

গঙ্গার ধারে বসে সে গল্প শুনতে শুনতে আজ অস্বীকার করব না, কেমন যেন ঈর্ষা জেগেছিল মনে। কি থোড়-বড়ি-খাড়ার চাকরি করছি আমি! পি. এল. ক্যাম্পে শালের খুঁটি, আর টিনের গেজ মেপে সময় নষ্ট করছি—আর ওদিকে প্রিয়দা মধ্যপ্রদেশের কোন পাথর দিয়ে গাঁথা ক্ষুধিতপাষাণের বন্দিনী নারীর উদ্ধার করছে! সে আশ্রয় পেয়েছে অতীতের ভারতবর্ষে। রাজা-মন্ত্রী-রাজপুত্র আর পাষাণপুরীর পাথরের মেজেতে-এলায়িত-কুন্তলা বন্দিনী রাজকন্যা! প্রিয়দার মুখে যে রোমান্টিক কাহিনী শুনেছিলাম আজ থেকে সতের বৎসর আগে। তবু তা স্পষ্ট মনে আছে আজও। যতদূর সম্ভব তার ভাষাতেই বলি :

তুই তো জানিস একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি নিয়েছিলাম আমি। কোম্পানীটা আনকোরা নতুন। স্টেটস্‌ম্যানের ওয়াণ্টেড কলামটা পড়াই ছিল পাস করার পরে একমাত্র কাজ। সেখানেই সন্ধান পেলাম এ চাকরির। খবরের কাগজের কাটিংটা পকেটে নিয়ে গিয়েছিলাম ওদের অফিসে। ডালহৌসি স্কোয়ারের বিশাল এবং বিখ্যাত একটি বাড়ির গোটা তিনতলাটা ভাড়া নিয়ে অফিস খোলা হয়েছে। চেয়ার-টেবিল, র‍্যাক-পার্টিসান তখনও সাজানো হচ্ছে। ইলেকট্রিক মিস্ত্রির দল কাজ করছে, স্টিলের ফার্নিচার নিয়ে টানাটানি করছে জনাকয়েক কুলিশ্রেণীর লোক। এছাড়া অতবড় অফিসটা প্রায় ফাঁকা—যেন ছুটির দিন। নেম প্লেট দেখতে ভুল হয়নি, তবু নির্জন অফিসের চেহারাটা দেখে কেমন যেন ঘাবড়ে গেলাম। তক্‌মা-আঁটা একটা চাপরাশির কোমরবন্ধে দেখি লেখা আছে কোম্পানীর নাম। তারই শরণাপন্ন হওয়া গেল। লোকটা আমাকে এখান দিয়ে সেখান দিয়ে নিয়ে গিয়ে হাজির করল কাঁচের একটা ঘেরা-টোপ ঘরের সামনে। বুঝলাম ভিতরটা এয়ার-কণ্ডিসান করা। ভিতরে ছোট ছোট খুপরি। অধিকাংশই ফাঁকা। একটিতে অবশ্য একজন অফিসার বসেছিলেন, পাঞ্জাবী

Pathagar.net

ভদ্রলোক। শিখ। কাঁচের দরজায় একটা নামফলক—লেখা এইচ. ভি. সিং। নামের পিছনে একসারি ইংরেজী অক্ষর। মাঝে দুটো ব্রাকেট বন্ধনীতে লেখা ইউ. এস. এ. এবং বার্লিন। বুঝলাম পণ্ডিত ব্যক্তি।

বাইরের একটা চেয়ারে আমাকে বসতে বলে বেহারাটা আমার কার্ড চাইলে। কার্ড নেই শুনে একটা শ্লিপ কাগজ এনে দিল। তাতে আমার নাম ও প্রয়োজনের কথা লিখে দিলাম। লোকটি ঘরের ভিতর গিয়ে সেলাম করে চিরকুটখানা দাখিল করল। একটু পরে ডাক পড়ল আমার। গেলাম।

দেখলাম সিংজী অমায়িক লোক। অনেকক্ষণ আলাপ করলেন আমার সঙ্গে। আমার পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর জেনে নিলেন উপর্যুপরি প্রশ্ন করে। মনে হল ভদ্রলোক অতিমাত্রায় কৌতূহলী—হয়তো বাঙলাদেশের সম্বন্ধে বেশী করে জানতে চান। না হলে এত খুঁটিনাটি প্রশ্ন করার অর্থ কি? উনি একজন সিবিল-এঞ্জিনিয়ারই খুঁজছেন, জামাই নয়। তাহলে এত পারিবারিক পরিচয়ের কি প্রয়োজন? শেষ পর্যন্ত বললেন, উনি হচ্ছেন জিওলজিস্ট—কোম্পানীর অন্যতম অংশীদার। কোন অফিসারকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া তাঁর এক্তিয়ারের বাইরে। যেটা করবেন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর স্বয়ং। আমাকে অপেক্ষা করতে বললেন সিংজী। একটু পরেই নাকি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সাহেব এসে যাবেন। তিনি লাঞ্চে গেছেন।

ভাবছিলাম, তাই যদি হবে তাহলে এত নাড়ী-নক্ষত্রের সন্ধান নেবার মানেটা কি? বোধহয় সেকথা বুঝতে পারলেন উনি। প্রকারান্তরে যা বললেন তার নির্গলিতার্থ হচ্ছে—তিনি ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের দক্ষিণ হস্ত—এবং তাঁর দাক্ষিণ্য ছাড়া এ রাজ্যে প্রবেশ সম্ভবপর নয়। ভরসা দিয়ে বললেন, তিনি আমার হয়ে সুপারিশ করবেন।

pathagar.net

বললাম : আপনাদের পেপার ফ্যাকটরি কোথায় ?

রসিক ভদ্রলোক। হেসে বললেন : আপাতত আমাদের কল্পলোকে।

শুনলাম সবকথা। কারখানা এখনও তৈরি হয় নি। মধ্যভারতে যেখানে কারখানাটা গড়ে উঠবে সেই জমি সম্প্রতি নির্বাচিত হয়েছে। জমি বস্তুত এখনও কোম্পানীর হয়নি। তবে শীঘ্রই হবে। শেয়ার ফ্লোট করা হয়েছে। হুহু করে বিক্রিও হয়েছে। এবার বানাতে হবে কারখানা। যন্ত্রপাতির অর্ডার গেছে আমেরিকায়। এসে পড়ল বলে। এখন চাই উৎসাহী এঞ্জিনিয়ার, যারা উদয়-অস্ত পরিশ্রম করে বাস্তবায়িত করবে ওঁদের স্বপ্ন।

আমি বললুম : কিন্তু যতদূর জানি, কাগজ তৈরি হয় উদ্ভিদ থেকে—খনিজ পদার্থ থেকে নয়। আপনি জিওলজিস্ট হয়ে—

হঠাৎ কোথাও কিছু নেই ধমকে উঠলেন উনি : দ্যাটস নান অব য়োর বিসনেস।

চমকে উঠলাম। এমন কিছু অশোভন প্রশ্ন করিনি। জবাবে আমি বলতে পারতাম—আমি বিবাহিত কিনা, আমার সাংসারে কে কে আছেএসব প্রশ্নগুলি করার সময়ও কি ও কথা মনে ছিল আপনার? কিন্তু তা বলিনি। আমি প্রার্থী। চাকরির সন্ধানে এসেছি। তাই ধমকটা সহ্য করে গিয়ে বলি : কিন্তু শেষ পর্যন্ত তো সিভিল এঞ্জিনিয়ারের কোন প্রয়োজন থাকবে না আপনাদের। কারখানা তৈরি শেষ হলে তো আমারও প্রয়োজন ফুরোবে।

সিংজীও সামলে নিয়েছেন ইতিমধ্যে। আমার প্রশ্নের উত্তরে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন উনি। ওঁদের পরিকল্পনার কথা বিস্তারিত বোঝালেন। অন্তত বিশ-ত্রিশ বছর লাগবে তাকে রূপায়িত করতে। তারপর সেগুলি মেইন্‌টেন করবে কে? স্টাফ কলোনী, ওয়াটার-ওয়ার্কস্ এসব দেখা শোনা করবে কে? কালে হয়তো আমিও হয়ে পড়ব একজন ডাইরেক্টর ইত্যাদি ইত্যাদি।



pathagar.net

একটু পরেই এসে পড়লেন বড়কর্তা। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। শ্যামসুন্দর আগরওয়ালা। মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। সুটেট-বুটেড নন কিন্তু। গায়ে গলাবন্ধ লংকোট, পরিধানে ফিন্‌ফিনে সুপার ফাইন কোঁচানো ধুতি, পায়ে চক্‌চকে নিউকাট, হাতে রূপার একটা ডিবে—তাতে মসলাদার পান। শ্যামসুন্দরজী আর এককাঠি উপর দিয়ে যান। প্রথমেই প্রশ্ন করলেন—সমুদ্রপার হওয়ার বিরুদ্ধে আমার কোন সংস্কার আছে কিনা।

একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলি : হঠাৎ এ কথা কেন ?

কোম্পানীর কাজে এঞ্জিনিয়ারকে হয়তো ভারতবর্ষের বাইরেও যেতে হতে পারে, তাই জিজ্ঞাসা করছি। আমাদের যেসব যন্ত্রপাতি আসছে আমেরিকা থেকে হয়তো তা আপনাকে দেখে আসতে হবে।

আমি সংক্ষেপে কিন্তু সবিনয়ে নিবেদন করলাম : আমি মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ার নই—সিভিল এঞ্জিনিয়ার।

উনি আরও সংক্ষেপে বললেন : আই নো !

অগত্যা বলতে হল : কোম্পানী খরচ দিলে আমেরিকা যেতে আমার আর আপত্তি কি ?

খুশী হলেন শ্যামসুন্দরজী। যেন এটাই ছিল একমাত্র বাধা।

বললেন : কোম্পানীর কাজে আপনাকে মাঝে মাঝে হয়তো কলকাতার বাইরে গিয়ে থাকতে হবে। আউটস্টেশন অ্যালাউয়েন্স অবশ্য আমরা দেব।

ঠিক আছে। তাতে আর আপত্তি কি ?

তাহলে একটা দরখাস্ত লিখে দিন। আর হ্যাঁ আপনার অরিজিনাল ডিগ্রিখানা নিয়ে আসবেন কাল।

সঙ্গেই আছে আমার।—বার করে দেখালাম সেখানা।

শ্যামসুন্দরজী সেটা পরীক্ষা করে দেখে ফেরত দিলেন। ওঁর স্টেনো ভদ্রমহিলাকে ডাকলেন, বললেন। শুভস্য শীঘ্রম। আজ বেলা তিনটে দশ পর্যন্ত মাহেন্দ্রক্ষণ আছে। পণ্ডিতজী বলেছেন।

pathagar.net

আপনি দরখাস্তটা ডিক্‌টেসন দিয়ে দিন। এখুনি অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটার নিয়ে যান।

রীতিমতো ছোটাছুটি। স্টেনো হৈহৈ করে ছেপে আনল দরখাস্তটা, আমি সই করে দিলাম। তাতে আরও দু'তিনটি সই করাতে হল। শেষ পর্যন্ত শ্যামসুন্দরজী তাতে লিখে দিলেন - অ্যাপয়েণ্ট হিম। তার-পর অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটারখানা ছেপে এল : তাতে সই দিলেন আবার শ্যামসুন্দরজী। শেষবেশ যখন সেখানা আমার হাতে দেওয়া হল তখনও মাহেন্দ্রক্ষণ পার হয়ে যায়নি।

পরদিন থেকে শুরু হল চাকরি জীবন। কেতাদুরস্ত ব্যাপার। প্রথম দিন অফিসে যেতেই বেহারা এসে বলল : সেক্রেটারী সাব সেলাম দিয়েছেন।

গেলাম তার ঘরে। এটিও তাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষ। আমাকে দেখিয়েই ঘড়ি দেখলেন তিনি। বললেন : আপনি বুঝি খুব দূর থেকে আসেন? আমাদের এখানে অ্যাটেণ্ডেস্ সওয়া দশটায়।

হাতঘড়ি দেখার প্রয়োজন ছিল না। পিছনের দেওয়ালে ঘড়িটা দশটা বেজে কুড়ি হয়েছে।

বললুম : না, বহুবাজারে থাকি আমি।

আই সি। যা হোক, আসুন আপনি আমার সঙ্গে।

তাঁর পিছন-পিছন প্রায়-নির্জন অফিস-হলের অপর প্রান্তে এসে পৌঁছলাম। জানালার ধারে একটা লোহার টেবিল। গদি-আঁটা একটা চেয়ার। টেবিল, কলমদানি, কাগজচাপা, স্লিপ-পেপার, ডেস্ক-ক্যালেণ্ডার। অল্প দূরে বসেছিলেন দু'জন ভদ্রলোক। আমাদের আসতে দেখে উঠে দাঁড়ালেন।

সেক্রেটারী সাহেব বললেন : রামালু, ইনি তোমাদের নতুন এঞ্জিনিয়ার সাহেব—মিস্টার আচারিয়া। তোমাদের ডিপার্টমেণ্টের সব স্টাফের সঙ্গে এঁর পরিচয় করিয়ে দাও।—বলেই কায়দামাফিক 'বাও' করলেন আমাকে। অর্থাৎ বিদায় চাইলেন আর কি। এমন ফরাসী



pathagar.net

কায়দায় বাও করা শুধু সিনেমায় দেখা ছিল। আমি কি করব স্থির করে ওঠার আগেই দেখি উনি ফিরে চলেছেন নিজ আসনের দিকে—জনশূন্য হল-কামরায় জুতো মস্‌মসিয়ে।

ভাগ্য ভাল। রামালু ছেলেটি এতটা কেতাদুরস্ত নয়। বললে: নমস্কার স্যার। আমার নাম নটরাজা, নিজলিঙ্গাপ্পা রামালু। আপনার ওভার সিয়ার। ইনি হচ্ছে মিস্টার সি. এল. গুরুবক্সানী, এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের একমাত্র ক্লার্ক। এ ছাড়া আছে বংশী, আমাদের পিয়ন। এই হচ্ছে আমাদের এঞ্জিনিয়ারিং সেকসনের গোটা স্টাফ।

গুরুবক্সানী আর বংশী আমাকে হাত তুলে নমস্কার করল। গদি আঁটা চেয়ারে বসে, কব্জির বোতাম খুলে আস্তিন গুটাতে গুটাতে গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলুম: তা, কি কি কাজ এখন হচ্ছে?

রামালু আর গুরুবক্সানী মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। ওদের সে চাহনি দেখে সামলে নিয়ে বলি: অবশ্য কাজ তো শুরুই হয়নি এখনও। গুরুবক্সানীকে প্রশ্ন করলাম: কি কি ফাইল আছে?

মুখ শুকিয়ে ওঠে গুরুবক্সানীর।

বুঝলাম ফাইল খোলাই হয়নি এখনও কিছু।

আপনারা কে কতদিন কাজ করছেন এখানে?

এ প্রশ্নটির জবাব দিতে অসুবিধা হল না ওদের। রামালু আছে একমাস, গুরুবক্সানীর এটা তৃতীয় মাস। অফিসারোচিত গাম্ভীর্য মুখে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে বললুম: যাক এতদিন যা হয়েছে তা হয়েছে, কিন্তু এখন থেকে মন দিয়ে কাজ করতে হবে সকলকে। মাস মাইনে নেব, আর কাজ করব না—এ-আমি সহ্য করব না।

দু'জনাই ঘাড় নেড়ে সায় দিল: ঠিক কথা।

তখনও বুঝিনি ওদের আসল সমস্যা কোথায়। কাজে ফাঁকি ওরা মোটেই দিতে চায় না—কিন্তু না দিয়ে ওদের উপায় ছিল না।

গুরুবক্সানীকে বললুম: রেজিস্টার অফ্ ফাইলস্‌টা নিয়ে আসুন।



pathagar.net

গুরুবক্সানীর প্রায় কেঁদে ফেলার যোগাড়। তাও খোলা হয়নি।

যাক্, আজকের ডাক ফাইলটা নিয়ে আসুন—আর খানকয়েক সাদা ফাইল নোট সীট, ট্যাগ নিয়ে আসুন। আমিই সটিং করে দেখিয়ে দিচ্ছি।

এতক্ষণ হাসি ফুটল গুরুবক্সানীর মুখে। ঝট করে চলে গেল নিজের টেবিলে। ফিরে এল মুহূর্তে—হাতে একটা ফাইল, তার উপর অতি সযত্নে ওল্ড-ইংলিশ হরফে লেখা 'ডাক'। পিছন পিছন এল বংশী। নামিয়ে রাখলে টেবিলের উপর একগাদা ফাইল।

অত্যন্ত কায়দামাফিক গুরুবক্সানী ডাক-ফাইলটা নামিয়ে রাখে আমার টেবিলে। যেন ফরেন অ্যাম্বেসাডার তাঁর ক্রিডেন্সিয়াল দাখিল করছেন। গম্ভীর মুখে ডাক কাভারটা খুলে ফেললাম আমি। কোম্পানী কোন একজন এস. পি. আচারিয়া, বি, ই-কে এঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করেছেন—কপি ফরোয়ার্ডেড টু এঞ্জিনিয়ারিং সেকশন। ব্যাস্, আর কোন চিঠি নেই।

গাম্ভীর্য বজায় রাখা কঠিন, তবু গম্ভীর মুখেই বলতে হল: এ চিঠির দুটো কপি করুন। একটা রাখবেন স্টাফ-ফাইলে আর একটা থাকবে এঞ্জিনিয়ারের পার্সোনাল ফাইলে।

গুরুবক্সানী খুব মন দিয়ে শুনল আমার নির্দেশ। তারপর বললেন: আর অরিজিনালটা স্যার?

ওটা থাকবে গার্ড-ফাইলে। অল অরিজিনাল কপিস্ অব অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার্স স্যুড বি কেয়ারফুলি ডকেটেড ইন এ গার্ড ফাইল।

ইয়েস স্যার! আই ফলো।

বংশী বললে: আর এগুলো?—শূন্য গর্ভ সাদা ফাইলের স্তূপটা দেখালো সে। বললুম: ওগুলো আপাতত নিয়ে যাও।

মনের মতো কাজ পেয়েছে গুরুবক্সানী। সমস্ত দিন ধরে খটাখট খটাখট করে সেই একটি মাত্র চিঠির কপি করল—আর

pathagar.net

সাজিয়ে সাজিয়ে রাখল ফাইলে। কিন্তু আমি কি করি? সমস্ত দিনে একটা ফাইলও এল না এ পাড়ায়। এল না কোন ভিজিটার—এল না বড়কর্তাদের কোন নির্দেশ, কোনও আদেশ বা আহ্বান। পাছে বংশী ঘুমিয়ে পড়ে, আর নজরে পড়ে যায় সেক্রেটারী সাহেবের তাই তাকে দিয়ে বার দুই তিন চা আনালাম। সিগারেট আনালাম। কায়দা করে সিগারেটের সঙ্গে দেশলাই না এনে আর একবার তাকে পাঠালাম 'ম্যাচিস্' কিনে আনতে। কিন্তু বংশীর ঘুম ছুটানো ছাড়া নিজের ঘুম ছুটোই কেমন করে? উশখুশ করলাম, গা চুলকালাম, বার চারেক বাথরুমে গেলাম। সময় কাটে না। হল-কামরার ও-প্রান্তে বসে আছে সেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটি—বড়কর্তার স্টেনো। সারাদিনই টাইপ করল সে। মাঝে মাঝে উঠে গেল সাহেবদের ঘরে সই করাতে। মাঝখানে এসট্যাবলিমেণ্ট সেকশান, ওপাশে ডেসপ্যাচ। ডানদিকে ক্যাশ এবং অ্যাকাউণ্টস। সর্বত্রই কাজ হচ্ছে। শুধু আমরাই বসে আছি নির্বিকার পরমব্রহ্মের মতো। মাঝে মাঝে স্টেনো ভদ্রমহিলা এদিকে তাকায়—আর আমি ঘেমে উঠি। শেষ পর্যন্ত খানতিনেক স্লিপ কাগজ টেনে নিয়ে আঁকি-বুকি টানতে শুরু করলুম। যাতে দূর থেকে মনে হয় কাজ করছি। লাঞ্চ-আওয়ার্সে খুব ঘটা করে খেতে গেলাম। নিচের মাদ্রাজী হোটেলে মসলা দোশা খেয়ে ফিরে এলাম দুটো বাজার আগেই—যাতে সেক্রেটারী সাহেব জানাবার সুযোগ না পায় এ অফিসে লাঞ্চ আওয়ার্স শেষ হয় একটা বেজে ষাট-মিনিটে।

আবার উশখুশ করলাম, গা চুলকালাম, বাথরুমে গেলাম, চা খেলাম এবং শেষ পর্যন্ত চারটে উনষাট পার করে উঠে পড়লাম।

পরদিনও ঐ একই অভিজ্ঞতা। তার পরের দিনও তাই।

চতুর্থ দিন মনে হল পাগল হয়ে যাব এভাবে। চুপচাপ বসে থাকা যায় কতক্ষণ? গল্পের বই পড়া যায় না, ঘুমানো যায় না। রামালু প্রকারান্তরে শুনিয়ে দিয়েছিল অফিসে খবরের কাগজ নিয়ে

pathagar.net

আসার জন্য সে নাকি একবার ধমক খেয়েছে আমি আসার আগে। বলা বাহুল্য সেক্রেটারী সাহেবের কাছে। চারদিনের দিন মরিয়া হয়ে গিয়ে হানা দিলাম সেক্রেটারী সাহেবের ঘরে।

ঘরে আরও একজন ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর সামনে কথা বলা উচিত হবে না মনে করে অপেক্ষা করছিলাম আমি। মনে হল ভদ্রলোক শেয়ারের কারবারী—ফেস ভ্যালু, ডিভিডেণ্ট, প্রেফারেন্স শেয়ার, ব্যালেন্সসীট—কি সব আলোচনা হচ্ছিল। হঠাৎ আমার দিকে ফিরে সেক্রেটারী সাহেব আগন্তুককে বললেন: আমাদের কোম্পানীর এঞ্জিনিয়ার। এ বছরই শিবপুর থেকে বি. ই. পাস করেছেন। শীঘ্রই শিকাগো যাচ্ছেন, মেশিনারী ইন্সপেকট করতে। ও ভাল কথা মিস্টার আচারিয়া, আপনার খানতিনেক পাসপোর্ট সাইজ ফটো লাগবে। নেক্সট উইকেই করিয়ে আনবেন। কোম্পানীই অবশ্য খরচ দেবে।

আমি কেমন যেন ঘাবড়ে গেলাম। ব্যাপার কি! এরা কি সত্যিই আমাকে আমেরিকা পাঠাবে নাকি? কোন উত্তর দেবার আগেই অপরিচিত ভদ্রলোক আমার হাতখানা টেনে নিয়ে ঝাঁকানি দিলেন।

উইস্ য়ু এ হ্যাপি ফ্লাইট!

যেন তখনই যাত্রা করছি আমি।

কিছু বলবার আগেই সেক্রেটারী সাহেব কথা ঘুরিয়ে দিলেন: মিস্টার আচারিয়াকে কদিন টেবিল থেকে উঠতেই দেখি নি। খুব চাপ পড়েছে বুঝি কাজের?

বাইরের লোকের সামনে কি আর বলি। বললুম: না তেমন কিছু নয়। আমি এসেছিলাম অন্য একটা ব্যাপারে।

বলুন, বলুন।

আমার সেকশনে কিছু ড্রইং ইন্সট্রুমেণ্ট চাই। বোর্ড-টি, ট্রেসিং পেপার—

pathagar.net

অফকোর্স! অফকোর্স? আনুমানিক কত টাকার?
মেজাজ খাপ্পা হয়েই ছিল। বললুম: তা অন্তত শ' পাঁচেক টাকার।

উনি উত্তরে বললেন: মাত্র? বেশ লিস্ট তৈরি করে আনুন। থ্যাঙ্কু।

যাক্ একটা কাজ পাওয়া গেছে। শ্বেতাঙ্গিনী স্টেনো ভদ্রমহিলার ভ্রূকুটিকে অন্তত আজকের দিনটা আমি ভ্রূক্ষেপ করি না। আমাদের আজ কত কাজ! রামালুর সঙ্গে বসে বসে একটা লম্বা ফিরিস্তি বানানো গেল। দাখিল করার আধঘণ্টার মধ্যেই টাকা স্যাংসন হয়ে এল। এখন বাজারে ঘুরে কোটেশন আনতে হবে। গুরুবক্সানীর আজ মাথা তোলার সময় নেই। সারা বাজার ঘুরে এক গাদা কোটেশন এনেছে: তাতে নম্বর দাও—কম্পারেটিভ স্টেটমেণ্ট বানাও। অর্ডার করাও—কাজ কি কম! সন্ধ্যার মধ্যেই এসে গেল যন্ত্রপাতি।

পরদিন থেকে শুরু করে দিলাম কাজ। সে কাজ কেউ দেয়নি। সব মনগড়া কাজ। দু'কামরার, তিন কামরার বাড়ি, মিনিয়ালস্ ডর্মিটারী, অফিসার্স কোয়ার্টার্স—ক্লাস ওয়ান, ক্লাস টু, সেকেণ্ড গ্রেড! রামালুকে বললুম: ফ্যাকটারি হলে তখন তো স্টাফ কোয়ার্টার্স বানাতেই হবে—এস কিছু স্ট্যাণ্ডার্ড কোয়ার্টার্সের প্ল্যান-এস্টিমেট বানিয়ে রাখি। এখন হাতে সময় আছে, পরে কাজে লাগবে।

রামালু খুব খুশী। গুরুবক্সানীও। আমি নক্শা আঁকি বংশী ব্লু-প্রিণ্ট করে আনে ছাদে গিয়ে, রামালু এস্টিমেট বানায় আর গুরুবক্সানী সেগুলি টাইপ করে আলাদা আলাদা সাজিয়ে রাখে ফাইলে। নিশ্বাস ফেলার অবকাশ নেই কারও। প্রচণ্ড কাজের চাপ। এভাবেই কাটল একমাস। পরের মাসের পয়লা তারিখে চার পয়সার রেভিন্যুস্টাম্প রসিদে লাগিয়ে মাহিনার খামখানা নিয়ে এলাম ক্যাশ সেকশন থেকে।

pathagar.net

আশ্চর্য, আমার মনগড়া স্টাফ কোয়ার্টার্সের হুজুগে যদিও আমরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করতাম তবু সত্যিকারের কাজ একটিও এল না আমাদের সেকশনে। সারা মাসে একটিও চিঠি আসেনি, একটি নির্দেশ আসেনি, একবার মাত্র আহ্বান আসেনি বড়কর্তাদের ঘর থেকে। না ভুল বললাম, আমার নিয়োগপত্র ছাড়া আরও একখানা চিঠি এসেছিল সে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। কোম্পানীর এসট্যাবলিশমেণ্ট সেকশন জানিয়েছিলেন, এনজিনিয়ারিং সেকশনের অফিস পিয়ন শ্রীবংশীধর দাসকে এঞ্জিনিয়ার আচারিয়া সাহেবের আর্দালী পিয়নের কাজও করতে হবে। মাহিনা বৃদ্ধি হল না—ইন অ্যাডিসন টু হিজ ডিউটিস্। সেদিন আমি গুরুবক্সানী, অনেকক্ষণ সে চিঠিখানা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। চিঠিখানা কোন ফাইলে রাখা উচিত।

ধীরে ধীরে অফিসে নূতন লোক আসছে। লক্ষ্য করে দেখছি অন্যান্য সব সেকশনেই কমবেশী কাজ—একমাত্র আমরাই ব্যতিক্রম। তাই আমার ব্যবস্থাপনায় খুশী হয়েছিল রামালু আর গুরুবক্সানী। মায় আমাদের পিয়ন-কাম-আর্দালী-কাম-ব্লু-পিণ্টার শ্রীমান বংশীধর দাস। অন্তত চক্ষুলজ্জাটা তো কাটল। শ্বেতাঙ্গিনী মহিলার নীলচক্ষু দুটো তো আর লজ্জা দেবে না। ধূর্ত সেক্রেটারী সাহেবও খুশী হল দেখলাম। সেও লক্ষ্য করেছিল নিষ্কর্মা এঞ্জিনিয়ারিং সেকশান কর্মমুখর হয়ে পড়েছে হঠাৎ। রামালুকে ডেকে সে খোঁজখবর নিয়ে জেনেছে ব্যাপারটা কি। খুব খুশী হয়েছে সেও।

দ্বিতীয় মাসে একদিন বেলা পাঁচটায় সেক্রেটারী সাহেব একটি স্লিপ পাঠালেন—অফিসের পর অপেক্ষা করতে হবে। পুনশ্চ দিয়ে আবার লিখেছেন, আগামীকাল ওভারটাইম বিলটা তাঁর টেবিলে পাঠিয়ে দিতে।

রামালুকে ডেকে বললুম : কি ব্যাপার!

ছেলেটি ভাল। কেরালার মানুষ। অনেক কষ্টে লেখাপড়া শিখেছে। ওদের দেশে চাকরির বাজার খুব মন্দা। চলে এসেছিল

pathagar.net

কলকাতায় ভাগ্যান্বেষণে। যুদ্ধে যাবার জন্য নাম লিখিয়েছিল—যুদ্ধ থেমে যাওয়ায় তাও হয় নি। কিছুদিন নাকি কোন কেরালা কাফেতে কেবিন বয়ের কাজও করেছে ওভারসিয়ারি পাস নটরাজা রামালু। শেষ পর্যন্ত এই চাকরিটি হওয়ায় হাতে স্বর্গ পেয়েছে। তার একমাত্র আতঙ্ক ছিল একজোড়া নীল চোখ। বড়সাহেবের ঐ মেন-স্টেনো। কখন গিয়ে যে লাগাবে বড়কর্তার কাছে যে, এঞ্জিনিয়ারিং সেকশনে কাজ নেই—আর অমনি সার্প্লাস হয়ে যাবে রামালু। আমি তাকে রক্ষা করেছি। এখন আর কেউ বলবে না আমাদের কাজ নেই।

বললে: ঠিক জানি না স্যার। তবে আজ ডিরেকটার্স বোর্ডের মিটিং ছিল। এইমাত্র মিটিং সেরে ওঁরা বেরিয়ে গেলেন।

অপেক্ষা করতে হল। গুরুবক্সানীকে ছেড়ে দিলাম, বংশীকেও। রামালু গেল না। শূন্য হল-কামরার এ প্রান্তে বসে আছি আমরা দু'জন আর ও-প্রান্তে শ্যামসুন্দরজীর স্টেনো। আর আছে দারোয়ানটা। ছটা বাজল, সাতটা বাজল, আটটা বাজল—কাকস্য পরিবেদনা। রামালু বললে: কিছু খাবেন? সেই তো কখন লাঞ্চ করেছেন।

বললুম: খিদে তো পেয়েছে—কিন্তু খেতে যাওয়া কি উচিত হবে? ওঁরা যদি এসে পড়েন?

না, বাইরে যাওয়া ঠিক হবে না। তবে মিস্ স্মিথ দারোয়ানকে পাঠাচ্ছেন খাবার আনতে। সেই সঙ্গে আপনার খাবারও আনিয়ে নেওয়া যায়।

মিস্ স্মিথ কে?

বড়সাহেবের স্টেনো।

ও আচ্ছা। নিয়ে আসুক কিছু!

পয়সা দিলাম। খাবার এল। কফি পাওয়া যায় নি ডালহৌসি এলাকায় রাত আটটা মানে মধ্যরাত্রি। হঠাৎ দেখি মিস্ স্মিথ উঠে আসছেন আমার দিকে জুতো খুটখুটিয়ে। এর আগে এঁর সঙ্গে



pathagar.net

কোনদিন আলাপচারীর সৌভাগ্য হয় নি। শুভ সন্ধ্যা জানালাম তাঁকে।

হেসে বললেন : সন্ধ্যাটা খুব শুভ নয় আশঙ্কা হচ্ছে। আমার তো ছটার শো'র একটা টিকিট নষ্ট হল—আপনার কি ক্ষতি হল কে জানে ?

বললুম : না, আমার কোন সান্ধ্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল না।

চটুল হাস্য বিগলিত হয়ে মিস্ স্মিথ বললেন : না থাকলেই ভাল—কোন দুর্ভাগা বিরহিণীকে কষ্ট পেতে হবে না শুনে আশ্বস্ত হলুম। শুনলুম, আপনি কফির অর্ডার দিয়েছিলেন। পান নি। আমার ফ্লাস্কে এখনও একটু গরম কফি আছে—আসুন দু'জনে ভাগ করে খাওয়া যাক।

কী সর্বনাশ ! এ যে দেখছি দাদুর কথাই ফলতে চলল।

···আমি বাধা দিয়ে উঠি : একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যে সত্যদা।

সত্যদা হেসে ওঠে : ও, হ্যাঁ, সে কথা তো বলাই হয় নি। প্রথম মাসের মাহিনা পেয়ে দাদুর জন্যে একসেট উপনিষদ পাঠিয়ে ছিলাম দেশের বাড়িতে। দাদুকে মনে আছে তো ?

বললুম : সত্যদা, তোমার দাদু স্বনামধন্য সত্যানন্দ তর্করত্ন-মশাইকে একবার দেখলে কি ভোলা যায় ? সেবার সেই ফ্রেজার হাসপাতালে—

বাধা দিয়ে সত্যদা বলে : মায়ের কাছে আর মাসির গল্প করিস না। যা বলছিলাম শোন। দাদুকে চিঠিতে জানিয়েছিলাম এ অফিসের পরিবেশ। দাদুর যথেষ্ট বয়স হলেও মনটা এখনও রসস্থ ! শ্বেতাঙ্গিনী স্টেনোর নীলনয়নের প্রসঙ্গে চারলাইনে অনুষ্টুপ ছন্দে একটা উদ্ভট কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন। সংস্কৃত কবিতাটা মনে নেই, ভাবার্থটা হচ্ছে : যমুনাও নীল, যমুনাজলে স্নানার্থিনীর নীলাম্বনী শাড়িও নীল ; কৌস্তুভমণিও নীল, আবার নীলমাধবও



pathagar.net

নীল—কিন্তু হে অনড্বানকুল-চূড়ামণি সব নীলই নীলকান্তমণি নয়। নীলকণ্ঠ যে নীল সহ্য করতে পারেন বিদেশিনী নারীর নয়নের সে নীলকে সমঝে চল!

ভাগ্য ভাল। খ্রীষ্টানের ফ্লাস্ক থেকে কফি খাওয়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলাম। ওঁরা সদলবলে এসে পড়লেন। রাত তখন দশটা। একটু পরেই ডাক পড়ল আমার। উঠে যাচ্ছি, রামালু মাথা চুলকে বললে: একটু সামলে চলবেন স্যার—প্রায় সবাই বে-এক্তিয়ার।

মানে! তুমি কেমন করে জানলে?

ডিনার খেয়ে ফিরছেন ওঁরা। সকলেই মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান করেছে। রঘুনাথ বললে।

রঘুনাথ কে?

বড়সাহেবের আর্দালী!

কাজের লোক রামালু। সব খবর খুঁটিয়ে সংগ্রহ করতে জানে। এমন কর্মচারী পাওয়া ভাগ্যের কথা। মুখে সাহসের ভাব ফুটিয়ে গট্‌গট্ করে চলে গেলাম খাসকামরায়।

ঘরে পাঁচ-সাতজন লোক ছিলেন। শ্যামসুন্দরজী ছাড়া আরও তিনজন আমার পরিচিত। সিংজী, সেক্রেটারী আর মিস্ স্মিথ। তিন-চারজন আমার অপরিচিত। তাঁদের মধ্যে একজন বিদেশী, সম্ভবত আমেরিকান।

বসতে বলল না কেউ। নিজেই একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লুম। শ্যামসুন্দরজীর চোখ দুটি টকটকে লাল। ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে তিনি হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন একটা ম্যাপের উপর। অপরিচিত ভদ্রলোক ক'জনের কাছে আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন সেক্রেটারী সাহেব: আমাদের সিভিল এঞ্জিনিয়ার মিস্টার আচারিয়া।

আমি যে শীঘ্র আমেরিকা যাচ্ছি, আমার যে পাসপোর্ট ফটো

pathagar.net

তোলা হয়ে গেছে—এসব কথা আর বললেন না। ওঁরা কেউ কোন কথা বললেন না। শুধুমাত্র বিদেশী ভদ্রলোক প্রথামাফিক মামুলী গলায় বললেন। হা' ডুয়্ ডু।

একে একে সকলের দিকেই তাকিয়ে দেখলাম। সবাই নির্বাক। বোধকরি এখনও অ্যালকহলের মৌতাত কাটে নি কারও। কেউ চরুট খাচ্ছেন, কেউ টাই ঠিক করছেন—কারও বা টাইপ করা কাগজে দৃষ্টি নিবদ্ধ। শেষ পর্যন্ত শ্যামসুন্দরজীই কথা বললেন ইংরেজীতে : কাল আপনাকে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। ধরুন, মাসখানেকের জন্যে। আপনি তৈরী হয়ে স্টেশনে আসবেন। হাওড়া স্টেশন। বম্বে মেল। হঠাৎ সেক্রেটারীর দিকে ফিরে বললেন : টিকিট উনি কাটবেন, না তুমি কাটবে ?

উত্তরে সেক্রেটারী বললেন : সে সব মাইনর ডিটেইল্‌স্ আমরা দু'জনে ঠিক করে নেব।

আমি বললুম : কোথায় যেতে হবে ?

ধম্‌কে উঠলেন শ্যামসুন্দরজী : টিকিটখানা হাতে পেলেই সেটা জানতে পারবে। আমার সঙ্গে যখন যাচ্ছ তখন জাহান্নমে নয় নিশ্চয়।

রাত দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে করে আমারও মেজাজ তিরিক্ষে হয়েছিল। একথা অফিস আওয়ার্সেই আমাকে জানানো চলত। তার উপর স্পষ্ট দেখলুম এ কথায় মিস স্মিথ্ ডিকটেসনের খাতায় মুখ লুকিয়ে হাসছে। একবার মুখে এল বলি : আপনার মতো সাথী পেলে জাহান্নমে যেতেই বা বাধা কি ? কিন্তু মনে পড়ল রামালুর সাবধানবাণী ! অহেতুক মদ্যপের সঙ্গে বিতণ্ডা করে কী লাভ ? তাই বললুম : আজ জানতে পারলে আমার কিছু সুবিধা হত বৈ কি। বম্বে যেতে হলে একরকম প্রস্তুতির প্রয়োজন, সিমলা যেতে হলে অন্য রকম। তাছাড়া হাওড়া থেকে বম্বে মেল একটার বেশী ছাড়ে।

pathagar.net

বোমার মতো হয়তো ফেটেই পড়তেন শ্যামসুন্দরজী। কিন্তু তার আগেই খবরের-কাগজ-আঁকা জামা গায়ে আমেরিকান সাহেবটি বললেন : লেট মি ট্যাকল দ্য প্রবলেম্—প্লিজ।

শ্যামসুন্দরজী শ্রাগ করলেন।

সাহেব বললেন : আমরা যাচ্ছি মধ্যপ্রদেশে। রায়পুরের কাছাকাছি। সেখানে একটা জমি জরীপ করতে হবে। প্রায় বারো শ' একর। জমি উঁচু-নীচু, নদী আছে, জঙ্গল আছে—ঘন জঙ্গল নয়, আগাছা। কতদিন লাগবে জরীপ করতে ?

প্র্যাক্‌টিকাল কথাবার্তা। প্রতিপ্রশ্ন করলুম : কটা সার্ভে পার্টি কাজ করবে ? কত সেট সার্ভের যন্ত্রপাতি আছে ? শুধুই প্ল্যান চাই, না কণ্টুরও চাই।

সাহেব বললেন : সঙ্গত প্রশ্ন। তোমার শেষ প্রশ্নটার জবাবই আমি শুধু দিতে পারি। না, কণ্টুর প্ল্যান আপাতত চাই না—শুধু সার্ভে প্ল্যান হলেই চলবে। অন্যান্য প্রশ্নের জবাব কুমার বাহাদুর দিতে পারেন।

যাকে কুমার বাহাদুর বলা হল, তিনি এবার কথা বললেন। আমারই সমবয়সী। হালকা নীল রঙের একটা দামী স্যুট পরেছেন তিনি। ক্রমান্বয়ে টিনের তিনদুর্গ ধ্বংস করে চলেছেন। সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে বললেন : ওসব মাইনর ডিটেইলস ওখানে গিয়ে স্থির করা যাবে।

সাহেব এবার শ্রাগ করে বললেন : অ্যাস্ য়ু প্লিস।

শ্যামসুন্দরজী বললেন : কাল স্টেশনে দেখা হচ্ছে তাহলে ?

আমি বললুম : তাহলে রামালুকেও নিয়ে যাই ?

শ্যামসুন্দরজী বলেন : রামালু আবার কে ?

সেক্রেটারী সাহেব বলেন : অনুগ্রহ করে বাইরে একটু অপেক্ষা করুন, ওসব পরে আমি গিয়ে ঠিক করছি।

শ্যামসুন্দরজী বলেন : একস্যাক্টলি ! এতসব মাইনর ডিটেইলস্

pathagar.net

কি আমার পক্ষে দেখা সম্ভব ? আফটার অল আমি হলাম ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

কুমার বাহাদুর বলেন : ঠিকই তো। আমিও আমার স্টেট-অ্যাডমিনিস্ট্রেসনের মাইনর ডিটেইলসের ভিতর যাই না কখনও।

অগত্যা মাইনর ডিটেলসের নির্দেশ পাওয়ার জন্যে আমাকে আরও আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হল। স্থির হল, রামালুও যাবে আমার সঙ্গে। সাহেবটি অমায়িকই শুধু নয়, মাইনর ডিটেলসের মধ্যে ঢুকবার ইচ্ছে আছে তার। যাবার আগে জনান্তিক বলে গেল : এদের উপর ভরসা ক'র না। অন্তত এক সেট জরীপের যন্ত্রপাতি কলকাতা থেকে নিয়ে যেও—সময় খুব কম !

মনে পড়ল শ্রীকান্তের কথা। বুঝলাম কুমার বাহাদুরের সঙ্গে ডিনার খাবার পরেও এ লোকটির তবু কিছুটা বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। বাদ-বাকি সবাই তো ছুঁচোর মতো কানা।

পরদিন দেখা করলাম সেক্রেটারী সাহেবের সঙ্গে। এক সেট জরীপের যন্ত্রপাতি আমার চাই। ভ্রূকুঞ্চিত হল সাহেবের। ভাবখানা, কাজের নামে তো অষ্টরম্ভা—এত চাই চাই কেন ? গম্ভীর হয়ে বললে : বেশ লিস্ট তৈরি করে আন।

নিয়ে গেলাম লিস্ট। তা দেখে লাফিয়ে উঠল একেবারে।

থিয়োডোলাইট আবার কি ? এত টাকা দাম ? ও এখন স্যাংসন করানো যাবে না।

বললুম : বারো শ' একার জমি তাছাড়া মাপব কেমন করে ?

না না অত টাকা নয়, কিছু কমিয়ে আন তুমি।

বললুম : লুক হিয়ার। তোমরা বানাতে চাইছ পেপার ফ্যাক্টরী, মাপতে চাইছ বারো শ' একর জমি, সময় বলছ কম। এক্ষেত্রে থিয়োডোলাইট অপরিহার্য। কমিয়ে আমি আনব না—নিজ দায়িত্বে তুমি কেটে দিতে পার।

কুটিল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে সেক্রেটারী বললে :

pathagar.net

সার্ভের সব যন্ত্রপাতি কুমার বাহাদুরের স্টেট থেকেই পাবে তুমি।

বললুম : সে কথা আমার নোটে লিখে ঐ থিয়োডোলাইট যন্ত্রটা তুমি কেটে দাও তাহলে।

তুমি নিজে থেকে কমিয়ে দেবে না ?

না !

কেন ?

কারণ কুমার বাহাদুরের স্টেটে এ যন্ত্র আছে কিনা তা তুমিও জান না, আমিও জানি না। স্বয়ং কুমার বাহাদুরও নিশ্চয় খবর রাখেন না এসব মাইনর ডিটেলসের। অথচ যন্ত্রটা না হলে ঐ সময়ের মধ্যে জরীপ সম্ভব নয়। কাজের দেরি হওয়ার কৈফিয়ত একদিন আমাকে দিতে হবে—তাই আমি ওটা নিজে হাতে কাটতে পারি না।

শ্বাপদ দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর সে লিখে দিল ঐ কথা।

মোটা দুই চেন, চব্বিশটা অ্যারো আর খান তিনেক মেটালিক টেপ নিয়ে রওনা হলাম সেদিন। আমরা দুই নিধিরাম সর্দার—সত্যপ্রিয় আচারিয়া এবং নটরাজা রামালু। আমরা জরীপ করতে চলেছি সেই জমি, যাতে কাগজের কারখানা হবে বলে কত লক্ষ টাকার যেন শেয়ার ছাড়া হয়েছে বাজারে।

রায়পুর থেকে বিশাখাপত্তনমের দিকে চলে গেছে একজোড়া ব্রাঞ্চ-লাইন। একটা তারই নগণ্য স্টেশন। খুঁজলে ছোট হরফে টাইম-টেবিলে নামটা পাওয়া যাবে। নামতে হল সেখানেই। রেল স্টেশনের গা-ঘেঁষে খানকয়েক রেলওয়ে স্টাফ কোয়ার্টার্স। এছাড়া আছে একটি মাত্র পাকা-বাড়ি। বেলেপাথরে গাঁথা দ্বিতল বাড়ি। সেটা গেস্ট-হাউস। সপ্তাহে একদিন হাট বসে। প্রতি বুধবারে। প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা যে এই নগণ্য স্টেশনটাকে খাতির করে এখানে

pathagar.net

দাঁড়ায় তার একমাত্র কারণ—এই রেল স্টেশনটিই ভবানীগড়ের রাজধানী ভবানীনগরকে যুক্ত করেছে সভ্যজগতের সঙ্গে। ভবানীগড় ছোট্ট করদ রাজ্য। মাত্র সাড়ে ছয় শ' বর্গমাইল। লোকসংখ্যা উনিশ শ' একত্রিশের আদমসুমারী অনুসারে সওয়া লক্ষ। সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী স্টেটের শতকরা আশিজন হচ্ছে আদিবাদী। ওঁরাও অথবা মুণ্ডা। গোণ্ডও আছে। পাথরে-কোঁদা প্রকৃতির মানুষ। সভ্যজগতের ধার ধারে না। রাজাকে দেবতার মত ভক্তি করে। আপন মনে থাকে তারা বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পর্বতে। দশেরার দিন জমায়েত হয় ভবানীনগরে। রাজা দর্শন দেন। ওরা নাচে, গায়, শুয়োর বলি দেয়—তারপর আবার ফিরে যায় আরণ্যক অন্তেবাসীর জীবনে। রাজধানী ভবানীনগর ছোট্ট ছবির মতো শহর। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে তাসের ঘরের মতো বাড়িগুলি থাকে থাকে সাজানো। রাজার নিজস্ব ডায়নামো আছে। দূর থেকে দেখা যায় রাত্রির অন্ধকারে রাজবাড়ির আলোর রোশনাই। শহরের লোকসংখ্যা মাত্র ছয় হাজার। সেখানেও সপ্তাহে দুদিন হাট বসে। বড় হাট রবিবারে। রেল স্টেশন থেকে ভবানীনগর বাইশ মাইল। সমস্ত রাজ্যে এই একটি পীচমোড়া পাকা রাস্তা। রাজপথ। বাদ-বাকী রাঙামাটির জনপথ। ওঁরা বলেন মুরাম রোড।

রাজবাড়িতে বিজলি বাতি আছে, সুইমিং পুল আছে, টেনিস কোর্ট আছে। আছে সদরে দরবার, অন্দরে রঙমহাল! রাজবাড়ির বাইরে শহরের পয়ঃপ্রণালী আবহমানকাল ধরে অবহমান; কিন্তু রঙমহালের মদিরাস্রোত নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বয়ে চলেছে। একদিকে অমিতব্যয়িতা আর উচ্ছৃঙ্খলতা আর অন্যদিকে চরমতম দীনতা, এই নিয়ে ভবানীগড় রাজ্য। দু'শ বছরের ইংরেজ শাসনে এই হচ্ছে ভবানীগড় রাজ্যের ইতিহাস। প্রজাবর্গের সম্বল শুধু তীর-ধনুক আর কুঠার—রাজার জন্যে কিন্তু তোপদাগার ব্যবস্থা আছে। ইংলণ্ডেশ্বরের সঙ্গে ভবানী-গড়ের রাজা চুক্তিবদ্ধ।

pathagar.net

ছোট্ট স্টেশনে গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন সকাল হয়েছে। আলো ফুটেছে চারিধারে। আমি ছিলাম সেকেণ্ড ক্লাসের একক যাত্রী। বড়কর্তারা সবাই ফার্স্ট ক্লাসে, রামালু ইণ্টারে, আর পিয়ন-আর্দালীর দল সার্ভেণ্টস্ কম্পার্টমেণ্টে। প্ল্যাটফর্ম বলতে যা বোঝায় তার বালাই নেই। গাড়ি থেকে নামতে হল সব কয়টি ধাপ সাবধানে অতিক্রম করে। কিন্তু স্টেশনে দেখি রীতিমতো সমারোহ। দশবারোজন কুলি নিয়ে একজন কুলি-সর্দার লম্বা সেলাম দিল আমাদের—গার্ড-অফ-অনারের ভঙ্গিতে। আমি ভাবছিলুম এসব কায়দা করতে করতেই যদি ট্রেনটা ছেড়ে দেয় তাহলে মালপত্র বুঝি নামানো যাবে না। ভুল ধারণা আমার। স্টেশনমাস্টার মশাই স্বয়ং এসে সেলাম জানালেন। যদিও তিনি রেল কোম্পানীর লোক, তবু জলে বাস করে বোধকরি কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করতে চান না। নিজে এসে খোঁজ নিয়ে গেলেন আমাদের মালপত্র সব নেমেছে কিনা। আমাদের অনুমতি পেয়ে তবে তিনি ছাড়পত্র দিলেন প্যাসেঞ্জার ট্রেনটিকে।

স্টেশনে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিল আরও দুজন ভদ্রলোক। দশাসই চেহারার একজন প্রৌঢ়। অনেক ঝড়-ঝাপটার চিহ্ন আঁকা আছে তার মুখে। শুনলাম রুস্তমজী শের। এখানকার গেস্ট-হাউসের কেয়ার-টেকার। দ্বিতীয়জন বৃদ্ধ। গায়ে মেরজাই, পরিধানে চোঙা-পাতলুন, মাথায় কালোরঙের টুপি। বলি-রেখাঙ্কিত বসন্তের ক্ষত-চিহ্ন-লাঞ্ছিত পাকানো মুখ। ঝোলা গোঁফ, ধূর্ত, একজোড়া সন্ধানী চোখ। পরে জেনেছিলাম ইনি স্টেটের এঞ্জিনিয়ার গুরুবচন মেহতা। সাব-ওভারসিয়ার পাস কিনা জানি না—তবে থিয়োডোলাইট কাকে বলে তা তিনি জানেন না একথা পরে জেনেছিলাম। তা সে যাই হোক এঁরা দুজনেই নীচু হয়ে অভিবাদন করলেন কুমার বাহাদুরকে। কুমার অবশ্য ভ্রূক্ষেপও করলেন না। ফলে আমরাই তাঁর হয়ে প্রত্যভিবাদন করলুম।

স্টেশনে পীচমোড়া সড়কে সারি সারি চারখানা গাড়ি। বিশালকায়

pathagar.net

কালো রঙের একটা শেভ্রলে। বনেটে ছোট্ট পতাকা। লাল রঙে নম্বর লেখা—'ভবানীগড় ২'। এখানা কুমার বাহাদুরের। রাজার নিজস্ব একটি গাড়ি আছে। সেটাই বোধকরি এক নম্বর গাড়ি। এছাড়া এসেছে স্টেশন-ওয়াগন, একটা অ্যাম্বুলেন্স ভ্যান আর একখানা জীপ।

স্টেশন থেকে আধমাইল দূরে গিয়ে থামল আমাদের গাড়ির ক্যারাভান। সেই দ্বিতল বাড়ির সামনে। অর্ধগোলাকৃতি-খিলানওয়ালা দ্বিতল বাড়ি। পাথরের গাঁথনি। সামনে মস্ত লন। দুটি গেট। মাঝখানে ফুলের কেয়ারি। লাইনবন্দী য়ুক্যালিপ্টাসের সারি। পোর্টিকোর পরেই একটা বড় হল-কামরা। একপাশে সিঁড়ি। আমরা পাথরের সিঁড়ি বেয়ে দ্বিতলে উঠে এলুম। সিঁড়ি এসে থেমেছে একটা চওড়া বারান্দায়। হল-কামরার উপর আবার একটা হল-কামরা। উপরে প্রকাণ্ড একটা ঝাড়-লণ্ঠন। দেওয়ালের গায়ে সারি সারি খাসগেলাসের দেওয়ালগিরি। তাতে মোমবাতি। বিজলি নেই। ঘর জোড়া দামী একটা কার্পেট পাতা। সিঁড়ির ল্যাণ্ডিং-এ চিতাবাঘের একটা চামড়া ঝুলছে। মাথাটা স্টাফ্ট্ করা। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় লক্ষ্য করে ছিলুম ধাপে ধাপে হরিণ বুনো মোষ আর সম্বরের মাথা টাঙানো আছে। হল-কামরার দেওয়ালে কিন্তু শুধুই অয়েল পেন্টিং। বোধকরি ওঁরা সবাই ভবানীগড়ের ভূতপূর্ব রাজা। যে দরজা দিয়ে আমরা হল-কামরায় ঢুকলাম তার উপর ইংলণ্ডেশ্বরের একটি বড় তৈলচিত্র। কে বলবে মাস দেড়েকের মধ্যে দেশ স্বাধীন হতে চলেছে।

আমরা গিয়ে বসলুম গদি-আঁটা চেয়ারে। খানসামা-আর্দালীর দল আমাদের মালপত্র ধরে টানাটানি করতে থাকে। কথাবার্তায় বুঝলুম এখানেই থাকতে হবে আমাদের দু'জনকে। আমি আর রামালু। কুমার বাহাদুর, শ্যামসুন্দরজী আর সেক্রেটারী সাহেব নাস্তা সেরে চলে যাবেন রাজধানীমুখো। প্রাতঃকৃত্যাদি ট্রেনেই

pathagar.net

সারা হয়ে গিয়েছিল। অনতিবিলম্বে এসে গেল টোস্ট, ডিম-কর্নফ্লেকস্। আমি নিরামিষাশী শুনে একটু বিব্রত হলেন রুস্তমজী। নিয়ে এলেন কলা আর মেঠাই। প্রটোকল অনুযায়ী রামালু বেচারা বসতে পেল না আমাদের সঙ্গে। সে কি খেল ভগবান জানেন। আদৌ কিছু খেতে পেল কিনা তাই বা কে জানে? তক্‌মাধারী বাবুর্চী পরিবেশন করল আহার্য। বড়কর্তারা চলে গেলে মধ্যাহ্ন আহার কি জুটবে জানি না—ডবল-ডোজ লোড করে নেওয়াই যে এক্ষেত্রে বিধেয় এ বুদ্ধি জাগছে মস্তিষ্কে; কিন্তু ঐ বাবুর্চীর চিবুকের ছোট্ট নূরটি দেখে আমার আহারের স্পৃহা ক্রমেই কমে আসছে। কলা আপেল আর শসা খেয়ে নিলাম বেশি করে। আহারান্তে এল কফি, আর তার সঙ্গে এল একটি অপূর্ব বিস্ময়!

কফির ট্রে সাজিয়ে নিয়ে এল তক্‌মাধারী একটি বাবুর্চী, কিন্তু তার পিছন পিছন এল একটি অষ্টাদশী। এই রুক্ষ প্রকৃতির দেশে ভোজবাজির মতো কোথা থেকে উদয় হল ও? একি ভবানীগড় রাজসভার নটী?

ময়ূরকণ্ঠী রঙের একটি ঘাগরা পরেছে। গায়ে ঘন সবুজ রঙের একটা খাটো চোলি। গলার কাছে সোনালী জরির কাজ—নীবিবন্ধের কাছে অনাবৃত দুগ্ধশুভ্র কটিদেশ। পীনোদ্ধত বক্ষের উপর দিয়ে পাক দিয়েছে আস্বচ্ছ চীনাংশুক। মাথায় দীর্ঘ একবেণী—তাতে সাদা ঝুটো মুক্তোর একছড়া মালা। বেণীর প্রান্তদেশে জরির ফুল। দুহাতে একসার করে কাচের চুড়ি, বাজুতে ঝুমকো ঝোলানো কি একটা আভরণ, কানে সাদা মুক্তোর দুল। যেন পাথরের সিঁড়ি বেয়ে নয়, কালিদাসের ভূর্জপত্রে গাঁথা কোন শ্লোকের সোপান বেয়ে এসে আবির্ভূত হল সে। কিন্তু সাজপোশাকে নয়, আমি দেখছিলাম মেয়েটিকে। এ কে? ঐ কুৎসিতদর্শন কেয়ার-টেকার রুস্তমজীর আত্মজা? কখনই নয়। তবে কি ভবানীগড় রাজসভার নটী অথবা মন্দিরের সেবাদাসী? তাই বা কেমন করে হবে—সে এখানে এই



pathagar.net

স্টেশনে গেস্ট-হাউসে আসবে কেন ? কোন ভদ্রঘরের মেয়ে হলে এই সাত-সকালে এমন সাজপোশাক পরে এমন আচমকা এখানে আসবেই বা কেন ? লক্ষ্য করে দেখলাম, সজ্জার বাহুল্য বিষয়ে সে অচেতন—তার সন্নত দৃষ্টির গভীরে কোন বিষাদখিন্ন আত্মার আর্তি—বহিরঙ্গের বাহ্যাড়ম্বরের অন্তরালে তার নারীত্ব যেন একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস চেপে রেখেছে। হাত তুলে সে নমস্কার করল—প্রথমে কুমার বাহাদুরকে পরে আমাদের সকলকে। হাতই তুলল, মুখ তুলল না কিন্তু। নীরবে নতনয়নে ট্রে থেকে একটি করে পেয়ালা নামিয়ে তাতে কফি ঢালতে থাকে।

কুমার বাহাদুর সৌখীন একটা লাইটার থেকে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন : রঞ্জুবিবির খবর কি ?

প্রত্যুত্তরে মেয়েটি শুধু হাসলে। মনে হল ঐটুকু হাসি ঠোঁটের কোনায় ফুটিয়ে তুলতে রীতিমতো চেষ্টা করতে হয়েছে ওকে। সে হাসি প্রাণের উচ্ছ্বাসে স্বতঃস্ফুট নয়, সে হাসি সৌজন্যের মাস্তুল দিয়ে গড়া, কৃত্রিমতায় ম্লান। কাগজের ফুলের হাসি যেন। ট্রেনের কামরাতেই দু'একপাত্র না টেনে এলে স্থূলদৃষ্টি কুমার বাহাদুরের চোখেও তা ধরা পড়ত এবং তাহলে কিছুতেই তিনি পরের রসিকতাটা করতে পারতেন না। রুস্তমের এ ভারি অন্যায়। রঞ্জুবিবিকে এভাবে আটকে রাখা। না, এবার ওকে আমি কলকাতা নিয়ে যাবই। বুঝলে রুস্তম, অগস্টে আবার আমি কলকাতা যাচ্ছি। রঞ্জুবিবিও যাবে আমার সাথে। সিনেমা-জাদুঘর-চিড়িয়াখানা সব দেখিয়ে আনব।

রুস্তমজী আভূমি নত হয়ে একটা সেলাম ঝাড়ল : হুজুর মেহেরবান্! এ তো ওর পরম সৌভাগ্য।

মেয়েটি মুখ তুলল না কিন্তু। লক্ষ্য করে দেখলুম—একটু ছলকে কিছুটা কফি পড়ল টেবিল ক্লথে। মনে হল, এটাকে ঠিক পরম সৌভাগ্য বলে মেয়েটি মনে করে না। কেন, কি বৃত্তান্ত কিছুই সেদিন



pathagar.net

বুঝি নি—কিন্তু কি জানি কেন আমার মনে হল মেয়েটির অনিচ্ছার একটা চিহ্ন লেগে রইল যেন শুভ্র টেবিল-ঢাকার ঐ কালো দাগটায়।

পরদিন থেকেই শুরু হয়ে গেল আমার কাজ। কারখানার জন্য যে জমিটি নির্বাচিত হয়েছে সেটি স্টেশন থেকে মাইল সাতেক দূরে। জমিটা আমাকে দেখিয়ে দিতে এলেন সেই মার্কিন ভদ্রলোক। সঙ্গে ভবানীগড় স্টেটের নিজস্ব এঞ্জিনিয়ার গুরুবচন মেহতা। জীপ চালিয়ে নিয়ে এল রুস্তমজী নিজেই। জমির পূর্বসীমানা দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে স্বচ্ছতোয়া একটা পার্বত্য নদী। টুংরি! দূরে দূরে ওঁরাও আর মুণ্ডাদের গ্রাম। নদীর ধারে অদ্ভুতদর্শন দুটি পার্চিং স্টোন। তারই কোল ঘেঁষে খাটানো হয়েছে দুটি তাঁবু। একটায় থাকব আমি আর রামালু—আর একটি রান্নাঘর, সেটায় থাকবে ঝামরু, আমাদের খিদমদগার তথা পাচক। জীপে চড়ে জমির সীমানাটা একবার দেখে এলাম। উঁচুনীচু ডাঙা জমি। নদীর ধারে ধারে কিছু ক্ষেত আছে—লতানে গাছ। ঝিঙে না পটল দূর থেকে বোঝা গেল না। জমির দক্ষিণ-পূর্বে পড়েছে একটি আদিবাসী গ্রাম। ধানের জমি আছে গ্রামের লাগোয়া বিস্তৃত ভূখণ্ডে। টুংরির ধারে কতকটা পাথুরে শক্ত জমি—আউট-ক্রপ। চষা ক্ষেতের উপর দিকে জীপ চলল এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। বারে বারে মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে যাচ্ছিল। তবু দেখে এলাম জমিটার চতুঃসীমা।

চক্রাকারে জমিটা প্রদক্ষিণ করে যখন তাঁবুতে ফিরে এলাম তখন মার্কিন সাহেবটি প্রশ্ন করল: কি মনে হয়, কতদিন লাগবে জমিটা জীরপ করতে?

আমি বললুম: তোমার এ প্রশ্নের উত্তরে আমি কলকাতাতেই একটি প্রতিপ্রশ্ন করেছিলুম। আজও তার জবাব পাই নি।

সাহেব বিব্রত হল। শ্রাগ করলে। তারপর রুস্তমজীর দিকে ফিরে বললে: তোমাদের স্টেটে কোনও এঞ্জিনিয়ার আছে?



pathagar.net

প্রশ্নটা অনুধাবন করতে কিছুটা সময় লাগল রুস্তমজীর। তারপর বললে : আলবৎ। এই তো ইনি। মিস্টার গুরুবচন মেহতা।

গুরুবচন নিজের নামটা কানে যেতে এগিয়ে এল। চোংদার পায়জামাধারী বুটিদার-মেরজাই-গায়ে মাথায়-টুপি খাটো মানুষটা নীচু হয়ে সেলাম করল। সাহেব তাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল : তোমার কি কি জরীপের যন্ত্র আছে ?

গুরুবচন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। প্রশ্নটা হিন্দীতে তর্জমা করে দেওয়ার পর বললে : হাঁ হুজুর, সব আছে। আমি পাঠিয়ে দেব।

সাহেব বললে : থিয়োডোলাইট আছে ?

গুরুবচন জানতে চাইলে 'থিয়োডোলাইট' শব্দটার হিন্দি কি। এবার আমাকে শ্রাগ করতে হল। শেষ পর্যন্ত সাহেব আমাকে বললে : তুমি কাজ শুরু কর। আমি দেখি কি করতে পারি তোমার জন্যে।

বললুম : তুমি কি এঞ্জিনিয়ার ?

না, আমি জিওলজিস্ট। কেন ?

জিওলজিস্ট ? তাহলেও জরীপের কথাটা তোমার জানা আছে। আশা করি বুঝতেই পারছ 'চেন' দিয়ে এই বারো শ' একর জমি মাপতে বছর কাবার হয়ে যাবে।

অফ কোর্স। তুমি কিছু ভেবো না। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

স্থির হল সাহেব ভবানীনগরে গিয়ে খোঁজ নেবে জরীপের কোন যন্ত্রপাতি আছে কিনা। না থাকলে কলকাতা ফিরে সে আমাকে এক সেট জরীপের যন্ত্রপাতি পাঠিয়ে দেবে। হ্যাঁ, নিশ্চয় থিয়োডো-লাইটও আসবে।

যাবার সময় গাড়িতে উঠে সাহেব বললে : আর কিছু জানতে চাও ?

pathagar.net

বললুম : জানতে তো অনেক কিছুই চাই। এক প্যাকেট সিগারেট ক' মাইল হাঁটলে কিনতে পাওয়া যায় তাও জানতে চাই—কিন্তু তুমি বিদেশী। তোমাকে সে প্রশ্ন করে লজ্জা দেব না। তবু তুমি যে আমাকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছ এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

সাহেব বিব্রত হল আবার। একটা ছোট্ট বিদায়-ধূমপান অনুষ্ঠান সেরে স্টার্ট দিল জীপে। যতক্ষণ না দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যায় তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে দেখলাম ওদের অপসৃয়মান গাড়িটাকে। ক্রমে দিগন্তে মিলিয়ে গেল সভ্যজগতের শেষ চিহ্ন—পিছনে পড়ে রইল একটা ধূলোর-ঝড়।

পরের দিন থেকেই শুরু হয়ে গেল জরীপের কাজ। চেন সার্ভে। শ' তিনেক টাকা দেওয়া হয়েছিল আমাকে—ইম্প্রেস্ট ক্যাস। জনমজুরের রেট দৈনিক চার আনা, সুতরাং তিন শ' টাকা অল্প নয়। ঝমরু হিন্দি বোঝে। জাতে কাহার। সে পাশের ওঁরাও গ্রাম থেকে পরদিন কুলি যোগাড় করে আনল। গাঁও-বুড়োর নাম আখালী। পঞ্চাশোর্ধ্বে বয়স—তেলপাকা লাঠির মতো মজবুত শরীর। মানুষগুলো শান্ত সরল, পরিশ্রমী। দিন যাপনের যাবতীয় বন্দোবস্ত করে দিল ঝামরু আর আখালী। পানীয় জল আনতে হয় টুংরি থেকে। হাট বসে মাতিতিরে। প্রতি সোমবার। এখান থেকে মাইল চারেক। একজনকে সেদিন হাটে পাঠাতে হয়। দুধও পাওয়া গেল গ্রাম থেকে। গরুর নয়, মোষের। আর মুরগী খুব সস্তা। কিন্তু না আমি, না রামালু কেউই মাংসাশী নই।

বেশ লাগছে তাঁবুর জীবন। অতি প্রত্যুষে ঘুম ভেঙে যায়। গরম খুব বেশী নয়। অন্তত কলকাতার মতো ঘাম হয় না। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর সন্ধেবেলায় সব কুলি জমায়েত হয় তাঁবুতে। রামালু নাম ডাকে, এক একজন করে এগিয়ে আসে।



pathagar.net

টিপছাপ দিয়ে দৈনিক মজুরি নিয়ে যায়। প্রথম কদিন দৈনিক দিয়ে তারপর সপ্তাহান্তের ব্যবস্থা করতে হবে। পরামর্শটা ঝামরুর। তাহলে লোক বেশী পাওয়া যাবে। না হলে ক্ষেতের কাজ ছেড়ে ওরা আসবে না। সন্ধ্যার পর চারপাইতে শুয়ে শুয়ে আকাশের তারা গনি! আষাঢ় মাস যাচ্ছে। সূর্য এখন মিথুনরাশিতে। সুতরাং চার পাইতে শুয়ে সন্ধ্যাবেলা ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে তাকালেই দেখতে পাই মাথার উপর জ্বলজ্বল করছে—স্বাতী!

একদিন ওঁরাও গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে এসে আমাকে নাচ দেখিয়ে গেল। তাঁবুর সামনে আগুন জ্বেলে ওরা ঘুরে ঘুরে নাচল। মাদল বাজালো ছেলের দল, অদ্ভুতদর্শন শিঙেও বাজালো; স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ছেলেমেয়েরা যেন বরণ করে নিল অতিথিদের। রামালুর পরামর্শ মতো পাঁচ টাকা বকশিশ্ করতে হল।

পঞ্চম দিন জীপ হাঁকিয়ে রুস্তমজী এসে হাজির। সে সঙ্গে করে এনেছে একটা প্যাকেট। খুলে ফেলতে তা থেকে বের হয়ে পড়ল একগাদা জিনিস। দু'টিন বিস্কিট, জ্যাম, চীজ, কয়েক টিন সিগারেট, দেশলাই, মোমবাতি—সংসার-যাত্রা নির্বাহের যাবতীয় খুঁটিনাটি। সঙ্গে একটা চিঠি। জ্যাক, সি. গ্রে লিখছে: কিছু মনে ক'র না, স্বল্প পরিচিত বিদেশী বন্ধুর কাছ থেকে এই সামান্য উপহারটুকু নিতে যদি তোমার সঙ্কোচ হয় তবে তুমি কলকাতায় ফিরে এলে না হয় একটা বোঝাপড়া করা যাবে। দোষ তোমার নয়, আমাদের। বস্তুত আমার। তোমাকে আমিই সেদিন বলেছিলাম কাজের ধরনটা। আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম জায়গাটা পাণ্ডববর্জিত। তাই তুমি তৈরী হয়ে যেতে পার নি। সে যাই হোক, কুমার বাহাদুর থিয়োডো-লাইট পাঠিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পত্রবাহকই সেটা নিয়ে যাচ্ছে। তিন সপ্তাহের মধ্যে জরীপ শেষ করা চাই। অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন।

পত্র পাঠ করে রুস্তমজীকে বললুম: কই থিয়োডোলাইট কই?



pathagar.net

রুস্তমজী বললে : সেটা কি চীজ আমাকে বোঝাও তো। গুরুবচন আর আমি সারা স্টোর লেজারটা ওলটপালট করে খুঁজেছি। ও নামের কোন কিছু তো কখনও এন্ট্রি হয়নি। ভবানীগড়ের সব বড় বড় দোকানেও খোঁজ নিয়েছি। কেউ বলতে পারেনি।

বললুম : তবে জ্যাক গ্রে কেন লিখেছে, পত্রবাহক সেটা নিয়ে যাচ্ছে ?

শুনলাম জ্যাক গ্রে তিনদিন আগে ফিরে গেছে কলকাতায়।

কুমার বাহাদুরের কথামতো সে ঐটা লিখেছে। রামালু বললে : কলকাতায় টেলিগ্রাফ করুন।

রুস্তমজী বললে : আপনি লিখে দিন, আমি স্টেটের খরচে টেলিগ্রাফ করিয়ে দেব।

আমি বললুম : তার আগে এস একটু চা খাওয়া যাক।

রুস্তমজী বললে : চা কেন, অন্য কিছুর ব্যবস্থা নেই ?

অন্য কিছু মানে ?

তোমার কাছে না থাক, আমার কাছে আছে।—জীপ থেকে একটা বোতল বার করে আনল রুস্তমজী। আমি যোগদান করব না শুনে বেচারা নিরাশ হয়ে বোতলটা আবার জীপে তুলে ফেলল। ঝামরু বললে : চাও ফুরিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত জ্যাক গ্রে'-র প্যাকেট থেকে উদ্ধার করা কফির কৌটায় অতিথি সৎকার করা গেল। রুস্তমজী বললে : তোমার ঐ যন্ত্রটার কথা আমার সামনেই কুমার বাহাদুর জিজ্ঞাসা করেছিলেন গুরুবচনকে। তা গুরুবচন বললে—ওসব দরকার হবে না। ও যন্ত্র ছাড়াই যখন এতদিন চলেছে, তখন এবারও চলবে। গুরুবচনকে খুব বিশ্বাস করেন কুমার বাহাদুর। স্টেটের সব কাজ সেই দেখে। না হলে এতক্ষণে কলকাতায় লোক দৌড়াত ঐ যন্ত্র কিনতে।

আমি বললুম : তোমার গুরুবচন মেহতা কোথায় ?

কি জানি। এখনও ভবানীনগরেই আছে বোধকরি।

pathagar.net

আমাদের কাজকর্ম কেমন চল্‌ছে, কোন কিছু অসুবিধা হচ্ছে কিনা খোঁজখবর নিল রুস্তমজী। বেশ মুরুব্বিয়ানার চালে। যেন সেই নিয়োগকর্তা। ঝামরুকে ডেকে খামোকা খানিক গালমন্দ করল। আমাকে ভাঙা ইংরাজিতে বললে—এ শালাদের চাবুকের উপর রাখবে। রোজসকালে একবার গালাগাল করবে, তিনদিন অন্তর একটা করে লাথি ঝাড়বে নইলে ঠিকমতো কাজ করে না এরা। এই এখানকার দস্তুর। রোমে এসেছো, রোমান হও। লাথির ওপর রাখ এদের।

রামালু আমাকে আড়ালে ডেকে বললে: আপনি স্যার ওকে বলুন—কাল সকালেই যেন জীপটা এখানে পাঠিয়ে দেয়। জীপ এখানে থাকবে।

আমি বললুম: সে কি? কেন? জীপ রেখে কি রাজ্য জয় হবে আমাদের!

জীপটা গ্রে-সাহেব আপনার জন্য বন্দোবস্ত করে গেছে। ওটা রুস্তমজীর হাওয়া খাবার জন্যে আসেনি ভবানীনগর থেকে। অথচ আজ দু দিন সেই ব্যবহার করছে।

অবাক হয়ে বলি: সে কি! তুমি কেমন করে জানলে?

মিশিরজী বললে।

মিশিরজী কে?

ঐ জীপের ড্রাইভার।

অদ্ভুত ধূর্ত লোক তো! আবার মনে হল, এমন কর্মচারী পাওয়া ভাগ্যের কথা।

রুস্তমজীকে বললুম: এখানে আমার একটা জীপের দরকার ছিল। তাহলে প্রয়োজনে শহরে যেতে পারতুম। ব্যবস্থা করা যায়?

ভ্রূকুঞ্চিত হল রুস্তমজীর। কথাটা ইচ্ছা করেই বলেছিলুম রামালু আর মিশিরজীর উপস্থিতিতে।

রামালু বললে: আপনি তো গ্রে-সাহেবকে একথা বলেও ছিলেন। বোধকরি সাহেব ভবানীনগরে খবরটা দিতে ভুলে গেছেন।



pathagar.net

যা হোক আপনি রুস্তমজীর হাতেই পুল-জীপের জন্য একখানা রিকুইজিসান দিয়ে দিন। মিশিরজী সেটা পৌঁছে দেবে ভক্তবৎসলমজীকে।

আবার আমাকে প্রশ্ন করতে হল, ভক্তবৎসলমজী কে?

জবাব দিলে জীপ-ড্রাইভার মিশির। সেলাম করে সবিনয়ে বললে: শ্রীযুক্ত ভক্তবৎসলম তলোয়ার হচ্ছেন আমাদের মহামহিম দেওয়ানজীর ভাইপো। পুল-গাড়ির ডিউটি তিনিই অ্যালট করেন।

রুস্তমজী থতমত খেয়ে বললে: বেশক্। আরে জীপখানা তো আপনার খিদমতের জন্যই পাঠিয়েছেন ভক্তবৎসলমজী। তা আমি বলি কি—আপনি বেহুদ্দা কেন এই বিজন বনে পড়ে থেকে কষ্ট পান। চলুন আমার ওখানে। গেস্ট-হাউসের কামরা খুলে দিচ্ছি। রোজ সুবে এখানে আসবেন, সামে ফিরে যাবেন।

রামালু তো তৎক্ষণাৎ রাজী। বলে: সেই ভাল স্যার। আপনি কেন এখানে পড়ে কষ্ট পাচ্ছেন? আপনি গেস্ট-হাউসেই থাকুন। রোজ এসে কাজ দেখে যাবেন।

আমি তাতে রাজী হতে পারি না। রামালুকে এই তেপান্তরের মাঠে একা ফেলে রেখে আমি কোন আক্কেলে আশ্রয় নেব গেস্ট-হাউসের গদি-আঁটা বিছানায়? কিন্তু রামালু কিছুতেই শুনল না। একরকম জোর করেই আমাকে উঠিয়ে দিল জীপে। মালপত্র সমেত।

ফেরার পথে দেখলুম অস্তসূর্যের শেষ আশীর্বাদ নিয়ে পশ্চিমাকাশ লালে লাল হয়ে গেছে। পাহাড়ের কোলে কোলে ওঁরাও গ্রাম। গাঁয়ের ভিতর থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়ার কুণ্ডলি। পাহাড়টা ঝিমোচ্ছে। তার গলায় এই গরমেও এটা ধোঁয়ার কম্‌ফার্টার। দুটো গাঁয়ের কুকুর অনেকটা পথ তাড়িয়ে নিয়ে এল আমাদের জীপটাকে।

দ্বিতলের ঘরখানা আমায় ছেড়ে দিয়েছিল রুস্তমজী। কোণার

pathagar.net

ঘরখানা নয়, সেখানা বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য তালাবদ্ধ থাকে। এ ঘরটা ছোট। একটি মাত্র নেয়ারের খাটিয়া। কোণার দিকে একটা ড্রেসিং টেবিল। কুঁজোয় খাবার জল। কি নেই?

রুস্তমজীকে বললুম: আমাকে তো এখানে এনে তুললে—কিন্তু তোমাদের গেস্টহাউসের চার্জ কি রকম? সীট-রেন্টই বা কত, মীল চার্জই বা কত?

রুস্তমজী চোখ টিপে বলেছিল: সেজন্য ভাবতে হবে না আপনাকে। সে সব এমন কিছু নয়। উদাস্ত পরিশ্রম করতে হবে যখন, তখন খাওয়া-থাকার একটু আরাম না হলে পেরে উঠবেন কেন?

বললুম: দেখ রুস্তমজী, কোম্পানী আমাকে দৈনিক ছয় টাকা হারে আউট-স্টেশন অ্যালাউন্স দেয়। তাতে কুলাবে তো?

রুস্তমজী হেসে বললে: তাই না হয় দেবেন আমাকে। আপনি তো নিরামিষাশী, কি-ই বা খাওয়াব আপনাকে। রাঁধে ঐ রঞ্জুই। দিন গুজরান বই তো নয়।

আমি বলেছিলুম: আচ্ছা আমাকে গেস্ট-হাউসে পাঠাবার জন্য রামালু এত উৎসাহী হল কেন বলত?

রুস্তমজী হোহো করে হেসে উঠল। বললে: বাবুজী, আপনি একেবারে ছেলেমানুষ। তাও বুঝলেন না?

না। কি?

আপনি তো মাংস খান না! ম-কারান্ত আর একটা জিনিসও সেদিন খেলেন না। কিন্তু ম-কারান্ত আরও একটা চীজ আছে—যা অতি সস্তায় পাওয়া যায় ওঁরাও গাঁ থেকে। ঝামরুর কাছে শুনলুম তাও আপনি আমদানি করেননি। রামালু তো ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি নয়—তাই আপনাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে।

কথাটা সেদিন বিশ্বাস হয়নি। আজও বিশ্বাস হয় না।

কিন্তু রুস্তমজী? সে কেন প্রস্তাব করল গেস্ট-হাউসে এসে থাকার জন্যে? সেদিন বুঝিনি—আজ বুঝতে পারি। সামান্য কয়েকটা

pathagar.net

টাকার লোভে সে আমাকে স্থানান্তরিত করেছিল। আমার থাকা-খাওয়া বাবদ-খরচটা আলাদাভাবে আদায় করছিলেন রুস্তমজী শের রাজসরকার থেকে। বস্তুত আমি নাকি রাজ-অতিথি হিসাবেই ছিলাম ও বাড়িতে। যে কটা টাকা রুস্তমজীকে দিয়েছি সেটা আমার নির্বুদ্ধিতার আক্কেল সেলামী!

…প্রিয়দা তন্ময় হয়ে গল্প করছিল। হঠাৎ ওর আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। ঘড়ি দেখে বললে: রাত এগারোটা বাজছে রে নরেন। এবার ওঠ। কাল সকালের ট্রেনেই আমাকে ফিরতে হবে মাইথন।

আমি বললুম: সে কি? তোমার গল্পটা?

প্রিয়দা একটু ইতস্তত করে বললে: সে ব্যবস্থাও করতে পারি—কিন্তু তোকে একটা প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

বললুম: ব্যবস্থাটাই বা তুমি কি করবে, আর প্রতিশ্রুতিটাই বা আমি কি দেব?

আমার গত বছরের ডায়েরিটা তোকে পাঠিয়ে দেব। ঠিক ডায়েরি নয়, রোজনামচার আকারে আমার প্রথম চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতাটা লেখা আছে তাতে। আর প্রতিশ্রুতি এই দিতে হবে যে তোর কোন গল্প উপন্যাসে এসব কথা লিখতে পারবি না।

আমি রাগ করে বললুম: থাক দরকার নেই তোমার রোজ-নামচায়। যেটুকু বলেছ তারপর বানিয়ে বানিয়ে আমি শেষ করতে পারব।

প্রিয়দা ঘাবড়ে গিয়ে চেপে ধরল আমার হাতটা: এই না, পাগলামি করিস না।

আচ্ছা, ছাপার অক্ষরকে তোমার এত ভয় কেন বলত?

ওরে বাস। তাহ'লে লোকসমাজে আর মুখ দেখাতে পারব না।

বেশ, কথা দিলাম—তোমার কাহিনী নিয়ে কিছু লিখব না আমি। লজ্জা পেতে হবে না তোমাকে।

কথা দিলি কিন্তু!

pathagar.net

দিলাম।

তাহলে ওঠ।

আর একটু বসলেই কিন্তু ঐ হাইকোর্টের মাথায় ব্যুটস্-মণ্ডল উঠে আসবে। উঠবে আর্কটেরাস।

কে, স্বাতী? না, স্বাতী আর উঠবে না আমার আকাশে!

প্রিয়দা তার কথা রেখেছিল; রেজেস্ট্রি-ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল তার রোজনামচা। বিবর্ণ কাগজের বাণ্ডিলটা আজও আছে আমার কাছে। প্রিয়দার যে এমন লিখবার হাত ছিল জানতুম না। মাঝে মাঝে লুকিয়ে সে কবিতা লিখত, ছবিও আঁকত—কিন্তু এমন গদ্য যে ধৈর্য ধরে লিখতে পারে তা আন্দাজ করতে পারিনি। প্রিয়দার মূল রোজনামচার সাহায্যে এ কাহিনীকে খানিকটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক।

৪ঠা জুলাই ১৯৪৭, রত্নাবাঈ গেস্ট-হাউস। আজ তিন দিন হল এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছি রুস্তমজীর অনুরোধে। রত্নাবাঈ বর্তমান রাজার জননী। তাঁর নামেই পান্থাবাস। দ্বিতল বাড়ি। দোতলায় আমাকে যে ঘরখানি ছেড়ে দিয়েছে কেয়ারটেকার রুস্তমজী শের সেটি আকারে ছোট, কিন্তু আরামদায়ক। ঘরে একটিমাত্র দরজা। দুটি জানালা। গরাদ নেই। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে দেখা যায় ফ্রেমে বাঁধানো রুক্ষ প্রকৃতির একটা ল্যাণ্ডস্কেপ। লাল কাঁকরে মাটির উঁচু-নিচু ডাঙা জমি। ইতস্তত ছড়ানো ছোট বড় পাথর—দিগন্ত-আড়াল করা একটা ছোট্ট টিলা। আধমাইলও হবে না এখান থেকে। গরুর গাড়ির একটা সড়ক বাঁক ঘুরে হারিয়ে গেছে টিলার ওপারে। সমান্তরাল তার দুটি দাগ। এঘরের লাগাও বাথরুম নেই। লাগাও বাথরুম আছে সামনের ঘরখানায়। সেখানা কুমার বাহাদুর, দেওয়ানজী বা মহারাজা স্বয়ং এলেই খোলা হয়।

তা অসুবিধা নেই কিছু। রুস্তমজীর সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিচের বাথরুমটা ব্যবহার করা কষ্টকর নয়। রুস্তমজী বিপত্নীক। জেনানা বলতে একটিমাত্র মেয়ে আছে তার পরিবারে। সেই যে মেয়েটি প্রথম দিন আমাদের কফি পরিবেশন করেছিল। রাত থাকতেই সে স্নানাগারের প্রয়োজন মিটিয়ে ফেলে। খিদমত করার লোকের অভাব নেই। বাগানের জন্য মালীই আছে দু-তিনজন। তাদেরই একজন, শিউনন্দন, সকালবেলা এসে খবর দিয়ে যায় বাথরুম খালি। শিউনন্দনই প্রভাতী নাস্তাটা পৌঁছে দিয়ে যায় আমার ঘরে। সকাল সাতটার মধ্যেই বার হয়ে পড়ি জীপ নিয়ে। জরীপ করতে। মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থা করে রামালু। সন্ধ্যায় ফিরে আসি এই পাষাণপুরীতে। হ্যাঁ, পাষাণপুরীই। কেমন যেন বুক চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস আটকে আছে এ পাথরের প্রতিরন্ধ্রে। রাত্রে শিউনন্দনই পৌঁছে দিয়ে যায় নৈশ আহার, আমার ঘরে। ড্রেসিং টেবিল ছাড়া ছোট, একটি টেবিল আর চেয়ার আছে। সেটাই আমার ড্রাইনিং স্পেস্। রুস্তমজীর সঙ্গে বড় একটা দেখা হয় না। তাতে আমার অবশ্য দুঃখ নেই। কেন জানি না লোকটাকে আমার প্রথম দিন থেকেই ভাল লাগেনি। কোন কারণ নেই। বেশ দিলদরিয়া মানুষ। যতদূর সম্ভব আমার উপকারই করেছে, কিন্তু তবু লোকটাকে আমি ঠিক পছন্দ করতে পারছি না।

কিন্তু রুস্তমজী ছাড়া তো এ বাড়িতে আরও লোক আছে? চোখের দেখা পাইনি তার এ তিন দিনে একবারও—যদিও তার অস্তিত্বটা অনুভব করতে পারি। রোজই দিনান্তে ফিরে এসে অনুভব করি আমার ঘরে কেউ এসেছিল। সকালবেলা যে মশারীটাকে উটাকার রেখে গেছি সেটা পরিপাটি করে টাঙানো। বিছানার চাদরটা টান-টান করে পাতা। বইখাতাপত্রগুলো ঠিক ঠিক গোছানো। টেবিলের উপর কাঁচের গ্লাসে টাটকা ফুল। এ কাজগুলো শিউনন্দনের পক্ষে করা মোটেই অসম্ভব নয়। তবু বিশ্বাস করতে মন চায়, যেন শিউনন্দন

ছাড়া আর কারও হাতের স্পর্শ লেগে আছে আমার বিছানার চাদরে ফুলের তোড়ায়, ঘরের আনাচে-কানাচে। মাঝে মাঝে মনকে ধমক দিই—এসব কী অবান্তর চিন্তা! মন ব্যাটা ভারি পাজি; উল্টে বলে কই তোমার জ্বর-জ্বারি হচ্ছে না তো?

আমি মনকে ধমক দিই: যাট বালাই। বিদেশ-বিভুঁয়ে জ্বর-জ্বারি হতে যাবে কেন খামোকা?

মন মুখ টিপে হেসে বলে: গল্পউপন্যাসে পড়নি, এক্ষেত্রে তোমার একদিন প্রবল জ্বর আসার কথা। তারপর জ্বরের ঘোরে হঠাৎ দেখবে সেবানম্র একটি সন্নত মুখ, চোখ বুজেই কপালে অনুভব করবে একটি শীতল করের স্পর্শ!

আমি শ্লাইড রুল নিয়ে মনকে তাড়া করি। আর মন বেচারী বেগতিক দেখে অবচেতনের আড়ালে ডুব মারে, মার খাওয়ার ভয়ে।

৭ই জুলাই, ৪৭—কাল একটা অদ্ভুত জিনিস আবিষ্কার করেছি। সন্ধ্যার পর সময় কাটে না। বারান্দায় পায়চারি করি ক্রমাগত। হল-কামরার সঙ্গে একটা কাচের গা আলমারি আছে। তালাবন্ধ নয়। সেটা খুলতে নজরে পড়ল এক গাদা বিলাতী ম্যাগাজিন। ছবির বই বেশী। শিকারের, খেলার, ব্যালে নাচের। হাতড়াতে হাতড়াতে তার মধ্যে হঠাৎ পেয়ে গেলাম খবরের কাগজে জড়ানো একটা বাঙলা বই। শরৎচন্দ্রের চন্দ্রনাথ! তাজ্জব কী বাত! এদেশে চন্দ্রনাথ এল কেমন করে! প্রথম পাতাটা খুলতেই দেখি মেয়েলি হাতের লেখা 'অঞ্জনা রায়'। ঠিকানা নেই, সাল-তারিখ কিছু নেই। বাঙলা হরফ কিন্তু। নিয়ে এলাম বইখানা। বহুবার পড়া বই। রাত জেগে আবার তাই পড়লাম। ভাবলাম কাল খোঁজ নিতে হবে 'অঞ্জনা' কার নাম। শিউনন্দন না পারলেও রুস্তমজী হয়তো বলতে পারবে। আজ সকালে সে কথা রুস্তমজীকে প্রশ্ন করতেই হঠাৎ ফোঁস করে উঠল লোকটা। বললে: আমাকে না বলে ওসব আলমারিতে হাত দেবেন না!

pathagar.net

আমি আহত হয়ে বললুম : চুরি করিনি। বাঙলা বই দেখে পড়তে এনেছিলাম। যাক, নিয়ে যাও তুমি।

রুস্তমজীও নরম হয়ে বললে : না, না, কিছু মনে ক'র না। এনেছ যখন, পড় না। পড়লে ক্ষতি কি, তবে কি জান, অনেক জরুরী জিনিস ওর ভিতরে থাকে কিনা।

আমি আর কিছু বললাম না। কিন্তু এটুকু বুঝলাম—রুস্তমজী অঞ্জনা রায়ের বিষয়ে কোন আলোচনা করতে নারাজ। ঐটুকু সূত্র থেকে কোন কিছু উদ্ধার করা যায় না। তবে লক্ষ্য করে দেখলাম যে কাগজখানা জড়িয়ে বইটাতে মলাট দেওয়া হয়েছে সেটা প্রায় বছর পনের আগেকার তারিখের।

১০ই জুলাই, ৪৭—কাজের খবর মোটেই আশাপ্রদ নয়। আজ আমাদের জরীপের সপ্তদশ দিন। গত মাসের তেইশে আমরা এসেছি এখানে। এখনও থিয়োডোলাইট এসে পৌঁছায়নি। গুরুবচন মেহতার কোন পাত্তা নেই। কলকাতা থেকেও কোন নির্দেশ আসেনি ইতিমধ্যে। এদের সবকিছুই কেমন যেন রহস্যঘন। ইতিমধ্যে কলকাতা অফিসে খান দুই চিঠি লিখে জবাব পাইনি। এমন কি প্রথম দিন যে টেলিগ্রাম করেছিলাম তারও কোন জবাব আসেনি।

এরা ভেবেছে কি ? বারো শ' একর জমি জরীপ করাতে চায়। বলছে কাজটা জরুরী। অথচ যন্ত্রপাতি দেবে না। সাহায্য করবে না। গুরুবচন মেহতাও পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এ তো আচ্ছা পাগলদের পাল্লায় পড়েছি দেখছি ? কাল ভাবছি আবার একখানা, টেলিগ্রাফ করব প্রি-পেড।

২২শে জুলাই, ৪৭—আজকের দিনটা অদ্ভুত। ক'দিন ডায়েরি লেখা হয়নি। লেখার মতো বিষয়বস্তুও বিশেষ কিছু ছিল না। নিতান্তই খোড়-বড়ি-খাড়ার জীবন। সকালে যাই জরীপ করতে। রাত্রে ফিরে ঘুমাই। আজকের দিনটা তার ব্যতিক্রম। দিনটা শুরু

pathagar.net

হয়েছিল আর পাঁচটা মামুলি দিনের মতোই। কিন্তু শেষ হল বেশ একটা ক্লাইম্যাক্সে। নাটকটা জমতে শুরু করল সন্ধ্যা নাগাদ।

সারাদিন কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যাবেলা রামালুর কাছে বিদায় নিলাম। সচরাচর যে পথে ফিরি সে পথে না ফিরে মিশিরকে বললাম টুংরির ধার দিয়ে ফিরতে। কাল থেকে এদিকে সার্ভে শুরু হবে। ফেরার পথে দু-একটা স্টেশন নির্বাচন করে যাবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু টুংরির ধারে এসে একটা অদ্ভুত জিনিস আমার নজরে পড়ল। নদীর ধারে কে বা কারা সম্প্রতি একটা গর্ত খুঁড়েছে। জীপটা থামিয়ে এগিয়ে গেলাম সেদিকে। গর্তটা আকারে ছোট—তিন-চার হাত ব্যাস হতে পারে। গভীরতায় ফুট পাঁচেক। স্তূপীকৃত পাথুরে মাটি পড়ে আছে চারদিকে। আশ্চর্য, এ পথে আমি আগেও এসেছি। মাত্র তিন দিন আগেও এসেছিলাম। তখন তো গর্তটা ছিল না। কে খুঁড়ছে এটা? কেনই বা খুঁড়েছে? এমন শক্ত জমিতে এ গর্ত খুঁড়তে হলে চার-পাঁচজন জোয়ান মানুষকে অন্তত। ছয়-সাত ঘণ্টা খাটতে হবে। আমাদের ক্যাম্প থেকে এ জায়গাটা অবশ্য দেখা যায় না—মাঝখানে জমিটা বেশ উঁচু কিন্তু তাহলেও আমরা টের পাব না? আর টের না পেলেই বা কি? গর্ত খোঁড়ার উদ্দেশ্যটা কি হতে পারে? লক্ষ্য করলাম মিশিরজীও অবাক হয়েছে। ঘুরে ফিরে গর্তটাকে সেও দেখল। এদিকে কোন গ্রাম নেই। পাথুরে আউট-ক্রপ। চাষ-আবাদও হয় না। হঠাৎ মাঠের মাঝে এমন শক্ত পাথুরে মাটিতে একদল লোক এসে খামোকা গর্ত খুঁড়ে রেখে যাবে কেন তা কিছুতেই বুঝতে পারলুম না। চলে আসছি, হঠাৎ আর একটা জিনিসে দৃষ্টি আটকে গেল আমার। পাথরের স্তূপ থেকে জিনিসটা তুলে নিলাম। বোধকরি 'জেনিথে' ভেনাসকে দেখতে পেলেও এতটা আশ্চর্য হতাম না। জিনিসটা শূন্যগর্ভ একটা গোল্ডফ্লেক সিগারেটের প্যাকেট। গোল্ডফ্লেক আমি খাই না।

pathagar.net

রুস্তমজী খায় 'পাসিং শো'! জ্যাক গ্রে পাইপ খায়। রামালু যতদূর জানি আদৌ ধূমপান করে না। তাহলে?

মিশিরকে বললুম জীপের মুখ ঘোরাতে। তাঁবুতে ফিরে যাব! এ রহস্যের একটা কিনারা হওয়া দরকার। দেখি, রামালু কি বলে। লোকটা চতুর, সন্ধানী—তার মতামতটাই আগে নেওয়া যাক। মিশিরকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে রামালুকে নিয়ে তাঁবুতে ঢুকলাম। রামালু অবাক হল। অবাক হল আমার ফিরে আসায়, গোল্ডফ্লেকের খালি প্যাকেট দেখে ততটা নয়। বললুম: এ প্যাকেট তুমি ফেলেছ?

আমি সিগারেট খাই না স্যার।

আমি ধমক দিয়ে উঠলুম: বাজে কথা বোলো না রামালু। আর তাছাড়া তুমি কিছু স্কুলের ছেলে নও যে, সিগারেট খেলে আমি রাগ করব।

রামালু জবাব দিল না। নিঃশব্দে উঠে গেল। তাঁবুর ও কোণা থেকে নিয়ে এল একটা খালি টিনের কৌটা। সেটা আমার হাতে দিয়ে বললে: এটাও আমি কুড়িয়ে পেয়েছি এ মাঠে। এটাও কি আমি খেয়েছি বলতে চান?

টিন্‌ড্ হ্যামের একটি খালি কৌটা। মিলিটারি ডিস্‌পোজালের মাল। রামালু নিরামিষাশী। দাক্ষিণাত্যের গোঁড়া পরিবারের ছেলে।

আমি বললুম: তা'হলে?

একটু ইতস্তত করে রামালু যা বললে তা ওর কাছে মোটেই আশা করিনি। বললে: কি জানি স্যার, তবে এ ডেনমার্কে কোথাও কিছু পচেছে মনে হচ্ছে।

তার মানে?

কথাটা আপনাকে রোজই বলব বলব ভাবি—

কি এমন কথা?

আমার কেমন যেন ভাল লাগছে না স্যার। তিন সপ্তাহের

pathagar.net

মধ্যেই দেশ তো স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে! কারিগরী কাজ জানা মানুষ নিশ্চয়ই বসে থাকবে না। কত নূতন নূতন প্রজেক্ট হবে এবার! আসুন, আমরা এ চাকরি ছেড়ে দিই।

কাটখোট্টা নটরাজা রামালুর মুখে শেক্সপীয়র শুনে যতটা অবাক হয়েছিলাম এবার তার চেয়ে বেশী বিচলিত হতে হল। এ যে একেবারে ভূতের মুখে রাম নাম। রামালু নিজে থেকে চাকরি ছেড়ে দিতে চাইছে!

বললুম: হল কি তোমার?

এদের, স্যার, কোন বদ মতলব আছে। আমাদের জরীপ করতে পাঠিয়েছে, যন্ত্র দিচ্ছে না। অতবড় অফিস খুলেছে অথচ কোন কাজ নেই। আপনাকে আমেরিকা পাঠাচ্ছে মেশিন ডেলিভারি নিতে, মায় পাসপোর্ট ফটো পর্যন্ত তৈরী, এদিকে শ্রীনিবাসন বলে মেশিনের অর্ডারই দেওয়া হয়নি কোন ফার্মকে।

শ্রীনিবাসন কে?

আমাদের, সেক্রেটারীর স্টেনো-কাম-কনফিডেন্সিয়াল ক্লার্ক। তাছাড়া স্যার, এখানে আমরা ছাড়াও আর একটা সার্ভে পার্টি কাজ করছে। গতকাল আমি টুংরি নালায় পেট্রম্যাক্স বাতি জ্বলছে দেখেছি। গুরুবচন ভবানীনগরে নেই—ওই ওঁরাও গাঁয়ে লুকিয়ে বসে আছে। আখালী আমার কাছে কবুল করেছে।

সবটা মিলে কি বলতে চাইছ তুমি?

আপনি একবার ভবানীনগরে যান স্যার। কুমার বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করুন। অবস্থা বুঝলে সব কথা খুলে বলুন। আর অবস্থা বেগতিক দেখলে থিয়োডোলাইটের তাগাদা দিয়ে ফিরে আসুন।

রাজধানীতে যাবার কথা আমিও কদিন ধরে চিন্তা করছি। এমন অবস্থায় আমার পক্ষে ভবানীনগরে গিয়ে হাজির হওয়া অযৌক্তিক হবে না। কিন্তু একা যেতে ভরসা পেলাম না। রামালু চৌকস ছেলে। তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।



pathagar.net

সে কথা বলতেই ও বললে : কিন্তু জরীপ যে বন্ধ থাকবে স্যার।

বন্ধ থাকবে কেন? কাল হাটবার। এমনিতেই মজুরদের ছুটি। কাল সন্ধ্যের মধ্যেই আমরা ফিরে আসব।

রামালু রাজী হল। আখালী আর ঝামরুকে সব বুঝিয়ে দিয়ে আমরা ফিরে এলাম গেস্ট-হাউসে। সেখানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল একটা নতুন ঘটনাচক্র। গেস্ট-হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কালো শেভ্রলেখানা। দ্বিতলের কোণার দিকের ঘর থেকে দেখা যাচ্ছে নীলচে আলোর একটা রেখা। হল-কামরায় পেট্রম্যাক্স জ্বলছে। সংবাদ পেলাম কুমার বাহাদুর আর দেওয়ানজী এসেছেন আজ বিকালে। রাত্রি আটটার ট্রেনে ওঁরা দিল্লী যাচ্ছেন। পঁচিশে জুলাইয়ের কন্‌ফারেন্সে।

রামালু আমার সঙ্গে দ্বিতলে এল না। বললে : আপনি বিশ্রাম করুন গে। আমি একটু খোঁজখবর নিয়ে এখনই আসছি।

আমার ঘরে দরজা বন্ধই ছিল। একটা চাবি থাকে শিউনন্দনের কাছে, একটা আমার কাছে। তালা খুলে ঘরে ঢুকে দেখি যথারীতি টেবিলের উপর কেরোসিনের সেজবাতি জ্বলছে। আজ আর আমার বিছানা কেউ সাফ করে রাখেনি। কাচের গ্লাসে গতকালকার বাসি ফুলের গুচ্ছটাই মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছে। বোধকরি যারা আমার ঘরে তদ্বির-তল্লাস করে আজ বিশিষ্ট অতিথিদের অভ্যাগমে তারা অন্যত্র বিব্রত। জুতো-জামা খুলে শুতে যাব হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে শিউ-নন্দন এসে হাজির। বলে কুমার বাহাদুর আপনাকে সেলাম দিয়েছেন সাব।—তারপর একটু ইতস্তত করে বলে : কুমার বাহাদুরের মেজাজটা ভাল নেই সাব।

···প্রিয়দার রোজনামচার এ অংশটা আমার জানা ছিল। বি. ই. কলেজের রি-ইউনিয়নের দিন বলেছিল। পাতা উল্টে গেলাম তাই। আশ্চর্য, এ দিনের রোজনামচার শেষে কিন্তু রুস্তমজী আর রঞ্জনার নাম নেই। কিন্তু তাই তো হবে; রাত এগারটার আগে ডায়েরি



pathagar.net

লিখে সে শুয়ে পড়েছিল। তারপর তার ঘরে ঢোকে ওরা। এই তো পরের দিনই প্রিয়দা লিখেছে :

২৪শে জুলাই, ৪৭—কাল ডায়েরিতে লিখেছি কালকের নাটকের ক্লাইম্যাক্স হয়েছে সন্ধ্যায়। তখন জানতাম না—ডায়েরি লিখে শুতে যাবার পরেও আর একটা ক্লাইম্যাক্স বাকি আছে। মধ্যরাত্রে হানা দিল রুস্তমজী। আর মদের ঝোঁকে আমাকে আর রঞ্জনাকে বন্দী করে রেখে গেল ঘরে। ও শুয়ে থাকল মাটিতে আমি পড়ে রইলাম খাটে। দুরন্ত কৌতূহল হচ্ছিল জানতে—রঞ্জনা কে, কেমন করে সে এসে পড়েছে ঐ মদ্যপ মানুষটার খপ্পরে, কিন্তু সে কৌতূহল চরিতার্থ করবার সুযোগ পাইনি। আপাদমস্তক আঁচলে ঢেকে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরে পড়ে রইল রঞ্জনা।

আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ আচমকা ঘুমটা ভেঙে গেল একেবারে শেষরাতের দিকে। দেখি চৌকির পায়ার কাছে চুপ করে বসে আছে রঞ্জনা দেওয়ালে পিঠ দিয়ে। আমাকে চোখ মেলে তাকাতে দেখেই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল আবার গুড়ি মেরে। বোধকরি মুখে বললেও সে আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি। নারীর সহজাত প্রবৃত্তি ওকে সাবধান হতে বলেছে। তাই সমস্ত রাত জেগে বসে আছে প্রভাতের প্রতীক্ষায়। মনে হল এমন আশ্চর্য রাত বুঝি ওর জীবনেও আসেনি ইতিপূর্বে। ও যদি অনাত্রাতা না হত তাহলে এমনভাবে সারারাত জেগে পাহারা দিত না। ইচ্ছা সত্ত্বেও কোন কথা আর বললুম না।

ঘুম ভাঙলো ভোরবেলায়। দরজা খোলা। ঘরে দ্বিতীয়-প্রাণী নেই। মেজের শূন্য স্থানটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। অশ্রুর চিহ্নটুকু পর্যন্ত শুকিয়ে শেষ হয়ে গেছে। মনে হল সবটাই দুঃস্বপ্ন বুঝি। যেন গতরাত্রিটা কোন একটি অপরিচিতার সঙ্গে একঘরে কাটেনি আমার। যেন সবটাই আমার উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা।

মুখ হাত ধুয়ে নিতে নিতেই ঘরে এল রঞ্জনা। তার হাতে



pathagar.net

আমার প্রাতরাশ। এটা শিউনন্দনের নিত্যকর্মপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। একটু অবাক হয়ে তাই আমাকে বলতে হল : শিউনন্দন কোথায়?

কাল রাত্রের আতঙ্কতাড়িত রঞ্জনার সঙ্গে আজ সকালবেলাকার রঞ্জনার প্রভেদ আকাশ-পাতাল। স্নানান্তে ভিজে চুল মেলে দিয়েছে পিঠে। কপালে ম্যানেজন্টা রঙের গোলাকৃতি একটা টিপ। আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সে আনতমুখে খাবারগুলো সাজিয়ে রাখতে থাকে আমার টেবিলে। চাপাটি, আলুমটরের তরকারি, ব্যাসমের বড়া বা ভাজি।

আবার বললুম : শিউনন্দন নেই?

লাজুক লাজুক চোখে তাকাল রঞ্জু আমার মুখের দিকে। সে চোখে লেগে আছে কৌতুকের ছিটে। চোখাচোখি হতেই মুখটা নিচু করে বললে : ক্যা ময় অচ্ছুৎ হুঁ?

আমি হেসে উঠলুম হোহো করে। ও অপ্রস্তুত। হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে বলি : তুমি যে অচ্ছুৎ তা তুমি জান না নাকি?

হঠাৎ যেন একেবারে নিবে গেল সদ্যোস্নাতার প্রভাতী প্রফুল্লতা! মুখটা ম্লান হয়ে গেল। আমতা-আমতা করে বললে : কিন্তু আপনি তো আমার হাতে খান। আমিই খানা তৈরি করি রোজ—শিউনন্দন নিয়ে আসে শুধু।

বললুম : তোমার ছোঁয়া আমি খাব না তাতো বলিনি। তাহলেও তুমি অচ্ছুৎ তো?

রঞ্জনা রীতিমতো বিহ্বল হয়ে পড়েছে। আর কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। তাই রহস্যটা পরিষ্কার করে দিয়ে বলি : অচ্ছুৎ কে? যাকে ছোঁওয়া যায় না। তুমি অচ্ছুৎ, কারণ কাল সারারাতের মধ্যে তোমাকে আমি ছুঁতে পারিনি।

এক ঝাঁক কুন্দ ফুল ফুটে উঠল ওর সুন্দর মুখে। তারপরেই কি জানি কেন ভীষণ লজ্জা পেল মেয়েটি। 'আপনার কফিটা নিয়ে আসি' কথা ক'টা কোনক্রমে ছুঁড়ে দিয়ে প্রায় ছুটেই পালালো।

pathagar.net

আমি গিয়ে বসলুম খাবার টেবিলে। স্থির করলুম এখনই জেনে নিতে হবে সব কথা। রঞ্জনার গোপন ইতিহাস। রুস্তমজী বলেছিল, ও সাধারণ জনপদবধূর কন্যা। কিন্তু রুস্তমজীর খপ্পরে সে এসে পড়ল কেমন করে?

একটু পরেই কফির ট্রে-টা নিয়ে রঞ্জনা ফিরে এল। আমার ঘরে তার খাবার-কফি নিয়ে আসা এই প্রথম। বোধকরি গতকাল রাত্রে আমার শুভবুদ্ধি যে দ্বৈরথ সমরে হারিয়ে দিয়েছিল অন্তরবাসী বর্বর-টাকে, এ বার্তা পৌঁছে গেছে রঞ্জনার অন্তরেও। এই খাবার-কফি স্বহস্তে পরিবেশনটা হচ্ছে সেই ভদ্রমনের ট্রফি।

কোন ভূমিকা না করে সরাসরি বললুম: কাল রাত্রে তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করেছি, তুমি জবাব দাওনি, বলেছিলে তুমি ক্লান্ত। আজ সকালে বলবে?

কফি ঢালতে ঢালতে ও নিচু মুখে বললে: কি প্রশ্ন?

রুস্তমজীর সঙ্গে তোমার কোনও রক্তের সম্পর্ক আছে?

না।

তা রুস্তমজী তোমাকে নিজেই বিয়ে করেনি কেন? তোমার আপত্তি?

আড়চোখে আমাকে একবার দেখে নিয়ে বললে: আপত্তি থাকাটা কি অন্যায়?

না, অন্যায় কেন হবে? তা, বাধাটা কি বয়সের?

যদি বলি তাই।

রুস্তমজী তোমার চেয়ে কত বড়?

তা বছর আঠাশ।

কত বয়স হবে রুস্তমজীর?

রঞ্জনা মুখ টিপে হাসল। হাসলে ওর গালে টোল পড়ে বলেই কি ও মাঝে মাঝে এমন মুখ টিপে হাসে? না হলে এ হাসির মানে কি?

pathagar.net

কি হল ? বললে না ?

রঞ্জনা মুখ নিচু করেই বললে : আমার সাথে আর ভদ্রতা করতে হবে না। যা জানতে চান খোলাখুলি প্রশ্ন করতে পারেন। আমার বয়স উনিশ।

আমি গম্ভীর হয়ে বললুম : তোমার বয়স তো জানতে চাইনি।

সুর্মাটানা একজোড়া কাজলকালো চোখ আমার মুখের উপর মেলে ও বললে : আপনি কি শুধু বিয়োগ অঙ্কই জানেন, যোগ অঙ্ক জানেন না ? কেমনতর এঞ্জিনিয়ার আপনি !—আবার মুখ টিপে হাসে ও !

তার মানে ?

তার মানে রুস্তমজীর বয়স বললে তা-থেকে আঠাশ বছর বিয়োগ দিয়ে আমার বয়সের হিসাব জুড়তে জানেন, আর আমার বয়স উনিশ হলে ওর সাতচল্লিশ হয় এটুকু বোঝেন না ?

লাজুক প্রকৃতির মেয়ে বলেই মনে হয়েছিল ওকে। এমন মুখরার মতো মুখে মুখে কথা বলতে পারবে তা যেন ঠিক আন্দাজ করতে পারিনি। এবার আমাকেও একটু মুখর হতে হল।

বললুম : বুঝলাম। কিন্তু তাহলে সে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করছে না কেন ?

আমার মতো মেয়েকে কে বিয়ে করবে বলুন ?

বিনয় ?

মানে ?

মানে, তুমি যে খাপসুরৎ এটা আমার মুখ থেকে শুনতে চাও ?

হঠাৎ কি হল ওর। রুখে উঠল একেবারে : না, চাই না ! ও কথাটা এতজন এতবার বলেছে আমাকে, যে কথাটা শুনলেই আমার গায়ের মধ্যে পাক দিয়ে ওঠে।

আমি চুপ করে গেলুম। একটু পরে রঞ্জনাই ফের বললে :

pathagar.net

আপনাদের কথা শুনলে আমার সাহেবজীর পোলট্রির কথা মনে পড়ে। খদ্দেররা এসে ওর মুরগীগুলোর প্রশংসা করত সবাই। বলত —কী খাপসুরৎ লেগহর্ন!

বললুম: সাহেবজী কে?

একটু থেমে রঞ্জনা বললে: যাঁর কাছে আমার মা থাকতেন।

একটু পরেই এল রুস্তমজী। রঞ্জনাকে আমার ঘরে দেখে একটু বোধহয় বিস্মিত হল। সামলে নিল মুহূর্তে। শূন্য খাবারের থালাটা তুলে নিয়ে রঞ্জনা চলে গেল ভিতরে। রুস্তমজী এসে বসল আমার চৌকিতে। দেখলুম শুধু রঞ্জনাই নয়, কাল রাতের রুস্তমজীর সঙ্গে আজ সকালের রুস্তমজীর প্রভেদটাও আসমানজমীন। রুস্তমজী সুপ্রভাত জানালো আমাকে, তারপর বললে: কাল রাত্রের দুর্ঘটনার জন্য কিছু মনে ক'র না।

আমি জবাব দিলুম না।

একটু হেসে আবার বলে: তাও বলি বাবুজী। তুমি কোন কাজের নও! একেবারে ছেলেমানুষ।

এ কথা কেন?

ভোররাতে নেশা ছুটে গেলে মনে পড়ল সব কথা। তোমার দরজা খুলে দিতে এসে দেখি—তুমি শুয়ে আছ চৌকিতে, আর রঞ্জু পড়ে আছে মাটিতে। একটা গোটা রাতের মধ্যেও—তুমি কোন কাজের নও!

গম্ভীর হয়ে বললুম: রুস্তমজী কাল রাত্রে তুমি যে অমানুষিক ব্যবহার করেছ তার জন্য আমি তোমাকে কোন তিরস্কার করিনি। কারণ কাল তুমি যা করেছ তা মদের ঝোঁকে করেছ। কিন্তু আজ স্বাভাবিক অবস্থায় তুমি যে কুৎসিত ইঙ্গিত করলে তার জন্য আমি বলতে বাধ্য—তুমি বর্বর?

রুস্তমজী হাসল। প্যান্টের পকেট থেকে বার করল এক প্যাকেট সিগারেট। নিজে একটা বার করে নিয়ে প্যাকেটটা বাড়িয়ে ধরলে আমার দিকে। আমি অস্বীকৃতি জানাতে প্যাকেটটা আবার পকেটে

pathagar.net

পুরে বার করলে একটা লাইটার। সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে : বাবুজী, তোমাকে আমি দোষ দেব না। আমি যদি তোমার অবস্থায় পড়তুম তাহলে আমিও বলতুম—বর্বর! কিন্তু তুমি যদি আমার অবস্থায় পড়তে তাহলে কাল রাতে আমি যা করেছি, তুমিও তাই করতে।

আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বললুম : না! তুমি ভুল করছ। আমি কোন অবস্থাতেই আমার আশ্রিতা একটি মেয়েকে এভাবে নির্যাতন করতুম না। অন্‌জান পুরুষমানুষের সঙ্গে রাত্রিবাসে বাধ্য করতুম না। তুমি অতি নীচ।

ও বারকয়েক নিঃশব্দে টান দিল সিগারেটে। তারপর বললে : আগে সব কথা শোন ভাই, তারপর না হয় তিরস্কার ক'র আমাকে।

একদৃষ্টে জানালার বাইরে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ সেই রুক্ষপ্রকৃতির দিকে। তারপর আপন মনেই শুরু করলে তার কাহিনী। রঞ্জুবিবির উপাখ্যান।

যৌবনে রুস্তমজী শের পূর্ব-বাঙলার একটি মহকুমা শহরে একজন বর্ধিষ্ণু বাঙালী ডাক্তারের বাড়ি কাজ করত। ড্রাইভারের চাকরি। ডাক্তার বাবুর পসার বেশ ভাল। ডাক্তারবাবুকে নিয়ে রাতবিরেতে কলে যেতে হত ওকে। ভদ্রলোক বিপত্নীক। সংসারে ছিলেন ডাক্তারবাবুর বৃদ্ধা মা, একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। মেয়েটি ছিল ডাকসাইটে সুন্দরী। সারা শহর চিনত তাকে। তখন কতই বা বয়স তার—পনের ষোলো। রুস্তমজীরও তখন উঠতি বয়স। রোজ সকালে তাকে গাড়ি করে স্কুলে পৌঁছে দিত। বিকালে নিয়ে আসত স্কুল থেকে।

তারপর একদিন স্কুলে কি একটা দুর্ঘটনা ঘটল। কলঙ্ক রটল মেয়েটির। ডাক্তারবাবু স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে ঘরে নিয়ে বন্দী করলেন মেয়েকে। তাকে ঘর থেকে একেবারে বের হতে দেওয়া হত না। শুধু সন্ধ্যায় রুস্তমজী তাকে একটু হাওয়া খাইয়ে নিয়ে আসত। সঙ্গে থাকত হয় ওর ছোট ভাই, নয় ঠাকুমা কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল

pathagar.net

না। একদিন সেই ছেলেটির সঙ্গে গৃহত্যাগকরল মেয়েটি। ডাক্তারবাবু পুলিসে খবর দিলেন। বহু অর্থও ব্যয় করলেন--কিন্তু নিরুদ্দিষ্ট কন্যার সন্ধান পেলেন না। রাগে দুঃখে অপমানে ডাক্তারবাবু শয্যা নিলেন। তাঁর প্র্যাকটিস গেল। ফলে চাকরিও গেল রুস্তমজীর। তারপর দীর্ঘ বিশ বছর সে আর ওদের কোন খবর রাখেনি। নানা দেশে নানা কাজে ঘুরেছে রুস্তম। যুদ্ধে নাম লিখিয়েছিল। ড্রাইভারের চাকরি। ভারতবর্ষের বাইরেও যেতে হয়েছিল তাকে। প্যালেস্টাইন, ঈজিপ্ট—নানা রাজ্য ঘুরে এসেছে। যুদ্ধ একদিন থামল। রুস্তমজীও চাকরি খোয়াল। তখন ও জলন্ধরে। প্রাক্তন সৈনিক হিসাবে নাম লিখিয়েছিল এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে। সেখানেই একদিন খবর পেল ভবানীনগর রাজসরকার তাকে নিয়োগ করতে রাজি। মাত্র গত বৎসরের কথা। সমস্ত ভারতবর্ষে তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা। রুস্তমজীর মিলিটারী পোশাক তখনও একটা ছিল। সেটাই গায়ে চড়িয়ে ফিরে আসছে সে পাঞ্জাব থেকে। যেখানে ট্রেন দাঁড়ায় দেখে অসহায় হিন্দু উদ্‌বাস্তুর মিছিল। ট্রেনে একটু ঠাঁই পাওয়ার জন্য কী তাদের কাকুতি। দেখতে দেখতে আর সকলের মতো রুস্তমজীর মনটাও পাথরে পরিণত হয়েছিল। ট্রেনের কামরায় বসে দেখছিল সে ওদের কাণ্ড প্রতি স্টেশনে। ট্রেনে তিলধারণের স্থান নেই মায় পাদানি, ছাদে লোক; তবুও আরও মানুষ উঠতে চায় গাড়িতে। এমনি একটা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়েছে। ভিড়ের মাঝে হঠাৎ একটি মেয়েকে দেখে চমকে উঠল রুস্তমজী। মেয়েটি ভিড়ের চাপে আকুল হয়ে এদিকে ওদিকে ভেসে বেড়াচ্ছে। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল সে। এ আর কেউ নয়—অঞ্জনা, অঞ্জনা রায়!

আমি বললুম: সেই ডাক্তারবাবুর মেয়ে?

আমার কথা বোধকরি ওর কানে যায়নি। আপন মনেই বলতে থাকে: কিন্তু তা কেমন করে হবে? অঞ্জনাকে আমি বিশ বছর আগে দেখেছি, সদ্যশাড়ি-পরা কিশোরী মেয়ে আর এর বয়সও

pathagar.net

সতের-আঠার। এ অঞ্জনা হতেই পারে না। তবু অদ্ভুত সাদৃশ্য। ট্রেন ছেড়ে দিল। মেয়েটি উঠতে পারল না। আমি এতদূর অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে, আর আত্মসংবরণ করতে পারলাম না। এত কষ্ট করে পাওয়া জায়গাটুকুর মায়া ত্যাগ করে জানালা দিয়ে লাফ দিলাম। চলন্ত ট্রেনের লোকজন হৈ-হৈ করে উঠল। ভ্রূক্ষেপমাত্র করলাম না। ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলাম মেয়েটির দিকে। ভিড়ের চাপে মেয়েটি পড়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে ধরে ফেলে বললাম—অঞ্জনা ?

মেয়েটি একমুহূর্ত আমার দিকে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তার-পর ধীরে ধীরে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললে : না, আমি রঞ্জনা। আপনি বোধহয় আমার মায়ের সঙ্গে আমাকে ভুল করেছেন। আমার মায়ের নাম অঞ্জনা।

অঞ্জনা কোথায় ?

ঐ তো !

মুসাফিরখানার একান্তে বসে আছে অঞ্জনা। ধুঁকছে। কী তার অসুখ তা আমি জানি না—কিন্তু জীবনীশক্তি তার নিঃশেষিত হয়ে এসেছিল। বেশী কথা বলে লাভ নেই। মোট কথা পরের একখানা ট্রেনে মা-মেয়েকে নিয়ে দিল্লি পর্যন্ত এসেছিলাম। অনেক হাত ঘুরেছে অঞ্জনা। অনেক ঘাটে জল খেয়েছে। শেষ পর্যন্ত একজন পাঞ্জাবী হিন্দু মহাজনের রক্ষিতা হয়েছিল লাহোরে। দাঙ্গায় সে ভদ্রলোক মারা পড়েছেন। মেয়েকে নিয়ে প্রাণভয়ে পালাচ্ছিল বেচারী। দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছাতে দুর্বল জরাজীর্ণ মানুষটার জীবনশক্তি সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেল। অঞ্জনা মারা গেল। যাবার আগে আমার হাত দুটি ধরে বললে : রঞ্জুকে তোমার হাতেই দিয়ে গেলাম। ওর বাপ কে তা আমি জানি না। ভদ্রঘরে যে কখনও ওর বিয়ে হবে এ আশা আমি কোনদিন করিনি,—তোমাকেও সে অনুরোধ আমি করব না। যে পাপ আমি করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত ও হতভাগীকেও করতে হবে। শুধু দেখ ও যেন দু-বেলা দু-মুঠো খেতে পায় !

pathagar.net

আমি নিজে বিয়ে সাদি করিনি বাবুজী। এই রাজসরকারে দিন গুজরান করি। রঞ্জুবিবিকে আমি আজ প্রায় একবছর নিজের কাছে রেখেছি। আমার দিকে চেয়ে দেখুন বাবুজী। আমার বয়স এতকম নয় যে, নতুন করে প্রেমে পড়তে চাইব আমি। আবার আমার বয়স এত বেশীও নয় যে, নারীর প্রয়োজন একেবারে অনুভব করব না! তবু ওকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন—আমার কাছে ও কোনদিন কোন দুর্ব্যবহার পায়নি। আমি ওর ধর্মবাপ! কিন্তু তাই বলে কোন ভদ্রসন্তানের জাতই বা আমি মারি কি করে? এ ওর নিয়তি। নিয়তিই বা কেন, এ ওর মায়ের কর্মফল। মায়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে মেয়ে। আমি নিমিত্ত মাত্র। কুমার বাহাদুর ওকে পছন্দ করেছেন, এ ওর সৌভাগ্য। ওর মায়ের কাছে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দু-বেলা দু-মুঠো খেতে দেওয়ার এর চেয়ে কী ভাল ব্যবস্থা আমি করতে পারি বলুন?

নিঃশেষিতপ্রায় সিগারেটটা, জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে রুস্তমজী হাসল, বললে: একবার আপনি বলুন, আপনি এ অবস্থায় পড়লে কি করতেন।

বললুম: আমি হলে চেষ্টা করে দেখতুম তা সত্ত্বেও। আজকাল লেখাপড়া জানা সংস্কারমুক্ত মানুষ অনেক আছে—যারা সবকথা শুনেও হয়তো রাজী হবে ওকে বিয়ে করতে। জাত মারার কথা বলছ তুমি, কিন্তু আজকাল অনেক শিক্ষিত মানুষ আছে যাদের জাত নিয়ে এত পুতপুত নেই।

রুস্তমজী হেসে বললেন: তাই বুঝি। বেশ সে চেষ্টাই করে দেখি। আমার সামনেই একজন লেখাপড়া জানা উচ্চশিক্ষিত সুপাত্র আছেন। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করে দেখি। কী বাবুজী আপনি রাজী আছেন?

হঠাৎ সরাসরি এ প্রশ্নে আমি চমকে উঠলুম। এ কি কথা! এ কথা তো আমি ভেবে দেখিনি। কেন দেখিনি? সঙ্গে সঙ্গে মনে



pathagar.net

পড়ে গেল দাদুকে। নবদ্বীপরত্ন সত্যানন্দ তর্করত্নকে। কথা ফুটল না আমার মুখে।

আচম্‌কা অট্টহাস্য করে উঠল রুস্তমজী। বললে: এত কি ভাবছেন? আমি কি সত্যিই বলছি ওকে সাদি করতে? এসব কথা বলা সহজ, কাজে করা শক্ত। এমন মেয়েকে নিয়ে একরাত ফূর্তি করা চলে, এদের ঘরের বউ করে নিয়ে যাওয়া চলে না। তা কি বুঝি না আমি?

রুস্তমজী উঠে পড়ল। বললে: আজ আমি একটু বাইরে যাচ্ছি তিনদিন পরে ফিরব।

কোথায় যাচ্ছ?

যাচ্ছি সরকারী কাজে। কোথায় যাচ্ছি তাও কাউকে বলতে বারণ। তবে নাকি তুমি বন্ধুলোক; তাই বলে যাচ্ছি। যাব ভূপাল। —সীলমোহরাঙ্কিত একখানা বড় লেফাফা জেবের পকেট থেকে বার করে আমাকে দেখাল, বললে: আমি দূত। অবধ্য এবং অবোধ্য। ভূপালের রাজদরবারে এই পত্র পৌঁছে দিতে হবে। শুধু পৌঁছে দেওয়াই নয়, এর জবাব নিয়ে আমাকে ফিরে আসতে হবে কুমার বাহাদুর আসার আগেই।

বললুম: কাল রাত্রে তুমি বড়লোক হবার কথা কি বলছিলে যেন?

রুস্তমজী আবার হাসলে। বললে: সেসব কথা ছেড়ে দিন বাবুজী। মদের ঝোঁকে কি বলেছি তা কি আর এখন মনে আছে। তবে যাবার আগে একটা কথা আপনাকে বলে যেতে চাই। রঞ্জুবিবিকে আপনার জিম্মায় দিয়ে গেলুম। মনে রাখবেন, ও আমার সম্পত্তি নয়—স্বয়ং কুমার বাহাদুরের। আর মনে রাখবেন—আজ তিনি মাত্র তিন মাসের জেল দিতে পারেন,—তিন সপ্তাহ পরে তিনি কোতল করার প্রকাশ্য হুকুম জারি করতে পারবেন।

কথাটার কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন:

pathagar.net

সত্যপ্রিয় আচার্যের চাকরি জীবনের প্রথম অধ্যায়টা আজ থেকে একযুগ পিছনে। সেদিন যা ছিল সকালের খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার হেডলাইন আজ তা ইতিহাস। আজ তা হয়তো ঝাপসা হয়ে গেছে পাঠকের স্মৃতিতে। তাই সেই যুগান্তকারী দিনগুলোর কথা কিছুটা এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভাল।

উনিশ শ' সাতচল্লিশ সনের উনিশে ফেব্রুয়ারী থেকে শুরু করা যাক। স্থান—নয়াদিল্লিতে বড়লাটের বাড়ির বিশাল ডাইনিং হল। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত খানা-কামরায় বড়লাট বাহাদুর লর্ড ওয়াভেল প্রাতরাশে বসেছেন তাঁর একান্ত-পরামর্শদাতা জর্জ অ্যাবেলকে নিয়ে। ঝক্‌ঝকে ডিনার-সেট, ঝলমলে সাজপোশাকে খিদমদগারের দল ঘোরা ফেরা করছে। প্রাতরাশ যখন মধ্যপথ অতিক্রম করেছে তখন একজন খানসামা আয়নার মতো মসৃণ রূপার পাত্রে সকালের ডাকটা এনে রাখল বড়লাটের সম্মুখে। কিছু খবরের কাগজ, চিঠিপত্র। লর্ড ওয়াভেল সচরাচর ব্রেকফাস্টের পর সে টেবিলে বসেই সকালের ডাকটায় চোখ বুলিয়ে নেন। কিন্তু সেদিন কি হল—'প্রাইভেট অ্যাণ্ড কনফিডেন্সিয়াল' মার্কা একটি সীলমোহরাঙ্কিত খামের উপর নজর আটকে গেল তাঁর। কদিন ধরেই তাঁর মন বলছে—এ চিঠি আসছে। দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীট থেকে এ চিঠি আকাশপথে পাড়ি দিয়ে যে কোন অশুভলগ্নে এসে পৌঁছতে পারে দিল্লির প্রাসাদে। জর্জ অ্যাবেল দেখলেন লর্ড ওয়াভেল ছুরি কাঁটা সরিয়ে রেখে তুলে নিলেন খামটা। রূপার প্লেটেই ছিল খাম খোলার উপযুক্ত ছুরি। অন্যমনস্ক লাট বাহাদুর কিন্তু ডিনার টেবিল থেকেই একটা ছুরি তুলে নিয়ে খামটা খুলে ফেললেন। পড়লেন চিঠিখানা। মুখের একটি পেশীও বিচলিত হল না। চিঠিখানা ভাঁজ-করে, খামে ভরে আবার মনোনিবেশ করলেন ডিমের পোচ-জোড়ার দিকে।

জর্জ অ্যাবেল মিনিট পাঁচেক নীরবে প্রতীক্ষা করে রইলেন, কিন্তু নাঃ, নিঃশব্দে আহার করে চলেছেন লর্ড ওয়াভেল। শেষ পর্যন্ত



pathagar.net

কৌতূহল দমন করতে না পেরে অ্যাবেল বললেন : কোন জরুরী খবর আছে স্যার ?

নির্বিকারভাবে লর্ড ওয়াভেল বলেন : দে হ্যাভ স্যাক্‌ড মি, জর্জ !

ন্যাপকিন দিয়ে ঠোঁটটা মুছে নিয়ে ফের পাদপূরণ করেন—দে ওয়্যার কোয়াইট রাইট, আই সাপোস।

ইতিহাস বোধকরি সাক্ষ্য দেবে লর্ড ওয়াভেলের এই শেষ উক্তিটি যথার্থ নয়।

সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সাম্প্রদায়িকতার রক্তগঙ্গা বইছে। কংগ্রেসের সেদিনও শেষ কথা—কুইট ইণ্ডিয়া। আর মুশ্‌লিম লীগের ধুয়ো—কুইট, বাট ডিভাইট ফার্স্ট। এই পরিবেশে লর্ড ওয়াভেল তাঁর গোপন প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী আর্ল অ্যাটলি সাহেবের কাছে। সে প্রস্তাবের নাম 'অপারেশ এব্‌ টাইড'। তাঁর প্রস্তাব ছিল সমস্ত ব্রিটিশ অফিসারদের পূব থেকে ক্রমশ পশ্চিমে গুটিয়ে আনতে হবে। আসাম বাংলা থেকে বিহার, সেখান থেকে উত্তরপ্রদেশ হয়ে সকলে ক্রমশ এসে জড়ো হবেন বোম্বাই ও করাচিতে। ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে, দলে দলে তাদের ফেরত পাঠাতে হবে স্বদেশে। এই উজানপন্থী প্রস্তাব না সমর্থন পেল ভারতে, না বিলাতে। ভারতীয় সেনা-বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল অচিনলেকের মতে এ পলায়নী মনো-বৃত্তি ঘৃণার্হ। অ্যাটলিও এ প্রস্তাব পেশ করতে সাহস পেলেন না পার্লামেণ্টে—যে পার্লামেণ্টের দেওয়ালে দেওয়ালে তখন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে উইনস্টন চার্চিলের শেষ হুকার—হিস্‌ ম্যাজেস্টিস্‌ গভর্নমেণ্টকে দেউলিয়া করবার অঙ্গীকার নিয়ে আমি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিনি !

ফলে লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব অন্তিমগতি লাভ করল ইংলিশ চ্যানেলের জলে।

পরদিন বিশে ফেব্রুয়ারী হাউস অফ কমন্সে আর্ল অ্যাটলি ঘোষণা করলেন : ১৯৪৮ সালের ভিতর ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য দায়িত্বশীল ভারতীয় সরকারের হাতে সমর্পণ করে ব্রিটিশ সরকার সাম্রাজ্যবাদের

pathagar.net

অবসান ঘটাবেন। এই উদ্দেশ্যে অ্যাডমিরাল ভাইকাউন্ট মাউন্টব্যাটেন শীঘ্রই ভারতবর্ষে যাচ্ছেন। কারণ লর্ড ওয়াভেল পদত্যাগ করছেন এবং তাঁর পদত্যাগ পত্র গৃহীত হয়েছে।

যে কথা সেই কাজ। বাইশে মার্চ সকালে ভাইকাউন্ট এবং ভাই কাউন্টেস্ মাউন্টব্যাটেন এসে পৌঁছালেন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দিল্লি নগরীতে। ইংরাজশাসনের অবসান ঘটাতে। মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। মাউন্ট-ব্যাটেন সাহেবের ধমনীতে ছিল রাজরক্ত। ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পূর্বমুহূর্তে তিনি আহ্বান পেয়েছিলেন বাকিংহ্যাম প্রাসাদ থেকে। কথা প্রসঙ্গে ভারত সম্রাট জর্জ দি সিক্সথ জানালেন যে, তিনি ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গের জন্য বিশেষভাবে চিন্তান্বিত। বড় বড় রাজত্ব ছাড়াও এ মহান উপদ্বীপে আছে প্রায় সওয়া তিন শ' ছোট ছোট রাজ্য—যাদের গড় আয়তন মাত্র বিশ বর্গমাইল, যাদের লোকসংখ্যা গড়ে তিন হাজার এবং বার্ষিক গড় আয় মাত্র হাজার পাউণ্ড। অথচ এইসব ক্ষুদে রাজা বা নবাবের সঙ্গেও ইংলণ্ডেশ্বর চুক্তিবদ্ধ। ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়ার সময় এইসব বশংবদ রাজন্যবর্গের কি ব্যবস্থা করা যায় সেই চিন্তাতেই নাকি তাঁর রাত্রে ঘুম নেই। সম্রাট মাউন্টব্যাটেনকে অনুরোধ করলেন সমস্যার এই দিকটা বিশেষভাবে চিন্তা করতে; বললেন: ওদের তুমি বুঝিয়ে বল ভাই, অবশ্যম্ভাবীকে স্বীকার করে নিতে। স্বাধীন ভারতরাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রদ্বয়ের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিতে।

সম্রাটের সম্বোধনটুকু সামরিক অফিসারটির শ্রুতি এড়িয়ে যায়নি। এ রাজপ্রতিভূকে সম্রাটের আদেশ নয়—এ জর্জির অনুরোধ ডিয়ার লুইকে। তাই সম্রাটের ভাষাটা 'আই উড পাট্রিক্যারলি আস্ক মাই ক্যাসিন টু কনসিডার দিস আসপেক্ট অব দ্য প্রবলেম।'

মাউন্টব্যাটন সাহেব সে কথা ভোলেননি। যদিও এই বিলাসী অকর্মণ্য রাজা আর নবাবদের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র করুণা ছিল না



pathagar.net

তবু স্বাধীনতা সনদ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতাদের দেখতে দেওয়ার আগে তিনি সেটা দেখিয়েছিলেন ভূপালের নবাবকে। ভূপালের নবাব ছিলেন তখন রাজপ্রমুখ—চান্সেলার অফ দ্য চেম্বার অফ প্রিন্সেস। সে সনদ পড়ে নবাবের মুখে ঘনিয়ে এসেছিল অমাবস্যার অন্ধকার। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করলেন--যেভাবে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানকে স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে সেইভাবে অন্তত বড় বড় রাজন্যবর্গকে নিজ নিজ এলাকায় স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া যায় কিনা?

রাজরক্তে অধিকারী লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন—না।

এর পর ভূপালের নবাব পদত্যাগ করলেন। আর তাঁর চান্সেলার অফ দ্য চেম্বার অফ প্রিন্সেস থাকা নাকি অর্থহীন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটভূমি দ্রুত বদলাচ্ছে। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা, ভূপাল ও হায়দ্রাবাদের নবাব, বিকানীর এবং জুনাগড়ের অধিপতি ঘুরে দাঁড়ালেন এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। সরষের মধ্যেই ছিল ভূত। বড়লাটের সহকর্মীদলের ভিতর পলিটিক্যাল বিভাগের কর্ণধার ছিলেন স্যার কনরাড করফিল্ড। তিনি গোপনে উৎসাহ দিচ্ছিলেন স্বাধীনতাকামী রাজন্যবর্গকে। বড়লাটের অগোচরে সরাসরি লর্ড লিস্টওয়েলের সঙ্গে এ বিষয় পত্রালাপ করছিলেন। লিস্টওয়েল তখন সেক্রেটারি অফ স্টেট।

ভূপালের নবাবকে যে কথা জানিয়েছিলেন মাউন্টব্যাটেন ঠিক সেই কথাই অন্যান্য রাজন্যবর্গকে জানিয়ে দেওয়া হল লাটসাহেবের দপ্তর থেকে। আগামী পনেরই আগস্ট ভারত সাম্রাজ্যের অবলুপ্তি ঘটছে। জন্ম নিচ্ছে দুটি নূতন রাষ্ট্র—ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান। রাজন্যবর্গের সম্মুখে তৃতীয় কোন পথ নেই—হয় ভারতবর্ষ, নয় পাকিস্তান যে কোন একটিতে তাঁদের যোগদান করতে হবে, কারণ পনেরই আগস্ট থেকে ইংলণ্ডেশ্বরের সঙ্গে তাঁদের চুক্তির মেয়াদও শেষ হবে। প্যারামাউন্সি'র ঘটবে অবসান।

pathagar.net

কিন্তু ছোটবড় অনেক রাজা মহারাজাই ভুলতে পারছিলেন না স্যার কনরাড করফিল্ডের প্রতিশ্রুতি। প্যারামাউন্সির অবসান অর্থে ইংলণ্ডেশ্বরের আনুগত্যের অবসান। অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা! তিন মাসের বেশী জেল দেওয়ার ক্ষমতা যাঁর ছিল না—এরপর তিনি প্রজা বর্গকে প্রকাশ্য রাস্তায় ফাঁসি দিতে পারেন! এ কি কম মুক্তি! ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজাই সর্বপ্রথম সাহস করে ঘোষণা করলেন, পনেরই আগস্ট তাঁর রাজ্য পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র বলে আত্মপ্রচার করবে।

পরদিন একই মর্মে হায়দ্রাবাদের নিজাম ফতোয়া জারি করলেন। মনে হল স্যার কনরাডের বিষবৃক্ষে বুঝি এবার ফলন শুরু হল। রাজন্যবর্গের মধ্যে গোপনে সাড়া জেগে উঠল--দ্রুত দূত বিনিময় শুরু হল এ-রাজ্যে ও-রাজ্যে। দিল্লিতে বসল নিখিল ভারত কংগ্রেসের জরুরী মিটিং। লৌহমানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের উপর কংগ্রেস ন্যস্ত করলেন এ লড়াইয়ের দায়িত্ব। তীক্ষ্ণধী ভি. পি. মেনন হলেন তাঁর একান্ত-সচিব। ওদিকে স্যার কনরাডের চক্রান্তে রাজন্যবর্গের মধ্যে গোপন সাড়া জেগেছে ভারতবর্ষের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। পনেরই আগস্টের পর আর ইংলণ্ডেশ্বর কোন কিছুতে বাধা দিতে আসছেন না। এই সুযোগ। ত্রিবাঙ্কুর, যোধপুর, জয়শলমীর, হায়দ্রাবাদ, জুনাগড়, কাশ্মীর একবার শেষ চেষ্টা করবার জন্য মনস্থ করল। সেই গোপন বিপ্লবে যোগ দেবার জন্য সচেষ্ট হলেন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভবানীগড় রাজ্যের দেওয়ান বজ্রধর তলোয়ার আর কুমার বাহাদুর।

ঠিক এই ব্রাহ্মমুহূর্তে সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের জ্ঞাতিভ্রাতা লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন ঘোষণা করলেন, পঁচিশে জুলাই তিনি দিল্লিতে দরবার করবেন। ছোটবড় সমস্ত রাজা-মহারাজা নবাব যেন উপস্থিত হন দিল্লিতে।

সে নিয়ন্ত্রণ-পত্র এসে পৌঁছালো ক্ষুদ্র জনপদ ভবানীগড়েও। ভবানীগড় রাজ্যের রাজা বৃদ্ধ। অশক্ত। দেওয়ান বজ্রধর আর কুমার বাহাদুর তাই ছুটেছিলেন দিল্লিতে।

pathagar.net

আবার ফিরে আসা যাক ডায়েরিতে।

২৭শে জুলাই—কদিন আর ডায়েরি লেখার সময় পাইনি। ঝড়ের মতো কেটে যাচ্ছে দিনগুলো। মন বলছে এ অন্যায়, এ ঘোরতর অন্যায়। প্রতি পদক্ষেপে সংযত হতে বলছে সাবধানী মন। আগুন নিয়ে এ খেলা ক'র না। কিন্তু পারছি কই? এ কি দুরন্ত নেশার খ্যাপামি পেয়ে বসেছে আমাকে। নবদ্বীপের বিখ্যাত আচার্য বংশের সন্তান আমি। মহামহোপাধ্যায় বংশের পবিত্র রক্ত বইছে আমার প্রতি ধমনীতে—কিন্তু শত চেষ্টাতেও ইন্দ্রিয়কে বশে রাখতে পারছি কই?

দাদুর চিঠি পেয়েছি গত কালকের ডাকে। লিখেছেন, আমার জন্য সদ্বংশের একটি সর্বগুণান্বিতা পাত্রীর সন্ধান পেয়েছেন। ঠিক অনুমতি চাননি, সে তাঁর ধাতে নেই—শুধু সংবাদটা আমাকে সময় থাকতে জানিয়েছেন। আগামী ফাল্গুনে আমি যেন দীর্ঘ ছুটি নেবার ব্যবস্থা করি। জানিয়েছেন, মেয়েটি শান্তিপুরের একজন বিখ্যাত আয়ুর্বেদ ভিষগাচার্যের একমাত্র কন্যা। কৌতুক করে লিখেছেন—আদ্য মধ্য নয়, একেবারে ম্যাট্রিক পাস।

কালই উত্তর দিয়েছি। জানিয়ে দিয়েছি যে, বিবাহের ব্যবস্থা যেন তিনি এখনই পাকা না করেন। আমি এখন মনস্থির করে উঠতে পারিনি। কারণটা জানাইনি। তার কারণ, কারণটা আমি নিজেই জানি না। রঞ্জুকে আমার ভাল লেগেছে। ভাল লাগছে। কিন্তু তাকে জীবন-সঙ্গিনী করার কথা তো আমার দুঃস্বপ্নেরও অগোচর। তার প্রতি অনুকম্পা আছে, তার একটা সুবন্দোবস্ত হলে আমি অত্যন্ত খুশী হব—কিন্তু এও জানি, আমার পক্ষে তাকে সাহায্য করা সম্ভবপর নয়। অনেক ভেবেছি—না, আমার মন সংস্কার-মুক্ত। রঞ্জনার পিতৃপরিচয় নেই এটা বাধা নয়—আমার পিতৃপরিচয় আছে, এটাই বাধা। ইংলণ্ডেশ্বর মিস সিমসনের প্রেমকে মর্যাদা দিতে সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন—তাঁকে শ্রদ্ধা করি। প্রজানুরঞ্জনের জন্য

শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে বর্জন করেছিলেন, তাঁকেই বা অশ্রদ্ধা করি কি করে? রুস্তমজীর চক্রান্ত থেকে রঞ্জনাকে উদ্ধার করতে আমি পিছপাও হতাম না যদি ইতিপূর্বেই দাদু দেহরক্ষা করতেন। দাদু কিছুতেই এটাকে স্বীকার করে নিতে পারবেন না। তিনকুলে রঞ্জনার কেউ নেই এটাই তো শেষ কথা নয়; তিনকুলে সত্যানন্দ তর্করত্নেরই বা কে আছে আমি ছাড়া? রঞ্জনার তবু যৌবন আছে—অনাগত ভবিষ্যৎ আছে, কিন্তু দাদুর!

তাহ'লে এ দ্বিধা কেন? তাহ'লে সম্মতি জানাতে বাধছে কোথায়? আর তাহ'লে রঞ্জনাকেই বা বাধা দিচ্ছি না কেন? এ কথা কি বোঝা শক্ত যে, রঞ্জনা তিল তিল করে সরে আসছে আমার দিকে। আমার মন ছুঁতে চাইছে সে দৈনন্দিন সাহচর্যে। আমাকে আর সে লজ্জা করছে না, অকপটে যখন তখন আসছে আমার ঘরে। ধীরে ধীরে দুজনের মধ্যে অপরিচয়ের ব্যবধানটা ঘুচে যাচ্ছে। ওর কাছে আমাদের জীবনের অনেক কাহিনী বলেছি। মেঝেতে বসে ঊর্ধ্বমুখে সে শুনে গেছে আমার কথা। কিছু বুঝেছে, কিছু বোঝেনি। কিন্তু ক্রমশই সে সরে আসছে আমার মনের কোল ঘেঁষে। এই তো সেদিন—

রুস্তমজী চলে গেল ভূপালে। আমাদের হাটবারের ছুটি। জরীপ করতে যাইনি। রামালু পূর্বরাত্রে ফিরে গেছে তাঁবুতে। সকাল বেলা এঘরে নাস্তা পৌঁছে দিয়ে রঞ্জু সেই যে চলে গেছে আর আসেনি। আকাশ-পাতাল ভাবছি বসে বসে। ফিরে ফিরে মনে পড়ছে রুস্তম-জীর রূঢ় রসিকতা। কী বাবুজী, আপনি রাজী আছেন?—মনে পড়ছে রুস্তমজীর অট্টহাসি। এমন মেয়েকে নিয়ে একরাত ফূর্তি করা চলে, এদের ঘরের বউ করা চলে না।—কাঁটার মত খচ্‌খচ্‌ করে বিঁধছে কথাগুলো মনের কোণে।

দুপুরবেলা এল শিউনন্দন: আপকো খানা, সাব—

শূন্য টেবিলটার দিকে তাকিয়ে বললুম: কই?



pathagar.net

ইহা নহী, ভিতর।

এ আবার কি কাণ্ড! আমার ঘরের টেবিলে বসেই রোজ খাই। নিয়ে আসে শিউনন্দন। আজ আবার ভিতর-বাড়ি কেন? শিউ-নন্দনের পিছন পিছন ভিতর-বাড়ি এসে দেখি, তাজ্জব ব্যাপার। রুস্তমজীর টেবিলটা একপাশে সরানো। ঘরের মেঝেতে ঠাঁই করে ভাত দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিনের কাঁচকড়ার প্লেটে নয়—কাঁসার থালায়। বাটিতে ডাল-তরকারি। একটু দূরে বসে আছে রঞ্জনা। তার পরনে লালপাড় একটি মিলের শাড়ি। আর আশ্চর্য, সেটা বাঙালী মেয়ের ঢঙে পরা। রঞ্জনার হাতে একটা তালপাতার পাখা।

ভারি সুন্দর লাগলো আয়োজনটা। বললুম: এ আবার কি? রঞ্জু কৌতুকভরে মিষ্টি হাসলে, বললে: বাঙালী খানা!

বিস্ময় প্রকাশ করে বললুম: আরে তাই তো! বাঙালীখানাও পাকাতে পার তুমি?

খানা পাকাতে পারুক না পারুক চোখ যে পাকাতে পারে তার প্রমাণ পেলুম তৎক্ষণাৎ। চোখ দুটি বড় বড় করে বললে: কেঁও নেই? মাতাজীর কাছে সব শিখিয়েছি আমি।

বললুম: তা আগে বলতে হয়, তাহলে পায়জামা ছেড়ে গিলে করা পাঞ্জাবি, চুনট করা ধুতি চড়িয়ে আসতুম।

বাঙালীখানার মর্ম আমি আর কি জানব? ডালের বাটিটা ধরে টানতেই একেবারে হাঁ হাঁ করে উঠল রঞ্জু: আরে নেহী, পহিলে সুঁখতুন্নি!

সবুজরঙের একটা বাটি এগিয়ে দিল সে। হাসব না কাঁদব আলু উচ্ছের শুকতুনি খাওয়া শেষ হলে বললুম: এবার ডাল দিয়ে খাই?

একগাল হাসলে রঞ্জু। সায় দিলে আমার প্রস্তাবে।

আহারান্তে কাঁসার রেকাবিতে করে এনে দিলে পান। বললুম: এসব রান্না মায়ের কাছেই শিখেছ তো?



pathagar.net

রঞ্জু তার ভাঙা ভাঙা বাঙলায় বললে : কই আর শিখেছি। মা আমাকে উনুনের ধারে যেতেই দিত না। নিজেই সব রান্না করত। সাহেবজী বাঙালীখানা খুব পছন্দ করতেন। আমি দূর থেকে দেখে দেখে শিখেছি। কিন্তু বাঙালীখানা কেমন হয়েছে বললেন না তো ?

এমন বাঙালীখানা আমি জীবনে খাইনি —একথা বললেও মিথ্যা বলা হত না। কিন্তু সে কথা না বলে শুধু বললুম : বেশ ভালই হয়েছে। তবে এরপর থেকে যখন উচ্ছের শুকতুনি রাঁধবে, তাতে পেঁয়াজ দিও না।

২৮শে জুলাই—ভাবছি আর নয়, অবিলম্বে এখান থেকে সরে পড়তে হবে। তাঁবুতেই গিয়ে থাকতে হবে। এখানে যতই দিন যাচ্ছে ততই যেন জড়িয়ে পড়ছি। মাসখানেক আছি এই গেস্ট-হাউসে। কোন অসুবিধা এতদিন হয়নি। যে রাত্রে ওকে মাতালটা এনে ছুঁড়ে ফেলল আমার ঘরে সেদিনই ঘটল বিপর্যয়। বোধ করি আমার তরফ থেকে ভদ্র ব্যবহার পেয়ে সে আমার প্রতি সঙ্কোচ, সব লজ্জা বিসর্জন দিয়েছে। কিংবা হয়তো ওর সঙ্গীহীন মন একটা অবলম্বনই খুঁজছিল—আমি নিমিত্তমাত্র। অথবা হয়তো বাঙালী বলেই আমার প্রতি একটা দুরন্ত কৌতূহল জেগেছে ওর। আমার মধ্যে দিয়ে ও তার অজানা অ-দেখা মাতৃভূমিকে দেখতে চাইছে। বাংলাদেশকে দেখতে চাইছে। মনে হয় এই শেষ যুক্তিটাই ঠিক। অনুরাগ বলতে যা বোঝায় তা সঞ্চারিত হয়নি ওর মনে—আমি বাঙালী বলেই একটা আত্মীয়তা, একটা নৈকট্যের সম্পর্ক পাতাতে চাইছে। কাল রাতে যখন খেতে বসেছি তখন হঠাৎ বললে : আপনি পদ্মা নদী দেখেছেন ?

হ্যাঁ, দেখেছি বই কি।

সে কি বিয়াসের চেয়েও বড় ?

বিপাশা আমি দেখিনি—তবে জানি বিপাশার চেয়ে পদ্মা অনেক বড় নদী। কেন বল তো ?



pathagar.net

না, এমনি। মা বলত পদ্মা বড়, অথচ সাহেবজী বলতেন বিয়াস বড়।

মনে পড়ল এর আগে একবার রঞ্জনা বলেছিল, সাহেবজীর কাছে ওর মা আশ্রয় পেয়েছিলেন।

বললুম : সাহেবজী কি পাঞ্জাবের রায়েটে মারা যান ?

না না। তিনি অন্য একজন—সাহেবজীর কাছে মা যখন থাকতেন আমি তখন খুব ছোট। কাশীতে। কাশীতে যখন আমরা ছিলুম তখন আমাদের বাসায় ওস্তাদজী আসতেন। ভারী সুন্দর গান গাইতেন তিনি। মাকে গান শেখাতেন।

তোমাকে শেখাতেন না ?

না, আমি তো তখন খুব ছোট।

তা হোক। দেখে দেখে যদি খানা-পাকানো শিখে থাক, তখন শুনে শুনে গানা-গাওয়াও রপ্ত করেছ নিশ্চয়। শোনাও একখানা।

না না। আমি গান জানি না।

তা হোক তবু গাও একটা।

অনেক পীড়াপীড়ি করতে হল। শেষ পর্যন্ত রাজী হল রঞ্জনা। গান গাইবে, তবে হিন্দিগান। বাঙলা গান সে একেবারেই জানে না। আমি তাতেই খুশী। মীরাবাঈয়ের একখানা ভজন গাইল সে। মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠ। অনভ্যাসের জড়তা থাকলেও ভাল লাগল আমার। ম্যয় নে চাকর রাখ জী !

বললুম : আশ্চর্য মিষ্টি গলা তো তোমার। মায়ের গলা পেয়েছ নিশ্চয় তুমি।

অদ্ভুতভাবে হাসল রঞ্জনা। সে হাসিতে ওর গালে টোল পড়ল না কিন্তু। মনে হল বিষাদে ম্লান সে হাসি। আমি বললুম—হাসলে যে ?

হয়তো আপনি ভুল বলেছেন। মায়ের নয়, বাপের কণ্ঠস্বর পেয়েছি আমি।

তার মানে ?

pathagar.net

হয়তো ওস্তাদজীই আমার বাবা। অবশ্য সাহেবজীও হতে পারেন।

কেমন যেন গায়ের মধ্যে পাক দিয়ে উঠল হঠাৎ। কী অবলীলাক্রমে কথাটা বলল ও যেন কিছুই নয়। যেন না—খোলা খাম হাতে নিয়ে বলা, এ চিঠি অমুকের কাছ থেকে এসেছে—কিংবা অমুক! আমার আজন্ম শিক্ষার, ধ্যানধারণার মূলে ঐ সামান্য কথা কটা প্রচণ্ড আঘাত করল যেন। মনে হল সেদিন ভুল লিখেছিলাম। আমার মন সংস্কারমুক্ত নয়? দাদুর অস্তিত্বই একমাত্র বাধা নয়। এ আমি নিছক আমিই সইতে পারব না কিছুতে। ঐ একটা কথাই আমাকে সচেতন করে দিল—মনে করিয়ে দিল—ওর সঙ্গে আমার তফাতটা অনতিক্রম্য। এ আমি সইতে পারব না কোনদিন, এ আমি সইতে পারছি না। তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম: থাক ও কথা।

হয়তো আমার মুখে প্রতিবিম্ব পড়েছিল চিন্তাধারার। হয়তো কিছু একটা বুঝে থাকবে রঞ্জনা। সে বলে বসে: থামতে তো আমিও চাই বাবুজী কিন্তু থামতে পারছি কই? থামতে তোমরা দিচ্ছ কই? আমার পরিচয় নেই—কিন্তু সে কি আমার অপরাধ!

যুক্তির খাতিরে স্বীকার করতেই হল: কে বলেছে তোমার অপরাধ!

তাহলে তোমরা আমাকে ঘৃণা করছ কেন?

কে বললে ঘৃণা করি?

কে আবার বলবে? আমি কি কিছুই বুঝি না? ঘৃণাই যদি না করবে তাহলে আমাকে জোর করে কেন পাঠিয়ে দিচ্ছ সবাই মিলে—

গলাটা ওর ভারী হয়ে আসে। মাঝ পথেই থেমে পড়ে রঞ্জু। বিহ্বল হয়ে বললুম: বারে! আমাকে কেন জড়াচ্ছ এর ভেতর? আমি কি করতে পারি?

কী করতে পারেন তা কি আপনি জানেন না? আপনি তো অন্তত ওকে বাধা দিতে পারেন।

pathagar.net

আমি কোন জবাব দিতে পারিনি। কিন্তু সেই মুহূর্তেই স্থির করে ফেললাম—আর নয়। এ আগুন নিয়ে খেলা শেষ করতে হবে অবিলম্বে। রুস্তমজী ফিরে এলেই চলে যাব ক্যাম্পে। এ জাতীয় কঠিন প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। হ্যাঁ, স্বীকার করছি, আমি অশক্ত। নীরবে স্থান ত্যাগ করাই এ ক্ষেত্রে একমাত্র পন্থা। রুস্তমজী ফিরে এলেই সিদ্ধান্তটা জানিয়ে দেব।

৩০শে জুলাই—আজ সকালে রঞ্জু অদ্ভুত এক প্রস্তাব করে বসল। সে আমার জীপে করে জরীপ দেখতে যাবে। তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম—জরীপ কিছু মাছধরা বা শিকার নয়, দর্শনীয় তার মধ্যে কিছু নেই। ভারী জেদী মেয়ে। কিছুতেই কোন কথা কানে নিল না। যা মনস্থির করবে তা করবেই। ভাবলুম, একঘেয়ে জীবনে ও যদি একটু বৈচিত্র্যের সন্ধান করে তাহ'লে আমি বাদ সাধি কেন? জীপে করে আমার সঙ্গে যাবে, সারাদিন থাকবে—আবার সন্ধ্যাবেলায় ফিরে আসবে। এতে আর অসুবিধা কোথায়! রাজী হয়ে গেলুম। খুব খুশী হল রঞ্জু। তৎক্ষণাৎ একটা স্যুটকেস হাতে এসে হাজির। বললুম—ও আবার কি, স্যুটকেস কিসের?

বলে: আপনি কি বুঝবেন? মেয়েছেলে নিয়ে যাতায়াত তো কখনও করেননি। আমাদের অনেক বায়নাক্কা। এক কাপড়ে সারাদিন থাকব না কি?

কিন্তু, বারে বারে সেখানে শাড়ি বদলেই বা কি লাভ? সে জঙ্গলে কে দেখবে তোমার সাজ?

রঞ্জু টোল-ফেলা হাসি হেসে বললে: সে জন্যে ভাবতে হবে না মশাই। তাও আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

সহজ নয়, ক্রমশ যেন ফাজিল হয়ে উঠছে ও।

যাবার সময় বাজার ঘুরে যেতে হল। রঞ্জু আমার কোন অনুভূতির অপেক্ষা না করেই মিশিরজীকে হুকুম দিল: পইলে বাজার চলো।

বেশ মজা! মিশিরজীও আমার হুকুমের কোন তোয়াক্কা না

pathagar.net

রেখে সোজা বাজারে এসে দাঁড় করালো জীপ। গাড়ি থেকে নেমে রঞ্জু আমাকে বললে : কই নামুন !

আমি আবার নামব কেন ?

বাঃ। আমার কাছে কি টাকা আছে নাকি ?

বেড়ে মজা তো! অগত্যা নেমে আসতে হল আমাকেও। রঞ্জনা প্রথমেই একটা র‍্যাসান ব্যাগ কিনল। তারপর ঘুরে ঘুরে নানান জিনিস খরিদ করল। ক্রচেটের সুতো, সেফটিপিন, লংক্লথের ছিট, মায় সরু চাল, পেস্তা, কিশমিশ, জাফরান। আমি বললুম—এসব কি হচ্ছে ?

আজ আপনাদের পোলাও খাওয়াব ; পোলাও, আলুকা টিকিয়া পাঁপড় আর চাটনি।

সে কি—উচ্ছের সুকতুন্নি বাদ ?

চোখ পাকিয়ে রঞ্জু বললে : তা ছাড়া উপায় কি, পেঁয়াজ ছাড়া সুকতুন্নি খেয়ে কি সুখ ?

আমি বললুম : কী আপদ, শুখতুনিতে পেঁয়াজ দেয় না।

আলবৎ দেয়। মাতাজীকে আমি দিতে দেখেছি। আপনি বাঙালীখানা খাননি কখনও—কিছুই জানেন না।

বেশ যেন ছেলেমানুষ হয়ে পড়েছে রঞ্জু। ছাপা সিল্কের শাড়ি পরেছে। চুলগুলো চুড়ো করে বেঁধেছে—অদ্ভুত ঢঙে। মেঘভাঙা শরতের প্রথম আলোর মতো খুশী-খুশী ঝলমলে ভাবখানা।

বললুম : রঞ্জু, তুমি বরং একটা গগল্‌স্‌ কিনে নাও। বেশ আধুনিকা-আধুনিকা লাগবে তাহলে।

প্রচণ্ডভাবে মাথা নেড়ে বলল : না না গগল্‌স্‌ কিছুতেই নয়।

কেন আপত্তি কিসের ? রোদটাও চড়া—আর তা ছাড়া এ সাজ পোশাকের সঙ্গে চোখে কালো গগল্‌স্‌ বেশ মানাবে।

দূর ! ও পাঞ্জাবী মেয়েরা পরে। বাঙালী মেয়েরা কখনও গগল্‌স্‌ পরে না।

pathagar.net

আমি বললুম : কিছু জান না তুমি। আজকাল বাঙালী মেয়েরা সব্বাই গগল্‌স পরে।

একটু কি যেন ভাবল, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর বললে : না থাক।

কেন আবার কি হল ?

আবার মুখ টিপে হাসল, বললে : আপনি বুঝবেন না।

বুঝব না কেন ? বল না, আপত্তিটা কিসের ?

মুখটা নিচু ক'রে বললে : মা বলতেন, মুখের মধ্যে চোখদুটোই যা আমার সুন্দর। খামকা চশমা পরে ঢাকব কেন ?

আমি খুশী হয়ে বললুম : সে কথা একশবার ! আমরাও তাই বলি।

ঠোঁট উল্‌টে রঞ্জু বললে : কই বলেন ? আমি বললাম, তাই ভদ্রতার খাতিরে সায় দিলেন।

বলতে আর ভরসা পাই কোথায় ? সেদিন তোমার রূপের একটু প্রশংসা করতেই তো তেড়ে মারতে এসেছিলে। ভয় হয়, কি জানি আবার যদি সাহেবজীর পোলট্রির কথা তোমার মনে পড়ে যায়।

রঞ্জু মুখ টিপে হেসে বললে : সেদিন ভুল বলেছিলাম। আপনি ও দলের নন।

কেমন করে জানলে ?

আপনি যে নিরামিষাশী ! মুরগী তো আপনি খান না। আচ্ছা কেন খান না ?

আমাদের শাস্ত্রে বারণ।

কিন্তু ওস্তাদজী তো বলতেন বন্যকুক্কুট খাওয়ার বিধান আছে শাস্ত্রে।

তা বন্যকুক্কুট আমি পাচ্ছি কোথায় ?

পেলে খান ?

কৌতুক করে বললুম : নিশ্চয়ই !

pathagar.net

আবার মুখ টিপে হেসে বলে : আমি বিশ্বাস করি না।

কেন!

আপনার ফাঁদে তো বুনো মুরগীও একরাতে ধরা পড়েছিল, রোস্ট বানিয়ে খাবার সাহস হল কোথায়?

বলেই এক ছুটে গিয়ে বসল জীপে।

সামনের সীটেই বসেছি দুজনে। জায়গা অল্প। ঘেঁষাঘেঁষি বসতে হয়েছে। ভারী মিষ্টি একটা প্রসাধনের সুগন্ধ বের হচ্ছে। শুধু মিষ্টিই নয়, মোহময়।

আমাদের দেখে রামালু একটু অবাক হল। চালাক ছেলে, সামলে নিল তৎক্ষণাৎ। ভাবখানা এমন দেখাল যেন প্রতিদিনই রঞ্জুকে প্রত্যাশা করছে সে। বললেও সে কথা : এতদিনে তবু একবার দেখতে এলেন আমরা এখানে কেমন আছি।

রঞ্জনা তার খেয়াল খুশীর বন্যায় ভাসিয়ে দিল আমাদের সব গাম্ভীর্য। আমরা সারাদিন মাঠে মাঠে জরীপ করলাম, আর রঞ্জনা তাঁবুতে বসে রান্না করল। ঝামরুকে এবেলার মতো ছুটি দিয়ে দিল। দুপুরবেলা কাজের ছুটি করে আমরা যখন ফিরে এলাম তাঁবুতে তখন রান্না নামেনি। শিল্কের শাড়িখানা তাঁবুর দড়িতে মেলা। মিলের একখানা ছাপা শাড়ি পরেছে। আঁচলটা জড়িয়েছে কোমরে। হাতে মুখে লেগেছে তার হলুদের দাগ। আমাকে দেখেই ধমক দিয়ে ওঠে : আপনার সংসারে মসলা-পেষার এন্তাজাম নেই, জাঁতি নেই, তা আগে বলেননি কেন?

আমি বললুম : ব্যাচিলারদের হেঁশেলে ঢোকনি তো কখনও। তাই জান না। আমাদেরও নানারকম বায়নাক্কা। তা গুঁড়ো মসলাতেই রাঁধলে তো শেষ পর্যন্ত?

গুঁড়ো মসলায় রাঁধতে যাব কোন দুঃখে? আমি কি বিহারী না পাঞ্জাবী? মিশিরজীকে আবার পাঠিয়েছিলাম।

এ তো বেশ মজা। আমাকে গদিচ্যুত করে রঞ্জনা স্রেফ

pathagar.net

ডিক্‌টেটারী চালাচ্ছে। আর মিশিরজীটাই বা কি? আবার পেট্রল পুড়িয়ে গেস্ট-হাউসে গেছে শীল নোড়া আর জাঁতি আনতে? ঝামরুকেও হাত করেছে দিব্যি। অন্যদিন আমি ফিরে এলে ছুটে এসে মুখ হাত ধোবার জল এনে দেয়। আজ যেন ভ্রূক্ষেপ করল না। মাইজীর নির্দেশ অনুসারে টুকিটাকি কাজ করছে। মায় এমন যে আমার অনুগত অনুচর রামালু—তাকেও ও দলে টেনেছে। বলছে: পোলাওটা একটু চেখে দেখুন তো ঠিক হয়েছে কিনা।

আমি বললুম: সে জন্য রামালুকে আর কষ্ট দেওয়া কেন? আমিই তো আছি।

আপনাকে দিয়ে হবে না। অমন সুখতুন্নি আপনার সেদিন ভাল লাগেনি।

আহারাদির পর রামালু বললে: আপনি এবেলা বিশ্রাম নিন স্যার, আমিই জরীপ করছি। চারটে নাগাদ আপনি বরং একবার আসবেন।

ভাবলুম রামালুর উদ্দেশ্যটা সে কি নির্জনে আমাদের একটা সুযোগ দিতে চাইছে? আমি প্রতিবাদ করবার আগেই রঞ্জনা বললে: সেই ভাল; ওবেলা তবু রান্না ছিল। এবেলা নাহ'লে সময় কাটবে কেমন করে?

আমি রাগ করে বললুম: ঐ জন্যেই তো আসতে বারণ করেছিলাম তখন।

পরিপূর্ণ আহার করে আমার কেমন যেন ঘুম আসছিল—কিন্তু ঘুমতে দিল না রঞ্জনা। গল্প জুড়ে দিল। তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার গল্প, ছেলেবেলার গল্প। জিজ্ঞাসা করলুম ওর দাদামশায়ের নাম। চুপ করে গেল হঠাৎ। বললে: মা বারণ করেছেন তাঁর নাম কাউকে বলতে।

ভাবলুম ঠিকই তো—সে পরিচয়ের জের আর টেনে কি লাভ? ও বললে: নামটাই জানে, কিন্তু তাঁদের কে কোথায় আছেন—আদৌ বেঁচে আছেন কিনা তাও রঞ্জনা জানে না। এ প্রসঙ্গ বন্ধ করে

বললুম : আজ বিকালে ফেরার পথে টুংরি নদীর ধার দিয়ে ঘুরে যাওয়া যাবে।

রঞ্জনা গম্ভীর হয়ে বললে : আজ তো আমরা ফিরে যাব না—কাল যাব।

আমি অবাক হয়ে বলি : সে কি ? রাতে তুমি এখানে থাকবে কি করে ?

যেমন করে রামালুজী থাকে। যেমন করে আপনি থাকেন।

তাই কখনও হয়। শিউনন্দন ভাববে না ?

না, আসার সময় আমি বলেই এসেছি, আজ ফিরব না।

আচ্ছা মেয়ে তো ! তাই স্যুটকেস সঙ্গে করে এনেছে। কিন্তু এ প্রস্তাবে আমি রাজী হতে পারি না। এ যেন বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। বললুম : তা হয় না রঞ্জনা--তুমি এখানে কোথায় থাকবে ?

আমি থাকব ওই রান্না তাঁবুতে। আপনারা দুজন এ তাঁবুতে। আখালী বলেছে, একটা খাটিয়া নিয়ে আসবে সন্ধ্যেবেলায় ওদের গাঁ থেকে।

অর্থাৎ সবরকম ব্যবস্থাই সে করে রেখেছে। বুঝলুম, এর আর নড়চড় হবে না। তবু একবার শেষ চেষ্টা করি : কিন্তু রামালু কি ভাববে ?

কিচ্ছু ভাববেন না।

অগত্যা হাল ছেড়ে দিয়ে চিৎপাত হয়ে পড়লুম খাটিয়ায়। রঞ্জনা সকলবেলাতেই আমাদের বিছানার চাদর, বালিশের অ'ড়, গেঞ্জি ইত্যাদি কেচে মেলে দিয়েছিল তাঁবুর দড়িতে। সেগুলি এবার নিয়ে এল ঘরে। বালিশের অ'ড় পরাতে পরাতে সে আড়চোখে লক্ষ্য করে আমাকে। আমার দিক থেকে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে সেও কোন উচ্চবাচ্য করল না। হাতের কাজ সেরে স্যুটকেস খুলে বার করল একটা ক্রচেটের গুলি আর কাঁটা। রামালুর খাটিয়ায় উঠে বসে নিঃশব্দে কুরুশকাঁটা বুনতে থাকে আঙুলে সুতো জড়িয়ে জড়িয়ে।

বললুম : ওটা কি হচ্ছে ?

টেবিল ঢাকা।

ও! কার জন্যে তৈরি হচ্ছে ওটা তা আর জিজ্ঞাসা করলুম না। বললুম : কুরুশের কাজ শিখলে কার কাছে ? মায়ের কাছেই ?

হুঁ !

তুমি কোন স্কুলে কখনও পড়নি ?

হ্যাঁ পড়েছি তো। কাশীতেও পড়তাম—লাহোরেও পড়েছি। দাঙ্গা বাধবার পর সব বন্ধ হয়ে যায়।

আবার কিছুটা চুপচাপ। রঞ্জনাই ফের বললে : আপনি আমার মায়ের নাম জানলেন কেমন করে ?

চন্দ্রনাথ বইখানার কথা ওকে বললাম। রঞ্জনা বাঙলা হরফ চেনে না। তবে বইটা যে তার মায়ের অতি প্রিয় গ্রন্থ এটা জানে। বললে : গল্পটা আমাকে শোনাবেন ?

আপত্তি কি ? আমি চন্দ্রনাথের গল্প বলতে শুরু করি। খেয়াল করিনি, কখন আঙুলগুলো থেমে গেছে। পাশের খাটিয়ায় আধশোয়া অবস্থার তন্ময় হয়ে গল্প শুনছে রঞ্জনা ক্রমে বেলা পড়ে এল। ঘড়ি দেখে আমি বললুম : চারটে প্রায় বাজে। এবার উঠি।

না না, সরযুর শেষ পর্যন্ত কি হল বলে যান।

হেসে বললুম : বলব। এখন কাজ সেরে আসি। রাতে শেষ করব গল্পটা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রঞ্জনা বলল : আমার মায়ের জীবনটাও এ রকম।

আমি বললুম : মায়ের নয়, তোমার।

ম্লান হেসে ও বলে : তা ঠিক। তবে আমার চেয়েও আমার মায়ের জীবন বেশী করুণ। মায়ের সব কথা শুনলে আপনি চোখের জল রাখতে পারবেন না।

pathagar.net

বললুম : তোমার মায়ের জীবনকথা মোটামুটি জানি আমি। রুস্তমজী বলেছে আমাকে।

উৎসাহে উঠে বসে রঞ্জনা : কে বলেছে ? রুস্তমজী ! কি বলেছে ?

সংক্ষেপে রুস্তমজীর কাছে শোনা কাহিনীটা বললুম। চুপ করে শুনল বসে। কাহিনী শেষ হতে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল ওর। আমি বললুম : কী ? এই তো ?

ম্লান হেসে বললে : রুস্তমজী সব কথাই বলেছে, শুধু একটি কথা বলেনি !

কী কথা ?

আমার দাদামশাই ডাক্তার ছিলেন, ঠিক কথা। আমার মা খুব সুন্দরী ছিলেন, ঠিক কথা। রুস্তমজী আপনার কাছে স্বীকার করেননি—যে ছেলেটির হাত ধরে আমার মা সে-বাড়ির চৌকাঠ শেষবারের মতো পার হয়ে আসেন, সে ছেলেটি ছিল ডাক্তারবাবুরই গাড়ির ড্রাইভার !

চমকে উঠি আমি : কে ? রুস্তমজী ?

জী হ্যাঁ !

ছোট্ট তাঁবুর পরিসরে আমি পায়চারি করছিলুম। বললুম : লোকটা মানুষ নয়, জানোয়ার !

রঞ্জনা বললে : ভুল বললেন আপনি। একেবারে জানোয়ার হলে সে আপনাকে সাহায্য করতে ডাকত না। মানুষ বলেই সে আপনাকে ডাকছে ?

হেঁয়ালীটা বুঝলাম না। বললুম : তার মানে ?

রঞ্জনা মুখটা নীচু করলে—চোখে চোখে তাকাতে পারছে না। তবু বললে : একেবার জানোয়ার হলে মা আর মেয়ে দু'জনকেই ! শুধু মানুষের আকৃতি আছে বলেই তা সে পারছে না। আপনার সাহায্য চাইছে !

pathagar.net

হঠাৎ থেমে পড়ে বললুম : তোমার বয়স কত ?

একটু অবাক হয়ে ও বলে : সেদিনই তো বলেছি—উনিশ।

তাহলে তুমি তো সাবালিকা। কেন বের হয়ে আস না ওর খপ্পর থেকে ?

একটু চুপ করে রইল রঞ্জনা। তারপর, বললে : বের হয়ে যাব কোথায় ?

তাই তো। এই স্বল্প পরিসর দুনিয়ায় উনিশ বছরের একটি অনূঢ়া পরিজনহীনা সুন্দরী তরুণীর নিরাপদ আশ্রয় কোথায় ? শুনেছি, কয়েকটি সমাজহিতৈষী প্রতিষ্ঠান আছে, যারা এ জাতীয় মেয়েদের আশ্রয় দেয়, উপার্জনক্ষম করে তোলে। কিন্তু আমি তাদের ঠিকানা জানি না। ভাবছিলুম ওকে নিয়ে যদি কলকাতায় ফিরে যাই তাহলে খোঁজ-খবর নিয়ে নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করতে পারব। আর দাদুর কাছে যদি ওকে পৌঁছে দিই ? ওর স্পর্শ করা জল হয়তো গ্রহণ করবেন না দাদু, কিন্তু তাই বলে কোন একটা ব্যবস্থা নিশ্চয় করবেন। সব কথাই খুলে বলব দাদুকে। সত্য গোপন করব না। বোধকরি আমার চিন্তাধারার কিছুটা ভাস ফুটে উঠেছিল আমার মুখে। যেন তারই জবাবে রঞ্জনা বললে : আর তাছাড়া বের হব বললেই কি বের হওয়া যায় ? শুনলেন না, রুস্তমজী যাবার আগে বলে গেল আমি কুমারসাহেবের 'খেলাওনা'। যতদিন না স্প্রিং কেটে যাচ্ছে, হাত পা মুণ্ড ছিঁড়ে যাচ্ছে, ততদিন এ খেলনা নিয়ে খেলবার অধিকার একমাত্র কুমার বাহাদুরের !

ঝামরু এসে জিজ্ঞাসা করল, চায়ের জল বসাবে কিনা।

রাত্রে আহারাদির পর আমি আর রামালু শুলাম এ তাঁবুতে। পাশের রান্না তাঁবুতে রইল রঞ্জু। আখালী তার জন্য গ্রাম থেকে একটা দড়ির খাটিয়া নিয়ে এসেছে। ঝামরু রইল তাঁবুর মাঝের ফাঁকটুকুতে !

pathagar.net

আমার ঘুম আসছিল না। বেশ গরম আছে। তাঁবুর কানাত ভাঁজ করে উপরে তুলে দিয়েছি। তারায় ভরা আকাশটা জ্বলজ্বল করছে। সূর্য এখন কর্কট রাশিতে। পশ্চিম আকাশটা শুয়ে শুয়েই দেখতে পাচ্ছি। মঘা অস্ত গেছে, কন্যারাশির অনেকটা ডুবে গেছে পশ্চিম দিগ্বলয়ে। হঠাৎ নজরে পড়ল দিগন্তের শেষপ্রান্তে অস্ত যাচ্ছে স্পাইকা—চিত্রা দপ্‌দপ করে জ্বলছে। আমি ভাল করে তাকাবার আগেই একখণ্ড মেঘ ঢেকে গেল। আর দেখা গেল না। বড় মেঘটা সরে যাবার আগেই দিগন্ত স্পর্শ করলে। মনে হল চিত্রা অভিমান করে মুখ ঢাকলো মেঘের চাদরে।

তা ঢাকুক। আজ আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে যে, সে চিত্রা নয়, রঞ্জনা। পাশের খাটিয়ায় রামালু অকাতরে ঘুমাচ্ছে। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে বেচারা। অথচ আমার চোখে ঘুম নেই। শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম রঞ্জনার ভাগ্যের কথা। ঠিক কথাই তো বলেছে সে—'আমার পরিচয় নেই, কিন্তু সে কি আমার অপরাধ?' বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষায় আধুনিক জগতের মানুষ আমি—স্বীকার করতে হয়েছে, নিশ্চয় নয়! কিন্তু সেটা কি সত্য কথা বলেছি? অতখানি জোর দিয়ে 'নিশ্চয় নয়' বলবার অধিকার তো আমার নেই। আমি বিংশশতাব্দীর ইংরাজিশিক্ষিত এঞ্জিনিয়ার, এও যেমন সত্য—তেমন আমি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান, এও তেমনি সত্য। পট্টন্তরী করতে রাজী হননি সত্যসিন্ধু—তাই আমার ঠাকুরদা তাঁর জীবনের প্রথম প্রেমকে গলা টিপে ধরেছিলেন। একথা যেদিন দাদু আমার কাছে গল্প করেন মনে আছে সেদিন মনে মনে তাঁদের করুণা করেছিলাম। ভেবেছিলাম, পট্টন্তরীর বাধায় প্রেমকে অস্বীকার করা একটা কুসংস্কার। কিন্তু ঠিক অমনি ভাবে একবিংশ-শতাব্দীতে আমার বংশধর যখন আমার জীবনের কথা জানবে তখন আমাকেও করুণা করবে না কি? পিতৃপরিচয়-হীনতার বাধাও একটা কুসংস্কার ছাড়া আর কি? আজ এই



pathagar.net

তারাভরা আকাশের তলায় নিদ্রাহীন রাত্রে মনে পড়ছে আর এক-জনের কথা। সত্যশরণ তর্কবাগীশ! আজীবন কৌমার্যের সংকল্প তিনি ত্যাগ করেছিলেন। কেন? একটি নতনয়না কিশোরীকে লোকলজ্জার হাত থেকে নিষ্কৃতি দিতে। সত্যের চেয়ে শিব ও সুন্দরকে বড় করে দেখেছিলেন তর্কবাগীশ। আর আমি? সেই সত্যশরণের বংশধর হয়ে আমি আমার জীবনের প্রথম প্রেমকে সজ্ঞানে ঠেলে দেব ঐ কুমার বাহাদুরের গলিত কামনার যুপকাষ্ঠে! অবিমিশ্র রক্তের অভিমানটুকুকে সম্বল করে ফিরে যাব নিজের কোটরে? পাঁচপুরুষ ধরে যে সত্যধর্মরক্ষার বড়াই করে আসছি আমরা তারই চরমমূল্য মেটানো হবে তাহলে?

উঠে পড়লাম খাটিয়া থেকে। হাত ঘড়িতে দেখলাম রাত এগারোটা বাজে। আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলাম খোলা আকাশের নিচে। চাঁদ নেই আকাশে। উপরে তারার মালা, নিচে জ্বলজ্বল করছে জোনাকি। আকাশ আর পৃথিবী মিলে-মিশে এক হয়ে গেছে। হঠাৎ নজরে পড়ল তারাভরা আকাশের পশ্চাৎপটে কে যেন আছে ওখানে। রঞ্জনা! আমাকে উঠে আসতে দেখে সে এগিয়ে এল আমার কাছে। কতক্ষণ ও এখানে দাঁড়িয়ে ছিল কে জানে। এখন আমার কোল ঘেঁষে দাঁড়াল নীরবে। ওর নিশ্বাস এসে লাগছে আমার বুকে। কারও মুখে কোন কথা নেই। ও বোধহয় আশা করছিল আমি ওর হাত দুটি তুলে নেব আমার হাতে, অথবা—

মনে পড়ল আর এক রাত্রের কথা। সেই প্রথম রাত। সেদিন আমরা দুজনে বন্দী হয়ে পড়েছিলাম চার-দেওয়ালের চতুঃসীমায়। আজ, না আজ আর আমরা বন্দী নই। চারদিকে খোলা মাঠ। তবু কি জানি কেন মনে হল সে রাত্রের চেয়েও ক্ষুদ্রতর পরিসরে আটক পড়েছি আজ আমরা দুজন। চারিদিকের দিগন্ত যেন আমাদের চেপে ধরেছে। মাথার উপরের খোলা আকাশ যেন যথেষ্ট দূরে নয়—যেন নিশ্বাস ফেলবার আর ঠাঁই রাখেনি! যেন এখান থেকে পালাবার



pathagar.net

জন্য এক পা অগ্রসর হলেই চুনবালির পলেস্তারা খসে পড়বে ঝরঝর করে। অতল খাদের মধ্যে পড়ে যাব আমি।

পরিবেশটা হাল্‌কা করবার জন্য বললুম : তোমারও ঘুম আসছে না বুঝি ?

রঞ্জনা একবার তার কাজলকালো চোখদুটি তুলে দেখল আমাকে —তারপর নত করল দৃষ্টি।

বোধকরি এর চেয়ে আরও কিছু রোমান্টিক ভাষা সে আমার কাছ থেকে শুনবার আশা নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। রঞ্জনা আমার ও প্রশ্নের কোন জবাব দিল না।

বললুম : কিছু বলবে আমাকে ?

এবারও একটু দেরি হল জবাবটা দিতে। যেন একটু গুছিয়ে নিয়ে বললে : না নতুন করে আর কি বলব ?

আমার মধ্যে তখন দুটো সত্তার দ্বন্দ্ব চলেছে। সাবধানী মন বলছে সতর্ক হতে, আর তেইশ বছর বয়সটা সে সাবধানী মনের সঙ্কেতটা অগ্রাহ্য করতে চাইছে। বললুম তার মানে তোমার যা বলবার তা আগেই বলেছ তুমি। কী কথা ? মনে তো পড়ছে না !

সে অবস্থায় পড়লে নিমজ্জমান মানুষ সব সঙ্কোচ, সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে শেষ কুটোটার দিকে হাত বাড়ায় রঞ্জনা বোধকরি সেই অবস্থায় পড়েছে। অথবা এই আধো অন্ধকারের আড়ালে তার লজ্জা মুখ লুকোবার একটা অছিলা খুঁজে পেয়েছে। বললে : মনে পড়ছে না একেবারে ? আমার কথা তো আমি গানে গানেই বলেছি বাবুজী।

গানে গানে ! মানে ?

ম্যয় নে চাকর রাখ জী !

একটু চুপচাপ। আমার নীরবতাকে ও কি মনে করল জানি না, বললে : আপনি আমাকে নিয়ে চলুন—আপনার বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করব আমি।

pathagar.net

সাবধানী মন এতক্ষণে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। এর মধ্যে আর যাই থাক রোমান্স নেই। প্র্যাকটিক্যাল কথাবার্তা। একটা বিসনেস ট্রানসাক্শন। শ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক। সেই সুরেই বললুম: আমার বাড়ি বলতে কিছু নেই রঞ্জনা। আমার দেশের বাড়িতে আছেন আমার ঠাকুরদা—কিন্তু তিনি অত্যন্ত গোঁড়া ব্রাহ্মণ। তুমি ঘরে ঢুকলে তিনি কলসীর জল ফেলে দেবেন।

একটু কি ভেবে নিয়ে রঞ্জনা আবার বললে: কিন্তু আপনি তো বিয়ে সাদি করবেন। আমি যদি আপনার সংসারে থাকি? বহুরানীকে সাহায্য করি—আমার ছোঁয়া জল যদি না খান তাহলেও ঘরের আর পাঁচটা কাজ আমি করতে পারব—আপনার ছেলে-মেয়েকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করতে পারব।

হেসে বললুম: কিন্তু এখনও তো আমি বিয়ে সাদি করিনি। এখন তোমাকে রাখব কোথায়?

কেন আপনার কাছে। রুস্তমজীর কাছে যদি আমি থাকতে পারি তাহলে আপনার কাছেই বা পারব না কেন?

সে হয় না।

যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেল রঞ্জনা। তবু নির্লজ্জের মতো বললে: কেন হয় না।

রুস্তমজী বুড়ো মানুষ। সে তোমার বাপের মতো। তার কাছে তোমার কোন ভয় নেই।

আপনার কাছেও নেই। আপনি বুড়ো না হলেও সাচ্চা আদমি।

আমি বললুম: কিন্তু দুনিয়া তো তা মেনে নেবে না। তোমার আমার যে বয়স···

বাধা দিয়ে রঞ্জনা বললে: দুনিয়া আমাকে কি দিয়েছে যে, তাকে ভয় করব? আমি তো দুনিয়ার বার।

কিন্তু আমি তো দুনিয়ার বার নই!—বললুম আমি।

pathagar.net

নিবু নিবু প্রদীপটা এতক্ষণে নিবে গেল একেবারে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রঞ্জনা বললে : তা ঠিক। আমারই ভুল হয়েছিল।

থেমে গেলেই পারতুম। কী যে দুর্বুদ্ধি হল, বললুম : তছাড়া আমি নিজেকেই যে বিশ্বাস করতে পারছি না।

অবাক দুটি চোখ তুলে রঞ্জু বললে : তার মানে ?

রোখ চেপে গেল। বললুম : তুমি নিজেকে বিশ্বাস করতে পার ? এখনই যদি তোমাকে জোর করে বুকে টেনে নিয়ে চুমু খাই—তাহলে বাধা দিতে পার, আমাকে ?

শিউরে এক পা সরে গেল রঞ্জনা। দু হাতে মুখ ঢেকে বললে : অমন করে আমাকে ভয় দেখাবেন না বল্‌ছি।

হেসে বললুম : তাহলে ? দেখলে তো তুমিও নিজেকে বিশ্বাস কর না। রুস্তমজীকে বাধা দেবার ক্ষমতা তোমার আছে—কিন্তু আমি যদি হঠাৎ বর্বর হয়ে উঠি তখন তুমি আমার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবে কেমন করে ?

দুহাতে রঞ্জনার মুখটা ঢাকাই ছিল। তার মধ্যেই জড়িত স্বরে অস্ফুটে ও বললে : যদি বলি, বাঁচতে আমি চাই না। মরতে তো একদিন হবেই। যদি বলি আপনার হাতেই মরতে চাই ?

হাত পা অবশ হয়ে এল আমার !

কিন্তু না ! সংযম হারালে চলবে না আমার ! তেইশ বছর বয়সটাকে গলা টিপে ধরলুম। সংযত দৃঢ় কণ্ঠে বললুম : রাত অনেক হয়েছে রঞ্জনা। এবারে শুতে যাও !

সাধারণ কথা ! মনে হল যেন চাবুক মেরেছি ওকে। হাত দুটো সরে গেল ওর মুখ থেকে। সোজাসুজি চাইল আমার মুখের দিকে। ওর সে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে দেখলুম অবমানিত নারীত্বের আর্তি। বেশ দৃঢ়স্বরেই বললে : যাচ্ছি। শুধু একটা অনুরোধ করে যাব। আর কোনদিন আমাকে জানাতে আসবেন না আমার বয়স উনিশ !

এবার ইচ্ছে হল ওর হাতখানা ধরি। উনিশ বছরকে এমন



pathagar.net

রিক্তহস্তে ফিরে যেতে দিতে পারে না তেইশ বছর। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা জিনিসে আটকে গেল আমার দৃষ্টি। দূর দিগন্তে একজোড়া সন্ধানী চোখ যেন অন্ধকারে কী খুঁজে বেড়াচ্ছে। কোন গাড়ির আলো। এমন চষা ভুঁইয়ে নিশ্চয়ই জীপ! মনে পড়ে গেল টুংরি নালার ধারের সেই গর্তটার কথা। রাত্রির অন্ধকারে আবার তারা আসছে এই বিজন প্রান্তরে। কে ওরা? রঞ্জনার সেদিকে দৃষ্টি পড়েনি। আমার নীরবতাকে সে অন্য অর্থে গ্রহণ করেছে। ধীর পদে সে ফিরে গেল তার তাঁবুতে। আলো জোড়া অন্ধকারের ভিতর কি যেন হাতড়াতে হাতড়াতে এ দিকেই এগিয়ে আসছে। কাল বিলম্ব না করে ডেকে তুললুম রামালুকে। ডাকতেই রামালু উঠে বসল। দুজনে বাইরে এসে দাঁড়ালুম।

কিন্তু না, দেখা গেল আমাদের আশঙ্কা অমূলক। আলোজোড়া নাচতে নাচতে এসে থামল আমাদের দোর গোড়ায়। জীপ থেকে নেমে এল রুস্তমজী। কোন ভূমিকা না করে প্রথমেই আমাকে বললে: এর মানে কি?

আমি তার কণ্ঠস্বরের রূঢ়তাকে আমল না দিয়ে বললুম: আরে, এ মাঝরাতে তুমি কোত্থেকে?

এতক্ষণে রঞ্জনাও এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে। তার মুখ ছাইয়ের মতো সাদা।

রুস্তমজী আরও গম্ভীর স্বরে বললে: আমি জানতে চাই আপনি রঞ্জুবিবিকে এখানে এনে আটক করেছেন কেন?

আমি কোন জবাব দেবার আগেই রামালু বলে ওঠে: আটক করার কি আছে? উনি স্বেচ্ছায় এখানে বেড়াতে এসেছেন।

রুস্তমজী ধমক দিয়ে ওঠে: তুমি চুপ কর। আমি তোমার 'বসের' সঙ্গে কথা বলছি।

আমি বললুম: ব্যাস্, খুব। আমিই ওর 'বস' রুস্তমজী—তুমি নও!

pathagar.net

রুস্তমজী শাণিত দৃষ্টিতে একবার আমাকে আপাদমস্তক দেখে নিল। তারপর আমাকে আর কোন কথা না বলে রঞ্জনার দিকে ফিরে বললে : জীপে ওঠ!

রঞ্জনা আমার দিকে তাকাল।

সে দৃষ্টির বর্ণনা দিতে পারি এমন ভাষার জোর আমার নেই।

আমি সে দৃষ্টিকে যেন সহ্য করতে পারলুম না। দৃষ্টি নত হল আমার। কিন্তু আমার যে সাহস হল না কোথা থেকে সেই সাহস সঞ্চয় করে রঞ্জনা বলে বসল : আমি যাব না!

মুহূর্তে সংযম হারালো রুস্তমজী। রঞ্জনার দিকে এক পা এগিয়ে যাবার উপক্রম করতেই বাধা দিলুম আমি। আমার হাত থেকে রুস্তমজী নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

আমি বললুম : কী করছ তুমি! গায়ে হাত তুলবে নাকি ওর?

রুস্তমজী বললে : ব্যস, খুব। আমিই ওর 'মালিক' বাবুজী—তুমি নও।

রঞ্জনা সকলের উপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। ক্ষণিক স্তব্ধতা। তারপর চট করে নিচু হয়ে স্যুটকেসটা তুলে নিল হাতে। কাউকে কিছু না বলে নিঃশব্দে গিয়ে উঠে বসল জীপে।

ভাবলুম এ পরিচ্ছেদের বুঝি এখানেই শেষ। কিন্তু না! নাটকের আরও কিছুটা বাকি ছিল। রঞ্জনা জীপে উঠে বসার পর রুস্তমজী আমার দিকে ফিরে বললে : আপনাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।

আমি হেসে উঠলুম : তাই নাকি? তুমি কি আমারও 'মালিক' নাকি?

না। আমি হুকুমের চাকর মাত্র! আপনাকে সেলাম দিয়েছেন স্বয়ং কুমার বাহাদুর। আজ সন্ধ্যাতেই ওঁরা ফিরেছেন, এখনই আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

pathagar.net

বললুম : কুমার বাহাদুরকে বলবে—আজ রাত্রে আমার আর সময় হবে না ! কাল সকালে আমি আসব।

রুস্তমজী বললে : বলব।

ওরা চলে যাবার পর রামালু বললে : গেলেই পারতেন।

বললুম : লাভ হত না কিছু। এই মধ্যরাত্রে কুমার বাহাদুর কি স্বাভাবিক অবস্থায় আছেন ?

তা নয়, তবে—আবার চুপ করে গেল রামালু !

আমি ধমক দিয়ে উঠি : কি বলতে চাইছ বল না। অমন আমতা-আমতা করছ কেন ?

যেন মরিয়া হয়েই রামালু বলে ফেলে : আমাকে মাপ করবেন স্যার, কিন্তু আমার মনে হয় সব জেনে-শুনেই রঞ্জনা দেবী এখানে পালিয়ে এসেছিলেন। আমরা ভুললেও আজকের তারিখটা তিনি ভোলেননি। আজ ত্রিশে—তাই রাতটা এখানে কাটিয়ে যাবার জন্য এসেছিলেন।

চট করে মনে পড়ে গেল রঞ্জনার সেই মরণাহত চাহনি ! কিন্তু আমি কি করতে পারতাম ? আমি কি করতে পারি ? কোন অধিকারে বাধা দেব আমি ?

রামালু তখনও বলছে : পঁচিশের মিটিংএ কি হয়েছে জানি না। কাগজও পাই না এখানে। কুমার বাহাদুর যদি সব খুইয়ে এসে থাকে তাহ'লে আজ রাতে আর রঞ্জুদেবীর রেহাই নেই !

প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠি আমি : থাক থাক। আর পাণ্ডিত্য ফলাতে হবে না।

রামালু রাগ করে না। বোধকরি সেও বুঝতে পেরেছে এ ধমকটা আমি তাকে দিই নি—এ ধমক দিয়েছি আমার অক্ষম পৌরুষকে আমার তেইশ বছর বয়সটাকে ?

১৮ই আগস্ট '৪৭ - ভাইজাগ।

pathagar.net

দিন পনের পর আজ আবার লিখতে বসেছি। লেখবার মতো ঘটনা এ পনের দিনে যথেষ্ট ঘটেছে, কিন্তু লেখার মুড ছিল না। মুড অবশ্য এখনও নেই—তবু বসেছি লিখতে।

এসে উঠেছি ভাইজাগের একটা হোটেলে। কদিন থাকব স্থিরতা নেই। একশ' টাকার খান তিনেক নোট এখনও আছে পকেটে। হোটেলটা ভাল। দ্বিতলের ঘরটি নির্জন। জানালা খুলে দিলে সমুদ্র দেখা যায়।

এ পনেরটা দিনের কথা আমি জীবনে ভুলব না। বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলুম। হারজিতের খেলার হেরেছি কি জিতেছি জানি না—কিন্তু মনটা ভেঙে গেছে। সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল, তবু খুশী মনে আজ বিদায় নিতে পারছি না। কিন্তু কি হলে সত্যিই খুশী হতুম আমি?

এ পনের দিনের ঘটনা কালানুক্রমিকভাবে সাজালে প্রথমেই বলতে হয় ও মাসের শেষ তারিখে বেলা আটটা নাগাদ রামালুকে নিয়ে ফিরে এসেছিলুম গেস্ট-হাউসে। প্রথমেই এত্তালা পাঠানো গেল কুমার বাহাদুরের কাছে—শিউনন্দন চিরকুটখানা ফিরিয়ে দিয়ে জানালো কুমার বাহাদুর এখন ব্যস্ত আছেন। দেখা হবে না।

সকলেই দেখি খুব ব্যস্ত। রুস্তমজীর সঙ্গে দেখা হল। যেন চেনেই না আমাকে। কোন কথাই বললে না। বাড়িতেই রঞ্জনা যে আছে তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। বড়কর্তারা মধ্যাহ্ন আহার সারলেন মাঝের খানা-কামরায়—আমার আহার্য কিন্তু শিউনন্দন পৌঁছে দিয়ে গেল আমার ঘরেই। মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে কুমারসাহেব তাঁর গাড়িতে ফিরে গেলেন রাজধানীতে। আমার সঙ্গে দেখাই করলেন না। না কুমারসাহেব, না দেওয়ান বজ্রধর।

রামালু কদিনের সংবাদপত্র সংগ্রহ করে এনেছে। খবর পড়ে জানা গেল গত পঁচিশে দিল্লীতে যে দরবার হয়েছে তার ফলাফল। অধিকাংশ রাজা-মহারাজাই সই দিয়ে এসেছেন। হয় ভারতবর্ষ, নয়

pathagar.net

পাকিস্তানে যোগ দিতে তাঁরা প্রস্তুত। অবশ্য অনেকে এখনও কিছু জানাননি। শোনা যাচ্ছে ভবানীগড় রাজ্যের প্রতিনিধিও সই না দিয়ে ফিরে এসেছেন।

বিকালের দিকে একখানা টেলিগ্রাম পেলাম কলকাতা অফিস থেকে। ওঁরা সদলবলে আসছেন পরদিন। রুস্তমজীকে টেলিগ্রামখানা পাঠিয়ে দিলাম। তার জানা থাকা দরকার।

সন্ধ্যাবেলায় রুস্তমজী কোথায় বেরিয়ে গেল। এই সুযোগে শিউনন্দনকে ডেকে বললুম, রঞ্জনা কোথায়? তাকে একবার এ ঘরে আসতে বল।

শিউনন্দন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

কি হয়েছে শিউনন্দন?

মাঈজীর তবিয়ৎ খারাপ—কারও সঙ্গে দেখা করবেন না।

দেখা করবে না কে বলেছে? রঞ্জনা নিজে, না রুস্তমজী?

শিউনন্দন হাত দুটি জোড় করে বললে: গরীবের গোস্তাকি মাপ করবেন হুজুর। এ হুকুম দিয়ে গেছেন রুস্তমজী নিজেই। বাইরের গোসলখানা ঘরের চাবিও আপনার জন্যে রেখে গেছেন। কড়া হুকুম দিয়ে গেছেন, যেন ভিতর বাড়িতে কাউকে ঢুকতে না দিই।

গরজ বড় বালাই। তবু প্রশ্ন করলুম: রঞ্জনার শরীর খারাপ বলছিলে—কি হয়েছে তার?

লোকটা অনেকদিন ধরে আছে এখানে। রঞ্জনাকে সেও ভালবাসে। তাই জবাবটা দেবার সময় গলাটা কেঁপে গেল তার। বললে: কাল সারারাত তিনি আটক ছিলেন।

আটক ছিলেন। কোথায়?

চারিদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললে: কুমার-বাহাদুরের ঘরে।

কানের মধ্যে কে যেন সীসা ঢেলে দিল।

আমার মা নেই, বোন নেই—নিকট কোন আত্মীয়া নেই। যদি

pathagar.net

থাকত আর কেউ যদি এসে খবর দিত তাদের কাউকে ডাকাতে ধরে নিয়ে গেছে, তাহ'লে বোধকরি এমনি অনুভূতি হত আমার। গত-কালকার কথা মনে পড়ে গেল। ঠিকই বলেছিল রামালু—এই আশঙ্কাতেই রঞ্জনা পালিয়ে গিয়েছিল এখান থেকে, রাত্রে ফিরতে চায়নি। এই জন্যই নির্লজ্জের মতো কাল বারে বারে আমার আশ্রয় ভিক্ষা করেছে। আর দুর্বল অক্ষম আমি সব জেনে-শুনেও তাকে তুলে দিয়েছি একটা কামাতুর পিশাচের হাতে!

কতক্ষণ একা একা ঘরের মধ্যে পায়চারি করেছি জানি না। মন-স্থির করতে সময় লেগেছিল নিশ্চয়। কারণ শিউনন্দনের কাছে এ সংবাদ শুনেছিলাম সন্ধ্যারাতে, তারপরের ঘটনাটা বেশ রাত্রে। এর মধ্যে কি ঘটেছিল মনে নেই।

দরজায় টোকা দিতে রুস্তমজী খুলে দিল সেটা। নিজেকে আবিষ্কার করলাম রুস্তমজী শেরের ঘরের ভিতর। এ-ঘরে ইতি-পূর্বেও আমি এসেছি। ঐ টেবিলটা সরিয়ে সেদিন রঞ্জনা আমাকে বাঙালীখানা পরিবেশন করেছিল। ঘরের ও-প্রান্তে একটা চৌকিতে শুয়ে আছে রঞ্জনা। রুস্তমজী ঐ টেবিলের সামনে বসেছিল বোধহয় দ্বার খুলে দেবার পূর্বমুহূর্তে। টেবিলের উপর পড়ে রয়েছে খোলা বোতল আর গ্লাস।

আমাকে দেখে যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল রুস্তমজী। বোঝা যায় সে আমাকে একেবারেই আশা করেনি। আর রঞ্জনা। বিস্ময়াবিষ্ট একজোড়া কাজলকালো চোখ তুলে সে আমাকে দেখল। তারপরেই সে দৃষ্টি হয়ে গেল স্বাভাবিক। যেন চেনেই না আমাকে। পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে ফের –দেওয়ালের দিকে মুখ করে।

ভাষা খুঁজে পেয়েছে রুস্তমজী শের। ভীতু গলায় বলে: কি চাই?

তোমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া বাকি আছে। একবার বাইরে আসবে?

pathagar.net

লোকটা আমার চেয়ে শক্তিশালী, স্থানটা তারই গৃহ—তবু আমার সে আহ্বানে এমন একটা কিছু ছিল যাতে ভয় পেল রুস্তমজী। অথবা হয় তো অপরাধ-প্রবণতায় সে মনে মনে আতঙ্কগ্রস্ত হয়েই ছিল। ভয় যে সে পেয়েছে তা বোঝা যায় তার কণ্ঠস্বরে। আমতা-আমতা করে বললে : কী ছেলেমানুষী করছেন···যান শুতে যান।

আমি কঠিনস্বরে বললুম : তুমি আমার ঘরে আসবে কিনা।

রুখে উঠল ও : না যাব না। কী করতে পারেন আপনি ?

বললুম : কিছুই করতে পারি না তা ভেব না। রঞ্জনার দাদা-মশাই এখনও বেঁচে আছেন। থানায় যে এজাহার তিনি দিয়েছিলেন আজ বিশ-বাইশ বছরেও তা তামাদি হয়ে যায়নি। তাঁর ড্রাইভারের হদিসই নয়—সাক্ষীপ্রমাণও আছে আমার কাছে।

রুস্তমজী শাণিত দৃষ্টিতে আমাকে দেখে নিল একবার। রঞ্জনার দাদামশাই সত্যই বেঁচে আছেন কিনা বোধকরি আমার মতো সে-ও জানত না—কিন্তু রঞ্জনা যে তার সব কথাই আমাকে বলে দিয়েছে এটুকু রুস্তমজী আন্দাজ করে নিয়েছিল। বোতল থেকে গ্লাসে পানীয় ঢালতে ঢালতে আমার দিকে আর একবার তাকাল। বাঁকা হাসি হেসে বললে : আচ্ছা ! ব্ল্যাকমেইলিং ?

আমি বললুম : না। সারাজীবন পাপের মধ্যে থেকে সব-কিছুকেই তুমি ঐ দৃষ্টি দিয়ে দেখছ। আমি ব্ল্যাকমেইল করতে আসিনি !

রুস্তমজী ভ্রূকুঞ্চিত ভঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমি একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলুম। বললুম : রুস্তমজী, আজ বাদে কাল দেশ স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে। এতদিন যা করেছ তা করেছ এবার মানুষের মতো কিছু একটা কর।

রুস্তমজী জবাব দিল না। জিজ্ঞাসাভরা দৃষ্টি মেলে বসেই রইল একভাবে।

বললুম : রঞ্জনাকে আমার হাতে দাও। আমি ওকে নিয়ে যাই—



pathagar.net

নিয়ে যাবেন ? কোথায় ? কেন ?

তুমি ওকে যে পথের সন্ধান দিচ্ছ তা ছাড়াও স্বাধীন ভারতবর্ষে মেয়েদের বাঁচার জন্যে অনেক পথ খুলে যাবে। ভদ্রভাবে যাতে ও জীবনযাপন করতে পারে আমি তার ব্যবস্থা করে দেব।

কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছে রুস্তমজী। একবার সে তাকালো রঞ্জনার দিকে। দেখলাম কখন উত্তেজনায় সে উঠে বসেছে। চোখাচোখি হল রঞ্জনার সঙ্গে। রুস্তমজীকে বললুম : আমি কথা দিচ্ছি কোন উদারপন্থী সুপাত্রের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে দেব, আর তা যতদিন না পারছি ততদিন ওকে দু-মুঠো খেতে দেবার সামর্থ্য আমার আছে।

রুস্তমজী জবাব দিতে পারল না। বোধকরি সে দ্বিধায় পড়েছে।

কি হল, জবাব দাও।

কিন্তু রুস্তমজীর জবাব দেবার প্রয়োজন হল না। তার আগেই রঞ্জনা বলে উঠল : জবাব হম্‌সে শুনিয়ে বাবুজী।

ঘুরে দাঁড়ালাম। রঞ্জনার মুখোমুখী। রঞ্জনা উঠে দাঁড়িয়েছে। মনে হল দাউদাউ করে জ্বলছে সে।

'নোভা' আমি জীবনে কখনও দেখিনি। জ্যোতিষের বইতে পড়েছি ক্যাসিওপিয়া-মণ্ডলে নাকি ষোড়শ শতাব্দীতে একবার জ্বলে উঠেছিল নোভা। শান্ত নিষ্প্রভ নক্ষত্র জ্বলে উঠেছিল লক্ষগুণ ঔজ্জ্বল্যে। তারপর সে নিভে গেছে চিরকালের জন্যে। রঞ্জনার সর্বাবয়বে সেই প্রজ্বলিত নোভাকেই প্রত্যক্ষ করলুম যেন।

রঞ্জনা বললে : শুনুন ! রুস্তমজীকে অনুরোধ করে লাভ নেই। আমি রাজী নই।

আমি অবাক হয়ে বললুম : কী বলছ ? তুমি রাজি নও ! কেন !

কারও রক্ষিতা হয়েই যদি থাকতে হয় —তাহলে আপনার কাছে যাব কেন ?

রক্ষিতা ? তুমি কি বলছ রঞ্জনা ?

pathagar.net

ঠিকই তো বল্‌ছি বাবুজী! আপনি খানদানী ঘরের ছেলে, আমাদের এসব নোংরামির মধ্যে আপনার নাক গলাবার কি দরকার?

আমার বাক্যস্ফূর্তি হল না। আশ্চর্য মানুষের মন। এই রঞ্জনাই মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে আমায় বলতে গিয়েছিল: ম্যয়নে চাকর রাখ জী!

কিন্তু রুস্তমজী এতক্ষণে যেন গায়ে তাগদ পেয়েছে। বোতল থেকে আবার খানিকটা পানীয় ঢেলে নিয়ে হাসতে হাসতে বললে: এটা কিন্তু রঞ্জুবিবি ঠিক বলেছে! আপনি নিজে ওকে সাদি করতে নারাজ তাহলে কোন অধিকারে আপনি ওকে কোন সুপাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেবার কথা বলছেন? আর বিয়ে না করে মেয়েমানুষ পোষা? মাপ করবেন বাবুজী, সে ক্ষেত্রে আপনার চেয়ে কুমার বাহাদুরই কি সুপাত্র নন?—হোহো করে হেসে উঠল মাতালটা।

মাথার মধ্যে যেন আগুন ধরে গেল আমার। রুখে উঠলাম: জানোয়ার! তুমি একটা জানোয়ার!

রুস্তমজী রাগ করল না। হেসেই বললে: জী হাঁ। জানবার! সাচ্চা জানবার!···লেকিন তুমহারা মাফিক সাঁপ নহীঁ!

তার মানে! কি বলতে চাইছ তুমি?

তা ছাড়া কি? মেয়েটাকে তুমি বিয়ে করবে না অথচ নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে পুষবে। এর মানে না বোঝে কে? মাঝরাতে এসেছ মেয়েছেলে বাগাতে আর সাফাই গাইছ আদর্শবাদের। কোন জানোয়ারে এটা পারে না—পারে সাপ!

আমি গর্জে উঠলুম: রুস্তমজী!—চেয়ার ছেড়ে উঠলুম আমি।

কিন্তু এবার ও একতিলও ঘাবড়ালো না। সেও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। হেসেই বললে: বাবুজী! এসব কারবার এককালে আমরাও করেছি। সবজাতের মানুষই করে। কিন্তু তোমরা, বাঙালীরা, যেভাবে আদর্শবাদের বুলি কপচিয়ে মেয়েমানুষ ভাগাতে পার, এমনটি আমি আর কোথাও দেখিনি!

আমার ধৈর্যচুতি ঘটল। ওর জামার কলারটা চেপে ধরে বললুম : বেশ! শোন? আমি ওকে ধর্মমতে বিয়েই করব। কেমন, এবার রাজী?

রুস্তমজী ধীরে ধীরে আমার মুষ্টি থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। একেবারে নিভে গেল যেন। বসল চেয়ারে। একপাত্র নির্জলা গলায় ঢেলে বলল : সচ বোল্‌তে?

আমি গম্ভীর হয়ে বলি : মিছে কথা আমার বংশে কেউ কোনদিন বলেনি।

মুখটা মুছে নিয়ে বললে : কাল রাত্রে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে তা সত্ত্বেও?

আমি স্থির হয়ে বললুম : হ্যাঁ, তা সত্ত্বেও!

রঞ্জনা এতক্ষণ স্তব্ধ বিস্ময়ে আমাদের দুজনকে দেখছিল। আমার এ কথা শুনে আর সে নিজেকে স্থির করে রাখতে পারল না। উবুড় হয়ে পড়ল আবার তার খাটে। বালিশের মধ্যে গুঁজে দিল তার মুখ। পিঠটা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে থরথর করে। রুস্তমজী একবার ওর দিকে একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর উঠে গেল রঞ্জনার খাটের কাছে। ওর মাথায় আলতো করে হাতখানা রেখে বললে : কাঁদলে তো চলবে না বেটি! বাবুজীর এ কথার জবাব যে তোমাকেই দিতে হবে। আমি তো এ কথার জবাব জানি না।

কিন্তু রঞ্জনার তরফে কোন সাড়া নেই। মাঝে মাঝে ওর সারা দেহ শুধু কেঁপে উঠছে থরথর করে।

রুস্তমজী আবার ফিরে এল আমার কাছে। আমার হাত দুটি ধরে বললে : বাবুসাব। আমি সত্যিই জানোয়ার। তামাম জিন্দেগী খালি···। যাক্ সেসব শরমকী-বাত আর নাই বললাম। কিন্তু ঠিক কথা বলেছ তুমি···আজাদ-ভারতের আদমি হয়ে আমার নতুন একটা কিছু করা উচিত, নয়?···ঈশ্বর জানেন—ঐ হতভাগীটাকে

pathagar.net

আমি মেয়ের মত ভালবাসি !···দেবো, ওকে আমি তোমার হাতেই তুলে দেবো···কিন্তু একটি শর্তে···

বল, কি তোমার শর্ত ?

অগ্নিসাক্ষী রেখে আমার সম্মুখেই তুমি আগে ওকে বিয়ে করবে ?

করব।

রুস্তমজী একটু ইতস্তত করে বললে : বাবুজী ! তুমি সব দিক বিবেচনা করে দেখে তারপর এ কথা বলছ তো ?

আমি হেসে বললুম : কেন ? তোমার সন্দেহ হচ্ছে ?

রুস্তমজী হেসে বললে : তা একটু হচ্ছে। মাফ্ ক'র বাবুজী, কিন্তু তোমাদের গোটা বাঙালী জাতটাই সেন্টিমেন্টাল। জানি না কতদূর ভেবে দেখেছ তুমি।—একটু ইতস্তত করে ফের বলে—এ কথাটা কি ভেবেছ···গত কালকার হঠকারিতায় আজ হয়তো রঞ্জনা —কিভাবে বলব কথাটা—হয়তো ও হতভাগী শুধু আমার বেটিই নয় আজ সে আর কারও মা।

আমার হৃৎপিণ্ডটাকে কে যেন চেপে ধরেছে। যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে আমার। যেন জলের নীচে দম বন্ধ হয়ে আসছে ক্রমশ। মা ! একটা আর্ত চীৎকার আমি কোনক্রমে ঠেকিয়ে রাখলাম দাঁতে দাঁত দিয়ে।

কিন্তু রঞ্জনা পারল না ! তার কণ্ঠনালী বিদীর্ণ করে যে শব্দটা বার হয়ে এল তা একটা জান্তব আর্তনাদ !

তাকিয়ে দেখলাম তার দিকে। রঞ্জনা উত্তেজনায় উঠে বসেছে। বুকের উপর থেকে আঁচলটা খসে পড়েছে। খেয়াল নেই তার। উন্মাদিনীর মতো দেখাচ্ছে তাকে। রঞ্জনা খাট থেকে নামলো, টেবিলের প্রান্তটা এক হাতে ধরে আর একহাতে বুক চেপে ধরে বললে : আমাকে মাপ করবেন, আমি রাজী নই !

এবার অবাক হবার পালা আমার। কি বলতে চায় রঞ্জনা ?

রঞ্জনা আঁচলটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য পা

pathagar.net

বাড়ায়। আমি বাধা দিলুম। ওর দুটি বাহুমূল ধরে বললুম: রঞ্জনা, কি বলছ তুমি। তুমি রাজী নও মানে?

রঞ্জনা আমার হাত থেকে নিজ বাহুমূল ছাড়িয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল ভিতর বাড়িতে। রুস্তমজী বললে: আপনি বিশ্রাম করতে যান। একটু সময় লাগবে—সেটা কিছু নয়। কিন্তু তাও বলি বাবুজী, কাল আপনি ওকে রুখলেন না কেন?

পরদিন ওঁরা সত্যই এলেন সদলবলে কলকাতা থেকে। শ্যামসুন্দরজী, জিওলজিস্ট সিংজী, আর সেক্রেটারী সাহেব। প্রথম সাক্ষাতেই সেক্রেটারী সাহেব আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন: জানি, তুমি কি বলতে চাইছ। সার্ভে প্ল্যান যে তৈরি হয়নি তা আমরা জানি। বস্তুত সার্ভে প্ল্যান আমরা চাইও না।

আমি অবাক হয়ে বললুম: সার্ভে প্ল্যান চাও না? তা হলে কি চাও?

ও হেসে বললে: আমরা চেয়েছিলাম তোমাদের দুজনকে ঐ তেপান্তরের মাঠে কয়েক সপ্তাহ আটকে রাখতে! অবাক হচ্ছ? অবাক হবার কিছু নেই! সব কথাই বুঝতে পারবে আমার কথা শুনলে।

কি কথা?

সেটা যথাসময়ে বলব। শোন, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর তোমার কাজে খুব খুশী হয়েছেন। কলকাতায় ফিরেই একটা বড় রকম লিফট পাচ্ছ তুমি। কিন্তু আপাতত তৈরি হয়ে নাও। আমরা সবাই এখনই ভবানীনগর যাব। রামালু এখানেই থাকবে। দিন সাতেকের মধ্যেই কলকাতা ফিরে যাব আমরা।

মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা গেল না। তবু গুছিয়ে নিলাম নির্দেশ-মতো। প্রাতরাশ সেরেই রওনা হতে হবে। রুস্তমজীকে বললুম: রঞ্জনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই! বললে: সে হবার নয়।

pathagar.net

কাল রাত্রে সেই যে দোরে খিল দিয়েছে আজ এত বেলাতেও সে দোর খোলেনি।

সত্যই শেষ পর্যন্ত দেখা হল না রঞ্জনার সঙ্গে। ভাবলুম—তা হোক। দিন সাতেকের মধ্যেই তো ফিরে আসছি—তখন না হয় দেখা হবে! এ কদিনে মানসিক স্থৈর্যও সে ফিরে পাবে নিশ্চয়। হয়তো—

তখন কি জানতাম এ সাতদিনেই একেবারে ওলট-পালট হয়ে যাবে সব। তখন কি স্বপ্নেও ভেবেছি রঞ্জনার সঙ্গে আর দেখাই হবে না জীবনে।

ভাইজাগ হোটেলের এ ঘরটা ভাল। ঘরে বসেই সমুদ্র দেখা যায়। পাশের ঘরে যাত্রী এল। হোল্ডল, স্যুটকেস, বেতের ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছে হোটেলের চাকর। সুবেশ তরুণ-তরুণী কাচ্চা-বাচ্চার একটা দল। কী সুখে আছে ওরা। দেশভ্রমণে বেরিয়েছে হয়তো। অথবা কে জানে হয়তো আমার মতো ওদের মনেও জমেছে জমাট বরফ। ওরাও হয়তো আমাকে দেখে ভাবছে—বেড়ে আছেন পাশের ঘরের নির্ঝঞ্ঝাট টুরিস্ট ভদ্রলোক। একা একা কেমন দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন। ওরা তো জানে না, বেকার একটি মানুষ নূতন করে জীবনের অর্থ খুঁজতে বেরিয়েছে।

কাল আসবার পথে দেখেছি শহরের পথে পথে উৎসবের আয়োজন। আগামী কাল পনেরই আগস্ট, উনিশ শ' সাতচল্লিশ! সহস্রাব্দীর চিহ্নিত খণ্ডকাল। আর মাত্র একটি রাত্রির ব্যবধান। দীর্ঘ দুই শতাব্দীর পর ভারতবর্ষ আবার স্বাধীন হতে চলেছে। কি আনন্দ! কিন্তু আজ কি সত্যই আনন্দের দিন? এই স্বাধীনতাই কি চেয়েছিলাম এতদিন? খণ্ডিত ভারতবর্ষের বাকি আধখানা কি পেল? পূর্ব বাঙলা? পাঞ্জাব? সীমান্ত গান্ধীর দেশ? সেখানে লুট দাঙ্গা নারী-ধর্ষণ সমানে চলেছে আজও!

নিজের দিকে তাকালেও দেখি ঐ একই দৃশ্য। বন্দী জীবন থেকে



pathagar.net

পালিয়ে এসেছি। চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়েছি—কোন বন্ধন আর নেই। সবচেয়ে বড় কথা সত্যধর্ম রক্ষা করেছি সব কিছুর বিনিমেয়ে। কিন্তু এ কোন মূল্যে স্বাধীনতা কিনলাম আমি? পূব-বাঙলার সেই ধর্ষিতা মেয়েটিকে ভুলতে পারছি কই?

এক একবার মনে হচ্ছে এই ভাল হয়েছে। এ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারত না। নবদ্বীপ-গৌরব সত্যানন্দ তর্করত্ন কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না রঞ্জনাকে। কারণ সবকথা আমাকে খুলে বলতে হত তার আগে। সত্য গোপন করা আমাদের ধাতে নেই। কিন্তু শুধু কি দাদু? আমি নিজেই কি সহ্য করতে পারতুম? ঝোঁকের মাথায় কথা দিয়েছিলাম রুস্তমজীকে—কিন্তু আমার দাম্পত্য জীবন কী রূপ নিত তা কে জানে? অগ্নিসাক্ষী করে তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম—কিন্তু কে জানে তার আগেই রঞ্জনা মা হতে চলেছিল কিনা? তাও কি পারতাম সহ্য করতে? আমি? সত্যানন্দ তর্করত্নের পৌত্র? সেই ছেলের হাত থেকে পিণ্ড গ্রহণ করতে পারতাম দেহাতীত আমি?

সেক্রেটারী সাহেব তাঁর প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন। ভবানীনগরে পৌঁছে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সব কথা। শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম।

যে জমিটা আমাকে জরীপ করতে বলা হয়েছিল সেখানে আদৌ কোন কাগজের কল তৈরি করার পরিকল্পনা ছিল না ওঁদের। ঐ জমিতে ভূগর্ভের নীচে নাকি সন্ধান পাওয়া গেছে কী সব খনিজ পদার্থের। কোবাল্ট, নিকেল না অ্যান্টিমনি; খবরটা মহারাজা গোপন রেখেছিলেন। ভবানীগড় রাজ্য ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত হবার আগেই মহারাজা এই জমিটাকে অল্প খাজনায় দীর্ঘমেয়াদী লীজ দিয়ে দিতে চান। পনেরই আগস্টের পর নাকি সে অধিকার আর থাকবে না তাঁর। পনেরই আগস্টের আগেও জাতীয় সম্পদের ক্ষতিকারক কোন চুক্তি যাতে রাজন্যবর্গ কারও সঙ্গে না করতে পারেন সে জন্য মাউন্টব্যাটেন পূর্বেই নির্দেশ জারী করে রেখেছেন।



pathagar.net

সেজন্যই খনিজ-সম্পদের উল্লেখ না করে কাগজের কলের জন্য জমিটা দেওয়া হচ্ছে। অথচ দলিলটা এমনভাবে তৈরি করা হচ্ছে যাতে ঐ ভূখণ্ডের নিচে যাবতীয় খনিজ সম্পদের মালিকানার অধিকার থাকবে 'লেসির', অর্থাৎ শ্যামসুন্দরজীর।

ব্যবস্থা ভালই, কিন্তু গোল বাধালেন রেজিস্ট্রার সাহেব। তিনি বায়না ধরলেন, লীজের দলিলটা পাকাপোক্ত করতে হলে দলিলের সঙ্গে একখানা সার্ভে ম্যাপ থাকা চাই। রীতিমতো জরীপ করাতে হবে কোন ডিগ্রিধারী এঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে। না হলে দলিল রেজেস্ট্রীভুক্ত করা হবে না।

আমি বললুম : কে সার্ভে করছে এ জমি ?

কেউই করেনি। রেজিস্ট্রার সাহেব তো আপনার মতো যন্ত্র ঘাড়ে নিয়ে মাঠে মাঠে ঘুরবেন না। তাঁরও ব্রহ্মাস্ত্র ঐ সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়ার মৌজা ম্যাপ। তা সেই মৌজা ম্যাপ থেকেই এনলার্জ করে গুরুবচন মেহতা এ ম্যাপটা তৈরি করছে।

গুরুবচন সই করলে হয় না ?

তা হলে আর আপনাকে ধরে আনা হবে কেন ? গুরুবচন পাকা লোক, কিন্তু পাস-করা নয়। শুধু প্ল্যান নয়, একটা ফিল্ড-বুকেও আপনাকে সই করে দিতে হবে। ধুলোয় রগ্‌ড়িয়ে সেই বইখানা আমরা পুরানো করে তুলব।—বলেই হাহা করা হাসি।

মনে পড়ে গেল অধ্যাপক ঘোষকে।

বললুম : মাপ করবেন আমাকে। যে জমি আমি নিজে জরীপ করিনি, তার নকশায় এভাবে সই করতে পারব না।

ভ্রূ-কুঞ্চিত হল সেক্রেটারী সাহেবের। বললেন : ছেলেমানুষী করবেন না মিস্টার আচারিয়া। লাখ লাখ নয়, কোটি কোটি টাকার ব্যাপার! সব কিছু বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। সময় অত্যন্ত অল্প, এর মধ্যে রেজিস্ট্রেশন না হলে সব বানচাল হয়ে যাবে।

pathagar.net

বললুম : সে দায়িত্ব আপনাদের। আপনারা অন্য লোক দেখুন।

ধমকে ওঠেন সেক্রেটারী-সাহেব : কী বলছেন যা তা! এখন অন্য এঞ্জিনিয়ার পাব কোথায়?

তার আমি কি জানি?

সেক্রেটারী-সাহেবকে মদৎ দিতে এবার এগিয়ে আসেন জিওলজিস্ট সিংজী। মিস্টার আচারিয়া, ব্যাপারটার গুরুত্ব আপনি নিশ্চয় বুঝছেন। আমি আরও খোলাখুলি বলছি—এখানকার যিনি রেজিস্ট্রার তিনিও আপনার মতো মোচড় দিচ্ছেন। বায়না ধরেছেন পাস-করা এঞ্জিনিয়ারের সই চাই জমির প্ল্যানে। কুড়িদিন ধরে আপনি সার্ভে করছেন। তার সাক্ষীপ্রমাণ আছে। এ ক্ষেত্রে আপনার তো কোন রিস্‌ক নেই। সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার ম্যাপে ভুল থাকতে পারে না। আপনার আপত্তিটা কোথায়?

আমি বললুম : সে আপনি বুঝবেন না।

আপনার জিদ?

জিদ বলেন জিদ!

সেদিনই সন্ধ্যাবেলায় একটা পদত্যাগ পত্র লিখে দেখা করলুম শ্যামসুন্দরজীর সঙ্গে। শ্যামসুন্দরজী যেন একেবারে অন্য মানুষ। যেন কোম্পানীর প্রবলপ্রতাপান্বিত ডাইরেক্টর অন্য কেউ। রীতিমতো আপ্যায়ন করে বসালেন আমাকে। সিগারেটের টিনটা এগিয়ে দিয়ে বললেন : কী সব ছেলেমানুষী করছেন? কাগজগুলোয় সই করে দিন।—একটু বিচিত্র হাসি হেসে নীচু গলায় বলেন—আর আপনাকেও ফাঁকি দেব না। বড় রকম একটা লিফ্‌ট তো পাবেনই নগদও কিছু দেব ধরে।

বললুম : ঘুষ?

শ্যামসুন্দরজী রাগ করলেন না; হেসে বললেন : জিনিসটার অষ্টোত্তরশত নাম আছে। দিল্লীতে ওর নাম 'দস্তুরী', পঞ্জাবে 'ইনাম', বিহারে বলে 'এথি' আর আপনাদের খাস বাঙলায় বলে

pathagar.net

'পান খেতে দেওয়া'। তামিল-তেলুগুতে কি বলে ঠিক জানি না, তবে আপনাদের মতো মরালিস্টদের জন্য আমি যে শব্দটা ব্যবহার করি তা হল 'অনারেরিয়াম্'।

টেবিল থেকে চেকবইটা টেনে নিয়ে একটি সই করেন প্রথম পাতায়। বেয়ারার চেকখানা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেন: টাকার অঙ্কটা ওতে বসানো নেই। সেটা তুমিই বসিয়ে নিও। বিশ্বস্ত লোক দিয়ে এটা আজই কলকাতায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। কলকাতায় তোমার কোন বিশ্বস্ত লোকের নাম বল—যে টাকাটা ক্যাশ করে আণ্ডারগ্রাউণ্ড করবে। তুমি এখান থেকে ট্রাঙ্ককলে তার সঙ্গে কথা বলে নিজে কানে শুনে সই দিও।

আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম—কী পরিপাটি ব্যবস্থা! আণ্ডার-গ্রাউণ্ড জগতে এভাবেই বোধ হয় লেন-দেন হয়—পাপের কেনাবেচা চলে! আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে শ্যামসুন্দরজী বললেন: কী ভাবছ? কত টাকার অঙ্ক বসাবে?—একটু হেসে বলেন,—আমার দিকটা তোমাকে ভাবতে হবে না। নিজের দিকটা ভাব।

নিজের দিকটা মানে?—আপনা থেকেই প্রশ্নটা করে বসলুম।

মানে কতটা হজম করতে পারবে—

বললুম: কত আছে এ অ্যাকাউণ্টে?

এ প্রশ্নে খুশী হলেন শ্যামসুন্দরজী, বলেন: ঠিক কথা। ওটা আগেই বলা উচিত ছিল আমার। ঠিক জানি না, লাখ সাতেক হবে বোধ হয়।

চেকটা বাড়িয়ে ধরেন উনি।

বললুম: ওটা থাক। এটাও রাখুন বরং।

এবার আমিই বাড়িয়ে ধরলাম হাতে লেখা পদত্যাগ পত্রখানা।

সেটার উপর চোখ বুলিয়ে শ্যামসুন্দরজী গম্ভীর হয়ে বলেন: এই কথা? কিন্তু একমাসের নোটিশ দেওয়ার শর্ত ছিল দু-পক্ষেই।

বললুম: আমার বক্রী মাইনে আমি চাই না।

pathagar.net

আপনি সই করবেন না ?

কথাটা কোন ভাষায় বললে আপনারা বুঝবেন জানি না, তামিল তেলুগু আমার জানা নেই, ইংরেজী ও হিন্দীতে তো ইতিপূর্বেই বলেছি।

চেকটা ছিঁড়ে ফেলে শ্যামসুন্দরজী বলেন : আপনি এখন যেতে পারেন।

তৎক্ষণাৎ ফিরে এলুম নিজের ঘরে। মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে অতিথিশালার বেহারাটাকে বললুম একটা কুলি ডেকে আনতে। বাসস্ট্যাণ্ডে যাব। আশ্চর্য, লোকটা একটি লম্বা সেলাম করে বললে : হুকুম নেই সাব।

হুকুম নেই ? মানে ?—একটু সচেষ্ট হতেই বুঝতে পারা গেল ব্যাপারটা। অতিথিশালার বিশাল চৌহদ্দির বাইরে যাবার অধিকার আমার নেই। গেটের পাশে যে বন্দুকধারী সেপাইটা বসে আছে সেও সবিনয়ে নিবেদন করলে—বাইরে যেতে হলে পাস লাগবে। পাস ? কোথায় পাব ? তার জবাবে ওরা বললে—তা ওরা জানে না ; তবে পাস ছাড়া কাউকে এ বাড়িতে ঢুকতে বা বার হতে দেওয়া হবে না।

সেক্রেটারী সাহেবকে বললুম : এর মানে কি ?

সেক্রেটারী বাঁকা হাসি হেসে বলেন : এর মানে তো সরল। অন্য এঞ্জিনিয়ার আনবার ব্যবস্থা হয়েছে। তবে যতদিন না রেজিস্ট্রেসান হচ্ছে ততদিন আপনাকে অনুগ্রহ করে এই প্রাসাদেই রাজ-অতিথি হিসাবে থাকতে হবে।

রুখে উঠে বললুম : জোর করে এভাবে কাউকে আটকে রাখলে ইণ্ডিয়ান পিনাল কোডে তার কি শাস্তির ব্যবস্থা আছে জানেন ?

উনি হেসে বললেন : না জানলেও আন্দাজ করতে পারি। কিন্তু আপনি কি আন্দাজ করতে পারেন, এইসব রাজা-মহারাজাদের পেনাল কোডে রাজ-ইচ্ছায় বাধাদানের জন্যে কি শাস্তির ব্যবস্থা আছে ?

দিন সাতেক কাটল নিরুপদ্রবে। আশ্চর্য, কে বলবে আমি

Pathagar.net

বিংশ শতাব্দীর মানুষ। কে বলবে, ইংরেজ-শাসিত ভারতখণ্ডের মধ্যেই বাস করছি আমি। বুঝলাম এখানে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে ঘোরাফেরা করায় কোন বাধা নেই। শুধু টেলিফোনটি ছোঁয়া বারণ। শ্যামসুন্দরজী, সেক্রেটারী সাহেব, সিংজী প্রভৃতি খুব ব্যস্ত। কুমার সাহেবের গাড়ি দিনের মধ্যে দু-তিনবার করে আসছে। অপরিচিত চেহারাও দেখছি। আমাকে বারণ করে দেওয়া হয়েছিল যেন বাইরের কোন লোকের সঙ্গে কথা না বলি। সে নির্দেশ আমি মেনে চলেছিলাম।

দিন কয়েক পরে এল রামালু। প্রথমটা অবাক হলেও পরে বুঝতে পারি ব্যাপারটা। রামালুকে পাঠানো হয়েছিল দৌতকার্যে। রুস্তমজী শেরের ভাষায় জংলী-চিড়িয়াকে মিঠি মিঠি বোল শেখানোর প্রয়াস। আমাকে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করল রামালু। আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম। রামালু বললে : আপনার আসল আপত্তিটা কোথায় ? সত্যিই তো এতে আপনার কোনও রিস্‌ক নেই।

সেক্রেটারী সাহেবকে বলিনি। সিংজী, শ্যামসুন্দরজীকে বোঝাবার চেষ্টা করিনি। কিন্তু রামালুকে বললুম : আসল আপত্তিটা কিসের শুনবে ? বলি শোন—

সব কথা বললুম রামালুকে সংক্ষেপে। আমাদের পাঁচ পুরুষের জীবন কথা। সত্যের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে আমাদের বংশের সংগ্রাম। শেষে বললুম—স্বাধীনতার জন্যে একদিন আমাদের দেশের মানুষ হাসি মুখে ফাঁসি গেছে। সেই স্বাধীনতা আজ এতদিনে এল। কিন্তু ভেবে দেখ এর জন্যে তুমি আমি কি করেছি ? রামালু, এ স্বাধীন ভারত তোমার, এ স্বাধীন ভারত আমার ! এরা তার কয়েক কোটি টাকার খনিজ সম্পদ লুট করে নিতে চায়। আর তুমি বলছ তাতে আমার সই দিতে ?

মাথাটা নীচু হয়ে গেল রামালুর। চুপ করে কি যেন ভাবল খানিকক্ষণ। তারপর সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে বললে : আপনি ঠিকই

pathagar.net

বলেছেন স্যার। আমাকে মাপ করবেন। আমি আপনার কথাই মেনে চলব। বলুন কি করতে হবে।

কি করতে হবে তা কি ছাই আমি জানি? কিন্তু বুদ্ধি যোগালো রামালুই। বললে: স্যার, আমাদের কেরালার চাষীরা কথায় বলে —মহাজনকে মহাজনী ফাঁদে ফেলায় পাপ নেই। ওদের উদ্দেশ্য যদি ভেঙে দিতে চান, তাহলে আপনাকে কিছু মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে। আপনি তাতে রাজী?

আমি নিশ্চিত জানি, আমার দাদুকে এ প্রশ্ন করলে তিনি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতেন। কোন অবস্থাতেই মিথ্যার সঙ্গে আপস করা তাঁদের ধাতে নেই। এখানেই দাদুর সঙ্গে আমার তফাত। আমি মনে করি, বাস্তব-ঘটনার বিপরীত ভাষাকেই মিথ্যা বলে না। তার ফলশ্রুতিই মিথ্যার মূল উপাদান। যে ভিখারীটি প্রাণভয়ে পলাতক শ্রেষ্ঠী কোন পথে গেছে তা পশ্চদ্ধাবনকারী দস্যুকে না বলে দিয়ে উল্টো পথের নির্দেশ দিয়েছিল তাকে এককথায় আমি মিথ্যাবাদী বলতে পারব না। সত্যরক্ষার জন্য শহীদ হতে পারলে ধন্য হব— কিন্তু তাই বলে ক্যাসেবিয়াঙ্কাকে আমি শহীদ বলে মনে করি না। ক্যাসেবিয়াঙ্কা তো দূরের কথা, চার্জ-অফ-দ্য-লাইট ব্রিগেডের বীরত্বের মধ্যেও—

সময় বেশী নেই স্যার কি করবেন বলুন।

বললুম: কি করতে হবে আমাকে?

ওরা এখনও কোন এঞ্জিনিয়ারের সন্ধান পায়নি। আপনি বলুন সই করতে আপনি রাজী আছেন। আমি আপনার মালপত্র নিয়ে আজই চলে যাই। কাল-পরশু দুদিন কোর্ট বন্ধ। বুধবারের আগে আর কিছু হবে না। আপনি রাজী হলেই দেখবেন ওদের পাহারার ব্যবস্থা শিথিল হয়ে গেছে। এ দুদিন খালি বাইরে বাইরে ঘুরবেন— কিন্তু ভুলেও বাস-স্ট্যাণ্ডের দিকে যাবেন না। ওদের বুঝতে দিন— পালাবার কোন ইচ্ছা আপনার নেই। তারপর মঙ্গলবার সন্ধ্যায়



pathagar.net

খালি হাতে বেড়াতে বের হবেন। সোজা গিয়ে উঠবেন সাতটা দশের বাসে! আমি টিকিট কেটে বাস-স্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা করব। রাত এগারোটায় পৌঁছেবেন রোড-স্টেশনে। সেখান থেকে প্যাসেঞ্জার ধরে ভাইজাগ!

আশ্চর্য ধূর্তলোক। যে কথা বারে বারে ভেবেছি, আবার তাই মনে হল। এমন কর্মচারী পাওয়া ভাগ্যের কথা তবু বলি: তা তো সম্ভব নয় রামালু—যাবার আগে আমাকে একবার রঞ্জনার সঙ্গে দেখা করতে হবে।

রামালু ব্যস্ত হয়ে বলে! জানি স্যার জানি। কিন্তু সে চেষ্টাও করবেন না। তাহলেই ধরা পড়ে যাবেন। আমি বরং রঞ্জনা দেবীকে নিয়ে পরে যাব!

রামালুর নির্দেশিত পথেই পালিয়ে এলুম শেষ পর্যন্ত। কোন বেগ পেতে হয় নি। বাস-স্ট্যাণ্ডে টিকিট কেটে অপেক্ষা করছিল রামালু। তাকে আড়ালে ডেকে বলি: রঞ্জনার দেখা পেয়েছ? কি ব্যবস্থা করলে?

রামালু জবাব দিল না। বাসে অনেক লোক। চারিদিকে তাকিয়ে দেখল একবার। তারপর ঠোঁটের উপর আঙুল ছোঁয়ালো। বললুম: বুঝেছি, তুমি সেখানে খোঁজ করনি। বেশ দরকার নেই, আমিই যাব একবার গেস্ট-হাউসে।

ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হল রামালুর। সরে গেল আমার সামনে থেকে। একটু দূরে আলোর নিচে দাঁড়িয়ে ডায়েরির পাতায় কি দু-চার ছত্র লিখে পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে এল। আমার কানে কানে বললে: বেশী কথা বলবেন না, টুপিটা নামিয়ে বসুন—মুখে ছায়া পড়ুক; আর এই চিঠিখানা বাস ছাড়লে পড়বেন।

বাস ছাড়ল; কিন্তু বাসে আলো নেই। অগত্যা রামালুর চিঠিখানা পড়া হল না। মধ্য রাত্রে রোড-স্টেশনে পৌঁছে স্টেশনের স্তিমিত আলোয় পড়লুম রামালুর সংক্ষিপ্ত পত্র। রামালু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছে দুঃসংবাদটা। রঞ্জনার সঙ্গে দেখা করবার

pathagar.net

চেষ্টা সে করেছিল। দেখা হয় নি। কারণ রঞ্জনা জীবিত নেই। রঞ্জনা আত্মহত্যা করেছিল রুদ্ধদ্বার কক্ষে।

প্রিয়দার ডায়েরি শেষ করে আমার মনে হয়েছিল--কেন এমন হল? সমস্যার এ জাতীয় সমাধানে আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। অক্ষম ঔপন্যাসিক যেমন কূলকিনারা হারিয়ে তার উপন্যাসের দু-একটা চরিত্রকে বেমক্কা মেরে ফেলেন—বিশ্বনিয়ন্তাও যেন তেমন প্রিয়দার জীবননাট্য লিখতে বসে আচমকা সরিয়ে দিলেন রঞ্জনার চরিত্রকে। এ যেন স্রেফ গোঁজামিল! রঞ্জনার পক্ষে আত্মহত্যা করা অবশ্য এমন কিছু অসম্ভব নয়—যে রাত্রে সে এই চরম সিদ্ধান্ত নেয় সে রাত্রে তার মানসিক স্থৈর্য ছিল না। তার পূর্বরাত্রেই কুমারী মেয়েটির চরম সর্বনাশ ঘটেছে, এবং সেই সব-হারানোর হাহাকারে যখন তার দেহ-মন অবশ হয়ে পড়েছে তখনই প্রিয়দা এসে শুনিয়েছে তাকে সব পাওয়ার গান। বেচারী সহ্য করতে পারে নি! কিন্তু তা হোক, আমি ভাবছিলাম—যদি রঞ্জনা আত্মহত্যা না করত তাহলে কি হত? ডায়েরি শেষ করে সেই কথাটাই আমার বারে বারে মনে হয়েছিল।

তাহলে কি প্রিয়দা সত্যই বিয়ে করত তাকে? করত নিশ্চয়ই কথা দিয়েছে যখন। কিন্তু তারপর? সত্যপ্রিয় পারলেও সত্যানন্দ পারতেন না। প্রিয়দা কিছুতেই লুকিয়ে যেতে পারত না রঞ্জনার ইতিহাস। মিথ্যা কথা বলতে পারত না দাদুকে। তাহ'লে? চির বিচ্ছেদ ঘটে যেত দুজনে। সত্যানন্দ তর্করত্ন বনাম সত্যপ্রিয় আচার্য বি. ই-র আদর্শগত দ্বৈরথ সমরটা তা'হলে দেখতে পেতুম আমি।

আমার দৃঢ় ধারণা, অমন একটা কিছু ঘটলে কুলীনকঠোর তর্করত্নমশাই কিছুতেই ক্ষমা করতেন না পৌত্রকে। আগেই বলেছি, আমি তাঁকে জীবনে মাত্র একবার দেখেছি। বর্ধমান ফ্রেজার হাসপাতালে। বিচিত্র পরিবেশ। অ্যাকসিডেন্টে আহত হয়ে

pathagar.net

বি. ই. কলেজের বিশ-বাইশজন ছাত্র আশ্রয় নিয়েছে ওখানে। পূর্বদিন খবরের কাগজে যে সংবাদ বের হয়েছিল সেটা ভয়াবহ। মাঝে মাঝে খবরের কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতারা যে কি রকম দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে পড়েন—এটি তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। সংবাদে বলা হয়েছিল—বি. ই. কলেজ থেকে একদল ছাত্র রণ্ডিয়া ড্যাম দেখতে যায় এবং পথে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রায় বিশজন ছাত্র আহত হয়েছে। একজন মারা গেছে এবং পাঁচজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। সংবাদদাতা কারও নাম উল্লেখ করেননি। এমনকি কোন ইয়ারের ছাত্রদল স্টাডি টুরে বেরিয়েছিল তাও বলেননি। ফলে পরদিন বি. ই. কলেজে এসেছিল নিরবচ্ছিন্ন টেলিফোন আর অসংখ্য টেলিগ্রাম! কলেজের ছাত্র সংখ্যাকে তার আত্মীয় পরিজন বন্ধুর সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে যে সংখ্যাটি উৎপন্ন হয় তা তো নেহাত কম নয়! সকলের কথা জানি না। আমার মায়ের কথাটা জানি। আমি আটক পড়েছিলাম। বাদলকে পাঠিয়েছিলাম আমার মায়ের কাছে। বাদল সরকার আমার সতীর্থ, ধর্মে খ্রীষ্টান। আমার মা তার কথা বিশ্বাস করেননি। বলেছিলেন: কি হয়েছে তার, আমাকে তুমি সত্যি করে বল। আমি অনেক সয়েছি জীবনে, এও সইতে পারব—বল তুমি।

মাথা চুলকে বাদল বলেছিল: বিশ্বাস করুন মাসীমা। তার একটুও লাগেনি। এক ফোঁটা আইওডিন লাগাতে হয়নি তার গায়ে।

তাহলে সে ফিরে এল না কেন বর্ধমান থেকে?

কি করে আসবে? সকলের টাকা-পয়সা, ঘড়ি-আংটি সব যে তার কাছে। অতগুলো ছেলের দেখা-শোনাও করতে হবে—

আমার মা বাদলের হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর ঠাকুরঘরে। বলেছিলেন: আমার ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়ে বল দেখি ও কথা!

বাদল পরে আমার কাছে স্বীকার করেছিল: আমি ভাই এমন

pathagar.net

বিপদে জীবনে পড়িনি। ভাবলুম, যদি বলি—আমি খ্রীষ্টান, আপনার ঠাকুর ছোঁব না,—তাহলে তোর মা বোধহয় সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতেন। ভাবতেন, ওঁর ঠাকুরের পা ছুঁয়ে মিথ্যে কথা বলতে পারছি না বলেই একথা বলছি।

বললুম: কি করলি তুই?

বাদল বলে: কি আবার করব, তোর মায়ের ঠাকুরের পা ছুঁয়ে বলে দিলুম। আর মনে মনে বললুম—হে মা কালী, হে মা মেরী—তোমরা দুজনেই আমাকে ক্ষমা কর।

যাক্ সে কথা। তর্করত্নের কথা বলি।

ফ্রেজার হাসপাতালের একটি বড় হল-এও কুলায়নি—বারান্দায় মাটিতে শোয়ানো হয়েছে বন্ধুদের। কলকাতা থেকে খবর পেয়ে অনেকে এসেছেন। ছাত্র এবং অধ্যাপক। আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয় হরভজন সিং গতরাত্রে মারা গেছে। তার বাবা এসেছিলেন। আমরা শ্মশান থেকে দাহ সেরে ফিরে এলাম আবার হাসপাতালে। এসে শুনি পৃথ্বীশ, অমিতাভ এবং বাসুদেবের অবস্থাও নাকি শোচনীয়। বাঁচে কি না বাঁচে।

বন্ধুদের অভিভাবকশ্রেণীর লোক একে একে আসছেন। আমার কাজ হচ্ছে তাঁদের তদারক করা। যার খোঁজে তিনি এসেছেন পথ দেখিয়ে তার কাছে নিয়ে যাওয়া। অনেক মহিলাও আসছেন তাঁদের সান্ত্বনা দেওয়া, ভরসা দেওয়া।

হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছেন একজন বৃদ্ধ। বলিরেখাঙ্কিত গৌরবর্ণ, উন্নত নাসা। মাথায় টাক পড়েনি—চুলগুলি ধপধপে সাদা, আর দীর্ঘ অর্কফলায় একটি লাল করবী ফুল। গায়ে ফতুয়ার উপর উত্তরীয়, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। বয়স আশির কাছাকাছি, কিন্তু সোজা হেঁটে আসছেন তিনি—ধীরে ধীরে। ঠিক পিছনে পিছনেই আসছে একজন ভৃত্যশ্রেণীর লোক—তার হাতে একটি থলি।

pathagar.net

আমি এগিয়ে এসে বললুম : কাকে খুঁজছেন আপনি ?

সিঁড়ি ভেঙে দ্বিতলে আসতে রীতিমতো পরিশ্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। দম নিয়ে বললেন : কাউকে খুঁজছি না বাবা। আজকের কাগজ পড়ে তোমাদের দেখতে এসেছি। তোমার লাগেনি বুঝি কোথাও ?

আজ্ঞে না। কিন্তু আমাদের ক্লাসের কেউ কি আপনার আত্মীয় ?

বৃদ্ধ আমার কথার জবাব না দিয়ে সামনের ছেলেটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে ব্যস্ত। বলছেন : বাঁ হাতে চোট লেগেছে বুঝি ? ও কিছু নয়, ঠিক হয়ে যাবে। কষ্ট হচ্ছে খুব ?

ছেলেটি মাথা নেড়ে বললে : না।

বৃদ্ধ তাঁর ভৃত্যের হাতের থলি থেকে দুটি কমলালেবু নিয়ে ওর টেবিলে রাখলেন। তারপর এগিয়ে গেলেন পরের ছেলেটির দিকে।

আমি অবাক হয়ে ভাবছি—কে এই বৃদ্ধ ? নিশ্চয়ই ইনি আমার কোন সতীর্থের আত্মীয়। কিন্তু কার ? আশ্চর্য, ইনি তো তার খোঁজই নিলেন না।

সঙ্গে লোকটি আর থাকতে পারল না। হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বলে : বাবু, কাগজে লিখেছে, একজন নাকি—

দশরথ !—ঘুরে দাঁড়িয়েছেন বৃদ্ধ।

লোকটি মাথা নিচু করল।

আমি বললুম : হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে একজন মারা গেছে। আমরা তাকে এইমাত্র দাহ করে ফিরে আসছি।

তাকিয়ে দেখি নিমীলিত নেত্রে বৃদ্ধ অপেক্ষা করছেন। দশরথ থরথর করে কাঁপছে। আমার মনে পড়ল—যে ভুল সংবাদদাতা করেছেন ঠিক সেই ভুলই করছি আমি। তাড়াতাড়ি বললাম—আমার সেই সতীর্থের নাম হরভজন সিং।

বৃদ্ধ চোখ মেলে চাইলেন, বললেন : তার আত্মীয়স্বজন কেউ এসে পৌঁছাননি ?

pathagar.net

আজ্ঞে হ্যাঁ। হরভজনের বাবা খড়্গপুর থেকে এসেছেন।

বৃদ্ধ একের পর এক সকলের সঙ্গে দেখা করলেন। ঘুরতে ঘুরতে এক সময় এসে দাঁড়ালেন প্রিয়দার সামনে। ঠিক একই সুরে বললেন: তোমার দেখছি কপাল ভেঙেছে। ফাটা কপাল জোড়া-লাগা মুশকিল! আর কিছু কষ্ট নেই তো?

প্রিয়দা মাথা নেড়ে জানালো—না।

প্রিয়দার টেবিলেও একজোড়া কমলালেবু রেখে বৃদ্ধ এগিয়ে গেলেন ও পাশের রোগীটির দিকে। আর আশ্চর্য শিক্ষা দশরথের। থলি হাতে সেও এগিয়ে গেল পিছু পিছু। প্রিয়দা আমাকে চোখের ইশারায় ডেকে বললে: চিনলি?

না! কে?

অত বড় টিকি দেখেও চিনলি না?

বললুম: আমারই ভুল! এবার চিনেছি। টিকি নয়, ওঁর ব্যবহারেই চিনেছি। শুনি চৈব স্বপাকো চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ! পণ্ডিত সত্যানন্দ তর্করত্নমশাই!

এমন মানুষটি কি ক্ষমা করতে পারতেন প্রিয়দাকে—যদি সে রঞ্জনাকে আচার্যবাড়ির বউ করে নিয়ে আসত! কখনই না। প্রিয়দার জীবন-নাট্যকার তাই চট করে নেপথ্যে সরিয়ে দিলেন রঞ্জনাকে। মনে আছে ডায়েরি শেষ করে প্রিয়দার ভাগ্যদেবতাকে উপহাস করে বলেছিলুম: তুমি ভীরু, তাই এড়িয়ে গেলে সিচুয়েশনটা।

নির্বিকার নাট্যকার আমার সে ব্যঙ্গোক্তিতে ভ্রূক্ষেপও করেননি।

আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয় সারাটা জীবনই একটা ট্রেন-জার্নি। তফাত শুধু এই যে, পকেটে যে টিকিটখানা আছে সেটা দেখা হয়নি। অর্থাৎ আমি কখন কামরা থেকে নামব তা জানা হয়নি। প্রথম যে কামরাটায় উঠে বসেছিলুম তাঁর যাত্রিদলের

pathagar.net

সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। মনে হয়েছিল, ওরা বুঝি এ কামরাটার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ; কখন একে একে তারা নেমে গেছে ঠিকমতো খেয়ালই করিনি। বাল্যের যে চেনামুখগুলি ছিল আমার দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আজ তারা আমার স্মৃতি থেকেও গেছে হারিয়ে। কখন নূতন নূতন স্টেশন থেকে উঠেছে নূতন নূতন যাত্রী। জমিয়ে নিয়েছি তাদের সঙ্গেও। আমি বসে আছি গ্যাঁট হয়ে, খেয়াল নেই কখন অলক্ষিতে মাইলের পর মাইলের মতো পিছনে ফেলে এসেছি বছরের পর বছর। অন্ধের মতো ছুটে চলেছি সমুখপানে। খেয়াল নেই, ওরই মধ্যে আবার কখন যাত্রীদের সাজ বদল হয়েছে। যাদের সঙ্গে পান সিগারেট আর টিফিন-ক্যারিয়ারের খাবার ভাগ করে নিয়েছিলুম—বেঞ্চির দখল আর বাঙ্কের ঠাঁই নিয়ে যাদের সঙ্গে করেছি তুমুল ঝগড়া, তারা সে বেঞ্চি আর বাঙ্কের অধিকার কখন অজান্তে ত্যাগ করে সরে গেছে নেপথ্যে। আমি শুধু চলেছি আর চলেছি—এ কামরায় যেন আমার মৌরসী-পাট্টা। এ বেঞ্চির এ বন্দোবস্ত যে আমার পক্ষেও চিরস্থায়ী নয় তা যেন খেয়ালই নেই।

কলেজজীবনে যে প্রিয়দা ছিল আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু তাকেও কখন অজান্তে হারিয়ে ফেলেছিলুম চাকরিজীবনে ঢুকে! আর শুধু যে হারিয়েই ফেলেছি তা নয়, হারিয়েছি যে তা খেয়ালই করিনি। বদলি হয়েছি এখান থেকে সেখানে, এ জেলা থেকে সে জেলায়। জড়িয়ে পড়েছি সংসারে। কখনও কখনও পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা-শোনা হলে কলেজজীবনের প্রসঙ্গ উঠেছে। পুরাতন বন্ধুদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। হয়তো প্রিয়দার নামও উচ্চারিত হয়েছে কথাপ্রসঙ্গে; কিন্তু কেউ বলতে পারেনি, সে কোথায় আছে অথবা কি করছে।

তার পর একদিন। অপ্রত্যাশিতভাবেই দেখা হয়ে গেল ফের। গয়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। সেটা যতদূর মনে হচ্ছে তিপ্পান্ন সাল।

pathagar.net

হ্যাঁ তিপ্পান্নই হবে। আমি তখন কৃষ্ণনগরে পোস্টেড। গিয়েছিলাম মেজদির কাছে পাটনায়। সেখান থেকে যাব আমার ছোটদার কাছে গ্র্যাণ্ড-কর্ড-লাইনের ডিহিরী-অন-শোনে। গয়াতে বদল করতে হবে গাড়ি। গয়া স্টেশনে এসে যখন প্যাসেঞ্জারখানা পৌছাল তার আগেই আপ মেলটা চলে গেছে। পরের ট্রেনখানা আসতে ঘণ্টা দুয়েক দেরি। উপায় নেই। মালপত্র কুলির মাথায় চাপিয়ে রওনা দিলাম বিশ্রামাগারের দিকে। ওয়েটিংরুমটা প্রায় খালি শুধু কোণায় একটা হোল্ড-অলের উপর বসে আছে বছর পাঁচেকের একটি ফুটফুটে বাচ্চা ছেলে। পরনে হাফ প্যাণ্ট, হাফ শার্ট—টুমটুম্ হয়ে বসে আছে হাঁটু জোড়া দুহাতে জড়িয়ে,—আর জুলজুলে চোখে সে লক্ষ্য করছে আমাকে। টুকটুকে ফর্সা, ভারী মিষ্টি চেহারা। কৌতুহল হল। একা একা বসে আছে এতটুকু বাচ্চা, ব্যাপারটা কি? এগিয়ে গেলুম তার কাছে, ভাব জমাতে।

হিন্দীতে প্রশ্ন করলুম—তোমার নাম কি?

একনজর আমাকে দেখে নিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—' এস, আচারিয়া।

আচারিয়া! নির্ঘাত বেহারী। বললুম—ওর কৌন হ্যায় তুমহারা সাথ!

ড্যাডি।

কাহাঁ গয়ে হ্যাঁয় তুম্হারা ড্যাডি?

জান্নে!

জান্নে! এ আবার কি? বললুম—তুমি বাঙালী নাকি!

আপনি শুধুমুধু হিন্দী বলছেন কেন?

ভারী মজা তো! ছেলেটিকে ডাকলাম কাছে। প্রচণ্ডভাবে মাথা নেড়ে শ্রীমান আচারিয়া যা বললে তার নির্গলিতার্থ হচ্ছে—তার ড্যাডির নিষেধ আছে। ড্যাডি যাবার আগে বলে গেছেন,



pathagar.net

তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত যেন ক্যাসাবিয়াঙ্কার মতো সে ঐ হোল্ড-অলের উপরে টুমটুম হয়ে বসে থাকে। মহম্মদ যখন পর্বতের কাছে যেতে পারেন না তখন পর্বতকেই মহম্মদের কাছে এগিয়ে আসতে হয়। তার পাশাপাশি বসে তার সঙ্গে আলাপ জমালুম। ভারী সুন্দর ছেলেটি। দু মিনিটেই গভীর প্রণয় হয়ে গেল তার সঙ্গে। ওর বাবা নাকি গয়াতেই থাকে। ও থাকে হাজারীবাগে। ওর ডাকনাম কাবুল। সেখানকার, স্কুলে এ বছরই মাত্র ভর্তি হয়েছে। ওদের স্কুলে খেলার মাঠ আছে; স্লিপ আছে। ও সম্প্রতি ক্রিকেট খেলা শিখেছে। ওদের স্কুলে বব্ খুব ভাল বল দিতে পারে। গুগলি। আমাকে বল্‌লে—আপনি বল দিতে পারেন?

আমি বললুম: আলবৎ।

আণ্ডার হ্যাণ্ড না রাউণ্ড হ্যাণ্ড?

দুইই।

তাহলে দাঁড়ান, বার করি। আমার কাছে ব্যাট বল দুই আছে।

আমি বললুম: তা কেমন করে হয়? আমি না হয় দাঁড়ালুম তুমি দাঁড়াবে কেমন করে?

কেন?

তোমার যে দাঁড়ানো মানা, ড্যাডি ফিরে না আসা পর্যন্ত।

তাই তো! বেচারা ম্লান হয়ে গেল। বললে: আচ্ছা ড্যাডি আগে ফিরে আসুক।

ড্যাডি অবশ্য অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলেন। কিন্তু খেলা আর হল না। যা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি এবং যা আমার পাঠক অনেক আগেই অনুমান করেছেন তাই ঘটল। ফিরে যিনি এলেন তিনি আর কেউ নয় সত্যপ্রিয় আচার্য!

মাথায় উঠল ডিহিরী যাওয়া। প্রিয়দা কিছুতেই ছাড়ল না, যেতে হল তার ডেরায়।

pathagar.net

বললুম : বিয়ে করলে কবে ?

বহুদিন।

একটা খবর দিলে না ?

ম্লান হাসল প্রিয়দা।

প্রিয়দার ডেরা গয়া স্টেশন থেকে মাইল পনর দূরে। একেবারে ফাঁকা নির্জন জায়গা। কি একটা নদীর উপর তৈরী হচ্ছে নূতন সাঁকো। ওয়েল সিঙ্কিং এর কাজ গত বছর শেষ হয়েছে। এখন উঠছে গাঁথনি। বড় বড় গার্ডার এসে জমা হয়ে আছে। সি. পি. ডাব্লু ডি-র কাজ। প্রিয়দা হচ্ছেন কনস্ট্রাকসন এঞ্জিনিয়ার। নামকরা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় কর্মকর্তা। জীপ দিয়েছে একখানা। নিজেই চালিয়ে নিয়ে এল আমাদের। ব্রীজ অ্যাপ্রোচের কাছে ওর কোয়ার্টার্স তৈরী হচ্ছে। এখনও শেষ হয় হয়নি। অগত্যা দুকামরার তাঁবুতে আপাতত বাস করতে হচ্ছে প্রিয়দাকে সপরিবারে। পরিবার বলতে অবশ্য দুটি মাত্র প্রাণী। স্বামী স্ত্রী। একমাত্র ছেলেটিকে দিয়েছে হাজারীবাগ স্কুলে। পূজার ছুটিতে ছেলেকে আনতে গিয়েছিল স্টেশন থেকে।

তাঁবুর কাছাকাছি এসে থামল জীপটা। একটি বেহারী চাকর খানকয় স্টীলের চেয়ার এনে পেতে দিল তাঁবুর সামনে গাছতলায়। কঞ্চির বেড়া দিয়ে ঘিরে তাঁবুর সামনে একটা ছোট বাগান মতোও করা হয়েছে। গোলাপ আর পাতাবাহারের গাছ লাগানো হয়েছে যত্ন করে। সীড বেডে ছোট ছোট মরশুমী ফুলের চারা সবুজ মাথা তুলে উঁকিঝুঁকি মারছে। ডায়ান্থাস, ফ্লক্স আর ডালিয়া বলে মনে হচ্ছে। আরও পাতা না ছাড়লে বোঝা যাবে না। আমরা গিয়ে বসলুম বাগানে। কাবুল একছুটে ঢুকে গেল তাঁবুর ভিতরে। প্রিয়দাও গেল তার পিছনে।

বসে বসে দেখছি চারিদিকে। কার্তিক মাস। নদীর ধারে ধারে বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত। ধান পেকে এসেছে। সোনালী সবুজ সমুদ্রে

pathagar.net

হাওয়ার নাচন। ওপাশে ওগুলো বোধহয় আখ গাছ। মাথায় আরও লম্বা। অল্প দূরে—ঐ টিলাটার ওপাশে নিশ্চয়ই রিভেটিং-এর কাজ হচ্ছে। নিরবচ্ছিন্ন যান্ত্রিক আওয়াজ ভেসে আসছে সেদিক থেকে। একজোড়া ধূসর রঙের ঘুঘু বসে আছে সামনের বিরল-পত্র বাবলা গাছে। একটা মাল বোঝাই লরী চলে গেল সামনের সড়কটা দিয়ে। সিমেন্টের বোরা। স্টেশন থেকে এল বোধহয়। পিছনে রেখে গেল একটা ধুলোর ঝড়। দূর আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে একটা নিঃসঙ্গ চিল। তার ডানায় লেগেছে সোনালী-সূর্যের আলো।

একটু পরেই তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল প্রিয়দা। সঙ্গে স্ত্রী এবং আঁচল ধরে বাচ্চাটা।

প্রথা মাফিক প্রিয়দা আলাপ করিয়ে দেয়—আমার বিশেষ বন্ধু এবং সহপাঠী। ওর সঙ্গে সাবধানে কথাবার্তা বলবে। ও হতভাগা আবার গল্প লেখে, কখন ফস্ করে তোমার কথা ঢুকিয়ে দেবে ওর কোন আষাঢ়ে গল্পে।

আর আমার দিকে ফিরে বলে: এর পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মিসেস্ আচার্য।

ভদ্রমহিলার দিকে একনজর দেখেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম আমি। মনে হল প্রিয়দা ভাগ্যবান পুরুষ। বছর পঁচিশেক বয়স হবে হয়তো ভদ্রমহিলার। সুন্দর সুগঠিত দেহাবয়ব। মুখখানি ভারি মিষ্টি। চোখদুটি উজ্জ্বল—বিনা কাজলেই কাজলকালো হরিণনয়ন। কপালে কুমকুমের টিপ, মাথায় আলগা-করে জড়ানো এলো খোঁপার উপর আধ-ঘোমটা। সম্ভবত রান্না করছিল এতক্ষণ। ছাপাশাড়ির আঁচলটা জড়ানো আছে মাজায়। হাত দুটি বুকের কাছে যুক্ত করে বললেন: আপনি আসাতে যে কী খুশী হয়েছি, কী বলব। এ তেপান্তরে তো কেউ আসে না। কথা বলার মানুষই পাই না। আপনার অনেক কথা শুনেছি ওঁর কাছে। আপনার লেখা বইও পড়েছি

pathagar.net

একখানা। কি যেন পি. এল. ক্যাম্প। আজ চাক্ষুস দেখার সৌভাগ্য হল।

আমি বললুম: আমার কথা ঠিক উল্টো। আপনি পাঁচ-ছয় বছর হল এসেছেন প্রিয়দার জীবনে, অথচ আমরা কেউ তা জানি না। পাছে ইতরজনকে মিষ্টান্ন খাওয়াতে হয় তাই কিপ্‌টেটা এমন একখানা খবর স্রেফ চেপে গেছে! বন্ধু-বান্ধব কারও সঙ্গে চিঠিপত্র লেখে না। আজও হয়তো চেপে যেত আপনার কথা, যদি না ঘটনা-চক্রে তার আগেই আমি শ্রীমান কাবুলের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিতাম। আপনার কথা আমি জানতাম না, কিন্তু নামটা জানতাম। আজ চাক্ষুস দেখার সৌভাগ্য হল।

প্রিয়দা ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে নামটা জানতে? কেমন করে।

বললুম: উনি তোমার জীবনে আসার আগেই আমরা ওঁর নামকরণ করেছিলাম প্রিয়দা। তুমি ভুলে গেছ। পিতৃদত্ত নাম ওঁর যাই হোক না কেন এ তাঁবুতে ওর নাম—শ্রীমতী স্বাতী আচার্য!

হোহো করে হেসে ওঠে প্রিয়দা। মিসেস্ আচার্যও হেসে ওঠেন। তাই থেকে বুঝতে পারি প্রাক্‌বিবাহ যুগের সেসব পাগলামির কথা প্রিয়দা গল্প করেছে ওঁর কাছে। ধারণাটা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হওয়া গেল যখন মিসেস্ আচার্য মুচকি হেসে বলেন: কিন্তু চিত্রাদেবীর খবর কি? তাঁর উদয় কি হয়েছে পূর্বগগনে?

আমি জবাব দেবার আগেই—এখুনি আসছি—বলে দ্রুত ঢুকে গেলেন উনি তাঁবুর ভিতর। ঠিক কথা। কি একটা পোড়া পোড়া গন্ধ ভেসে আসছে বটে। কাবুলও ছুটল মায়ের পিছু পিছু।

প্রিয়দাকে একান্তে পেয়ে বলি: আচ্ছা প্রিয়দা, বিয়েতে আমাদের একটা খবরও দিলে না কেন? তোমার ঠিকানা আমরা কেউ জানতুম না, কিন্তু তুমি তো আমাদের ঠিকানা জানতে।

প্রিয়দা ম্লান হেসে বলে: বিশ্বাস কর ভাই, একদম সময় পাইনি। একেবারে হঠাৎই হয়ে গেল বিয়েটা, রেজিস্ট্রি মতে।



pathagar.net

অর্থাৎ লাভ-ম্যারেজ!

তখন মনে হয়েছিল লাভ-ম্যারেজ, এখন বুঝেছি লোকসান ম্যারেজ।

আমি বলি: থাক্ থাক্, আর ন্যাকামি করতে হবে না। কিন্তু এই ছয় বছরেও একটা খবর দিলে না কেন? তোমার লোকসানের, বহরটা আমরা দেখে যেতুম।

প্রিয়দা জবাব দিল না। তার দৃষ্টিটা অনুসরণ করলে দেখতে পাব দূর নীলাকাশের ঐ নিঃসঙ্গ চিলটাকে। দিগন্তের শেষ সীমানার বন্ধন অতিক্রম করে উপরে আরও উপরে উঠে যাচ্ছে সূর্যসাক্ষী ঐ সঙ্গীহীন চিলটা।

হঠাৎ দৃষ্টি নামিয়ে প্রিয়দা বললে: বড় গোলমালের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল এ ন'টা বছর। ইতিমধ্যে পাঁচটা চাকরি ধরেছি আর ছেড়েছি। কোথাও শান্তি পাই না। হয় ঝগড়া হয়ে যায়, নয় —।

কি যেন বলতে গিয়েও চুপ করে গেল সে। নিচু হয়ে একটা চোরকাঁটা তুলে নিয়ে নিঃশব্দে দাঁতে কাঠি দিতে থাকে। আমার কেমন যেন মনে হয় প্রিয়দা সুখী নয়। ওর চেহারাও বেশ খারাপ হয়ে গেছে এই ক'বছরে। আমার চেয়ে সে অনেক বেশী বুড়িয়েছে। কানের পাশে চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেছে। চোখের কোলে নেমেছে অন্ধকার। অথচ কতই বা বয়স ওর? রোগাও হয়ে গেছে অনেকটা। লক্ষ্য করে দেখলাম ওর চোখে সর্বদাই কেমন যেন একটা ক্লান্ত দৃষ্টির আভাস। একটু অবাক হতে হল। এমন সুন্দরী স্ত্রী, এমন ছোট্ট সংসার, এমন মনোরম পরিবেশ—তবু কি প্রিয়দা সুখী নয়? সে কি ভুলতে পারেনি রঞ্জনাকে? ওর জীবনের প্রথম প্রেমকে? এত দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও? অমন সুন্দরী সপ্রতিভ জীবনসঙ্গিনীর সান্নিধ্যেও?

*/ চকিতেও আর একটা সম্ভাবনার কথা মনে হল। দুনিয়ায় এমন মেয়ে নেই যে,. বিয়ের পর স্বামীকে সেই চিরন্তর প্রশ্নবাণটি নিক্ষেপ

pathagar.net

না করেছে—বিয়ের আগে তুমি কাউকে ভালবেসেছিলে ? দুনিয়ায় অবশ্য এমন স্বামীও নেই যে, এই অনিবার্য প্রশ্নটির উত্তরখানি টোপরের তলায় লুকিয়ে না নিয়ে যায় বিয়ে করতে। চাঁছা-ছোলা সত্যটাকে এড়িয়ে ধীরে ধীরে ব্যাপারটা ভাঙে। কেউ ডাহা মিথ্যে, কেউ আধা-সত্যের একটা প্রলেপে সত্যটাকে চিরকালের জন্য ঢেকে রাখে। বোধকরি আমাদের সত্যপ্রিয় আচার্য একমাত্র ব্যতিক্রম সত্যভাষণের দম্ভে হয়তো সে প্রথম সুযোগেই স্ত্রীকে খুলে বলেছে রঞ্জনার কথা—হয়তো ফুলশয্যার রাত্রেই। হয়তো মনে করেছে খুব এক বাহাদুরী দেখানো হল। হয়তো বলেছে—রঞ্জনাকে আজও সে ভালবাসে। তাকে পেলে ওর জীবন ধন্য হয়ে যেত। মূর্খ-সম্রাটটিকে তো হাড়ে হাড়ে চিনি। ওর অসাধ্য কাজ নেই। আর হয়তো ওদের নিভৃত সংসারের মর্মমূলে সেই সত্যভাষণের কাঁটাখানাই বিঁধে আছে চিরকাল। ওরা আর সহজ হতে পারছে না।

প্রিয়দা চোরকাঁটার কাঠিটা চিবাতে চিবাতে বললে : আমিই সিনিক হয়ে যাচ্ছি না দুনিয়াটাই পাগল হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারি না। কোথাও নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারি না। ইচ্ছে করে র‍্যানডাম্ চাবুক চালাই দু হাতে। চোর, সব শালা চোর, টপ্-টু-বটম !

ওর এ হঠাৎ উত্তেজনার অর্থ বুঝে উঠতে পারি না, বলি : কাদের কথা বলছ তুমি ?

বললুম তো ! টপ্-টু-বট্ম্। আগা-পাছ-তলা ! পাঁচবার রিসাইন দিয়েছি এ পর্যন্ত। প্রত্যেকবারই নিজের আদর্শকে বাঁচাতে। পাঁচ-বারই এমন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছি যে হয় আদর্শকে বিসর্জন দিতে হয়, নয় চাকরিকে ! দিস ইস্ মাই সিক্স্থ অ্যাটেম্প্ট্।

আমি বলি : দেখ প্রিয়দা, আদর্শকে বলি দিয়ে কম্প্রোমাইস করতে তোমাকে আমি বলব না। কিন্তু বিবর্তনবাদের মূল সূত্রটাকে



pathagar.net

এড়িয়ে তো তুমি চলতে পারবে না। তোমার চতুষ্পার্শ্বের সঙ্গে তোমাকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে যুগের তালে তাল দিয়ে যদি না চলতে পার তাহলে প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মতো, এই-সেদিন-ফুরিয়ে-যাওয়া ডোডো-পাখির মতো হারিয়ে যাবে তুমি। আজকের দিনে তোমার চারপাশে যারা আছে, তোমার উপরে ও নিচে যারা আছে তারা সবাই যদি ঘুষখোর আর সুবিধাবাদী হয় তাহলে দেখতে হবে কি করে তাদের সঙ্গেও মানিয়ে নিয়ে কাজ চালানো যায়। গোটা সমাজটা তো তুমি বদলাতে পারবে না—থামতেও পারবে না। এ ঠিক কম্প্রোমাইস্ নয়, একে আমি বলব অ্যাডজাস্টমেণ্ট।

প্রিয়দা হেসে বলে : শব্দ দুটি সমার্থক নরেন। সব ভাষাতেই অমন মনকে চোখঠারা শব্দ আছে ঝুড়ি ঝুড়ি। বিবেককে বুঝ দেবার জন্য আমরা এসব শব্দের আমদানি করেছি মাত্র। কম্প্রোমাইস্ আর অ্যাডজাস্টমেণ্ট? আমি তো মনে করি দুইই তামাক খাওয়া—দ্বিতীয়টা শুধু নলচের আড়াল দিয়ে।

আমি প্রতিবাদ করি : তা কেন?

আমাকে থামিয়ে দিয়ে ও বলে : তাই। একটা উদাহরণ দিই! আমি মনে করি আমি আমার আদর্শে 'ফার্ম'। তুই হয়তো মনে মনে আমার আদর্শকে শ্রদ্ধা করিস, তবু যেহেতু আমার এই আদর্শের বাতিকে তোর কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই তাই অনুকম্পা মিশিয়ে বলিস আমি 'অবস্টিনেট'। আর আমার স্ত্রীকে তার প্রত্যক্ষ ফল ভোগ করতে হয় বলে সে মনে করে আমি 'পিগ্-হেডেড'!

তাঁবুর দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করে বললুম : একটা কথা সত্যি করে বলবে?

প্রিয়দা মিটিমিটি হাসতে থাকে।

তৎক্ষণাৎ লজ্জা পেয়ে বলি : ভুল হয়েছে! সত্যি ছাড়া অন্য কিছু বুক ফুলিয়ে বলার 'মরাল-কারেজ' যে তোমার নেই তা ভুলে গিয়েছিলুম। অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই তো। তা সে

pathagar.net

যাক—প্রশ্ন হচ্ছে তুমি কি বিয়ের পর ওঁকে রঞ্জনার কথা সব বলেছ ?

প্রিয়দার মুখে তখনও সেই মিটিমিটি হাসি !

গা-জ্বালাকরা সে হাসি দেখে চটে উঠে বললুম : নিশ্চয়ই বলেছ, তাই নয় ?

প্রিয়দা সে কথার জবাব না দিয়ে তাঁবুর দিকে মুখ করে ডাকে ; ওগো শুনছ ?

পরমুহূর্তেই বেরিয়ে এলেন মিসেস্ আচার্য। প্রিয়দা তাঁকে বললে : নরেন জানতে চাইছে বিয়ের পর আমার প্রাক্‌বিবাহ জীবনের প্রেমের কথা তোমাকে বলেছি কিনা।

আমি তো অপ্রস্তুতের একশেষ। ইচ্ছে করছিল টেনে এক চড় কষিয়ে দিই ওকে। মুখটা আর তুলতে পারি না। পারলে দেখতুম —অবাক হয়ে চেয়ে আছেন মিসেস আচার্য।

প্রিয়দা আবার বলে : ওর ধারণা রঞ্জনার কথা আমি তোমাকে সব বলে ফেলেছি আর তাতেই তুমি—

আমি বাধা দিয়ে বলি : আহ প্রিয়দা ! কী হচ্ছে !

খিলখিল করে হেসে উঠে প্রিয়দা বললে : আমার স্ত্রীর নামটা আমাকে বলতে দিসনি। দোষ আমার নয়।

আমি বলি : তার মানে ?

একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁওয়া ছেড়ে প্রিয়দা বেশ মুডের মাথায় বললে : আমার নাম তো জানে গাঁয়ের পাঁচজনে আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা !

আমি অবাক হয়ে বললুম : সে কি ?

প্রিয়দা বললে : রামালু ভুল খবর দিয়েছিল আমাকে। ইচ্ছে করেই। তার ধারণা ছিল ও কথা না বললে আমি পালাতে রাজি হব না !

তাকিয়ে দেখলুম রঞ্জনা দেবীর দিকে। সিনেমার মণ্টাজে যেমন

pathagar.net

দেখা যায়, আমি যেন তেমনিভাবে ওঁর ভিতরে দিয়ে দেখতে পেলুম আর এক রঞ্জনাকে। বুটিদার ছাপা শাড়িটা গেল মিলিয়ে, আটপৌরে পোশাকটা গেল হারিয়ে। দেখলুম সেই মেয়েটিকে যার পরনে ময়ূরকণ্ঠি রঙের সিল্কের শাড়ি। মাথায় ঝুটো মুক্তো জড়ানো এক বেণী। খাটো চোলী, কর্ণমূলে সবুজ পাথর বসানো জড়োয়া দুল। দেখলুম কাজলকালো দুটি চোখে চিত্রিতা মৃগতৃষ্ণিকার সরল সারঙ্গ দৃষ্টি। হঠাৎ লজ্জা পেল রঞ্জনা। তার দৃষ্টি হল নত—একরকম ছুটেই পালিয়ে গেল বেচারী তাঁবুর ভিতর।

রান্নার দেরি ছিল। দুই বন্ধুতে কাজ দেখতে বের হওয়া গেল। এক বাণ্ডিল ব্লু-প্রিণ্ট নিয়ে প্রিয়দা আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখাল। আমি বাড়ি-ঘর-রাস্তা বানাই। ছোটখাটো কালভার্ট পর্যন্ত বানাতে হয়েছে। মেজর-ব্রীজের কাজের তদারকী কখনও করবার সৌভাগ্য হয়নি। কলেজী বিদ্যাটুকু মাত্র সম্বল। দেখলুম প্রিয়দা অনেক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। প্রয়োগবিধির অনেক কুটকৌশল সে আমাকে শিখিয়ে দিল। কাজকর্ম দেখে দুই-বন্ধুতে এসে বসলুম ওর অফিসে। সেটাও তাঁবু। একথা সেকথার পর আমি আবার ফিরে এলুম তার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে। লক্ষ্য করে দেখলুম। সে কথা ওঠামাত্রই ওর মুখে ঘনিয়ে এল বিষাদের ছায়া। তবু সব কথা খুলে বললে আমাকে। কেমন করে সে খবর পেল রঞ্জনার আত্মহত্যার কাহিনীটা সত্য নয়। কেমন করে সে উদ্ধার করে আনল রঞ্জনাকে। আর এ কাহিনীর উপসংহারে জানালো এই বিবাহকে কেন্দ্র করে কিভাবে নবদ্বীপের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল তার।

জিজ্ঞাসা করলুম : তর্করত্নমশাই এখনও বেঁচে আছেন?

আছেন। আগামী পূর্ণিমায় তিনি সাতাশি বছরে পদার্পণ করবেন।

তাঁর কাছে এখন কে আছে?

যারা চিরকাল ছিল। দশরথদা আর বৌঠান।

pathagar.net

তুমি বুঝি রঞ্জনার সব পূর্বকথা তাঁকে জানিয়েছিলে ?

প্রিয়দা উত্তর দেয় না। ম্লান হাসলে শুধু। সে হাসির মধ্যেই ছিল তার জবাব। বললুম : দেখ প্রিয়দা, এইখানে তোমার সঙ্গে আমার মেলে না। সত্যভাষণ একটা দুর্লভ গুণ। কিন্তু শাস্ত্রে বলে—মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।

প্রিয়দা বলে : সে শাস্ত্র আমি মানি না। সত্যভাষণের কোন মহিমাই থাকে না, যদি না অপ্রিয়-সত্য ভাষণের দুঃখ বরণ করবার সাহস তার পিছনে থাকে। 'তুমি ভাল' এ সত্য কথা বলার পিছনে কোন মহত্ত্ব নেই। 'তুমি মন্দ' একথা বলতে যদি তোমার সঙ্কোচ হয় তবে ঈশ্বরের ঘৃণা যেন তোমাকে তৃণসম দহন করে !

আমি বললুম : ওটা তোমাদের মহত্ত্ব নয়, ওটা সত্যভাষী সাজার দম্ভ। তোমরা সত্যকে ভাল বাস না, সত্যভাষণের দম্ভকে ভালবাস।

প্রিয়দা বললে : প্রসঙ্গটা নূতন নয়। আমার বুড়ো-ঠাকুরদা ঠিক ঐ কথাই বলেছিলেন তাঁর পিতৃদেবকে। তর্কপঞ্চাননকে।

বললুম : জানি। মনে আছে সে গল্প।

প্রিয়দা একটু চুপ করে থেকে বললে : কথাটা আমিও ভেবে দেখেছি। একেবারে উড়িয়ে দিতে পারি না। আমারও চিন্তাধারা বদলাচ্ছে। মনে হচ্ছে 'সত্যি' জিনিসটা অত সহজ নয়। বোধকরি যে সত্যের পিছনে শিব ও সুন্দর নেই—সে সত্য মিথ্যার মতোই পারিত্যাজ্য। এক এক সময় মনে হয় রঞ্জনার পূর্বকথা যদি সাড়ম্বরে আমি দাদুকে না জানাতুম তাহলে তাঁর সঙ্গে আমার এই জন্মের বিবাদটা হত না। বৃদ্ধের প্রতি আমার একটা কর্তব্য আছে তাহলে তা আমি করতে পারতাম। রঞ্জনাকে পেয়ে খুশী হতেন দাদু। রঞ্জনাও তাঁকে পেয়ে খুশী হত। আর সবচেয়ে খুশী হতুম আমি। এই এতগুলি মানুষের জীবনের আনন্দকে গলা টিপে মেরে ফেলার জন্য কী দরকার ছিল আমার সত্য কথাটা তাঁকে জানাবার ?

আমি বলি : তাহলে সত্যকথা বলার জন্য তুমি অনুতপ্ত ?

না তাও ঠিক নয়। আবার কখনও মনে হয় কিছুই অন্যায় করিনি আমি। দাদু একটা আদর্শকে অবলম্বন করে চলেছেন সারা জীবন। তাঁর সে আদর্শকে আমি সর্বতোভাবে মেনে চলি না বটে, কিন্তু আদর্শের প্রতি তাঁর নিষ্ঠাকে, তাঁর আন্তরিকতাকে আমি শ্রদ্ধা করি। তাই জ্ঞাতসারে তাঁর সে নিষ্ঠায় আঘাত দিতে পারি না। না, ভুল আমি করিনি।

দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে প্রিয়দা চুপ করে যায়। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। মনে হচ্ছে কি একটা ভাবছে প্রিয়দা। কিছু একটা আমাকে বলতে চায়। বলা উচিত হবে কিনা স্থির করে উঠতে পারছে না যেন। তারপর হঠাৎ নিজে থেকেই আবার বলে : দেখ নরেন, আমার মনে হয় আমাকে নিয়ে কেউ যেন প্রতিনিয়ত একটা পরীক্ষা করে চলেছে। বীরেন মাস্টারের সেই বাক্‌টন মেশিনটাকে মনে আছে তোর? ইয়ংস্ মডুলাস্ বার করতুম আমরা। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় গোটা সংসারটাই যেন একটা বৃহদায়তন বাক্‌টন মেশিন। কোন অলক্ষ্য রিসার্চ ওয়ার্কার আমাকে ঐ মেশিনে চড়িয়ে ক্রমাগত পরীক্ষা করে চলেছেন। আমার টেনসাইল স্ট্রেংথ দেখছেন। ক্রমাগত টান পড়ছে দুদিক থেকে। দাঁতে দাঁত দিয়ে সহ্য করছি— কিন্তু মনে হচ্ছে দু টুকরো হয়ে ছিঁড়ে না যাওয়া পর্যন্ত ঐ যন্ত্রদৈত্য শান্ত হবে না।

ওর এ অদ্ভুত উপমা শুনে হাসি পাওয়া উচিত ছিল—কিন্তু ওর কণ্ঠস্বরে, ওর বাচন ভঙ্গিমায় এমন একটা কিছু ছিল যে হাসতে পারলুম না। উপমাটা প্রণিধান করবার চেষ্টা করি। মনে পড়ে গেল বি. ই. কলেজে ল্যাবরেটারীর বিরাটকায় বাক্‌টন-দৈত্যকে। লোহার ডাণ্ডাকে ভরে আমরা ক্রমাগত টান দিতাম যন্ত্র ঘুরিয়ে। কুলীশ-কঠিন লোহার ডাণ্ডা ক্রমশ ডম্বরুর মতো হয়ে যেত। আর্তনাদ করে শেষ পর্যন্ত দু-টুকরো হয়ে ভেঙে যেত। আমরা সেই দুটি

টুক্‌রাকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতুম—কেমন ক্রাকচার হয়েছে দেখতুম, মাপ নিতুম।

প্রিয়দা একই সুরে বলতে থাকে : আমার উপর ঠিক যেন ঐ পরীক্ষাটাই চলেছে আজন্ম। ভেবেছিলাম—কিছুতেই ছিঁড়ে পড়ব না। কিন্তু মনে হচ্ছে না, আর বুঝি পারা যাবে না। নূতনভাবে চাপ পড়তে শুরু করেছে আবার।

কৌতুহলী হয়ে বলি : নূতনভাবে ?

হ্যাঁ। পরীক্ষা এখনও শেষ হয়নি। একটি অত্যন্ত অপ্রিয় সত্য বাধ্য হয়ে এখনও গোপন করে চলেছি। মনে শান্তি পাই না—কিন্তু মন খুলে সে কথা বলতেও পারি না কাউকে।

আমি চুপ করে বসে থাকি।

প্রিয়দা আপন মনেই বলতে থাকে : আজকাল মাঝে মাঝে মনে হয় ঠিকই বলেছিলেন তর্কবাগীশ—যে সত্যের পিছনে শিব নেই, সুন্দর নেই, সে সত্য মূল্যহীন! কিন্তু কাউকে মন খুলে একথা না বলতে পারলেও যেন সান্ত্বনা পাই না? কী আমার কর্তব্য কে আমায় বলে দেবে ?

চেয়ে দেখলুম ওর মুখটা সাদা হয়ে গেছে। যেন অত্যন্ত বেদনার স্থলে কেউ মাড়িয়ে দিয়েছে ওকে। আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠি : থাক্ প্রিয়দা। প্রত্যেকের জীবনেই কিছু গোপন কথা থাকে। তার ভার নিজেকেই বইতে হয়। চল ওঠা যাক্।

ম্লান হাসলে প্রিয়দা। বললে : চল তাহলে।

রঞ্জনা আমাদের দুজনকে পাশাপাশি খেতে দিল টেবিল পেতে। কাবুলের খাওয়া পূর্বেই হয়ে গেছে। রঞ্জনা আমাদের সঙ্গে বসল না। পরে খাবে।

খেতে বসেই বললুম : একি? শুক্‌তুনির দো-পেঁয়াজী কই? আপনি শুনেছি বাঙালীখানা পাকানোতে ওস্তাদ।

রঞ্জনা রাগ করে না! মুখ টিপে হেসে বলে : সেটা না হয়

pathagar.net

বাড়ি ফিরে গিয়েই খাবেন। চিত্রাদেবীর মতো বাঙালীখানা কি আর আমি পাকাতে পারি ?

আহারাদির পর আমি বললুম : রাতে একটা ট্রেন আছে। তাতেই যাব। কিন্তু ওরা নাছোড়বান্দা। একটি রাত ওদের ওখানে থেকে যেতে হবে। ওভারসিয়ারবাবু ছুটিতে। তাঁর ক্যাম্প খাটটা ইতিমধ্যেই আনিয়ে রাখা হয়েছে আমার জন্যে।

দুপুরবেলা একটু গা গড়িয়ে নিলুম। কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। প্রিয়দার কথাগুলো কেমন পাক দিয়ে ফিরছে মাথার ভিতর। কী এমন গোপন কথার ঈঙ্গিত দিতে বসেছিল সে ? সে কি রঞ্জনার সম্বন্ধে ? কিন্তু তার সম্বন্ধে সব কিছু কথাই তো সে ইতিপূর্বে জানিয়েছে আমাকে। খানিকক্ষণ উশখুশ করে উঠে পড়লুম। দেখি তাঁবুর বাইরে গাছের ছায়ায় ওরা বাপ-বেটায় মিলে কি যেন করছে। উঠে এসে দেখি প্রিয়দা একটা দা দিয়ে একখণ্ড কঞ্চি কাটছে। নানান সরঞ্জাম সেখানে ছড়ানো। ময়দার আঠা, লাল-নীল কাগজ, বাটালী, কাঁচি, ছুরি। বললুম : ব্যাপার কি ?

কাবুল বলে : কাল রাত্রের ঝড়ে আকাশ-পিদিমটা ছিঁড়ে গেছে। আমরা আকাশ-পিদিম বানাচ্ছি ফের।

আমি অবাক হবার ভান করে বলি : আকাশ-পিদিম ! সে আবার কি ?

আপনি জানেন না ? ড্যাডি, আকাশ-পিদিম জ্বালেন যে। নাহলে সগ্‌গো থেকে দাদু কেমন করে পথ চিনে চিনে আসবেন ? শুধু দাদুই তো একা না, তাঁর দাদু। তাঁরা একেবারে থুত্থুড়ে বুড়ো। পিদিম না জ্বাললে তাঁরা আমাদের বাড়ি খুঁজে পাবেন কেমন করে ?

বসে গেলুম ওদের সঙ্গে। লাল নীল কাগজ কেটে তৈরি করছি আকাশ-প্রদীপ। মনে পড়ল প্রিয়দা একবার গল্প করেছিল বটে— ছেলেবেলায় সে আকাশ-প্রদীপ জ্বালত। কী একটা সংস্কৃত মন্ত্রও

pathagar.net

বলত বুঝি। ও দেখতে পেত অন্ধকার রাত্রে আকাশ থেকে নেমে আসছেন ওর পূর্বপুরুষেরা, সার বেঁধে। তর্কপঞ্চানন, তর্কবাগীশের দল। আশীর্বাদ করছেন ওদের—বংশের উত্তরপুরুষকে। কিন্তু এ ধেড়ে বয়সেও যে ওর সে ছেলেমানুষী থাকতে পারে, সেটা আন্দাজ করিনি।

একটু পরে বেহারী চাকরটা এসে প্রিয়দাকে ডাকল। মাঈজী ভিতরে ডাকছেন। প্রিয়দা উঠে গেল ভিতরে। আমরা দুজনে মিলে কাগজ সেঁটে ক্ষতিগ্রস্ত আকাশ-প্রদীপটা মেরামত করতে থাকি।

কাবুল বললে : ড্যাডিকে বলেছি, এখন তো আমি বড় হয়েছি, এখন আমিই তুলব আকাশ-পিদিম।

আমি বললুম : নিশ্চয়ই। ড্যাডি ঠিকমতো তুলতে পারেনি বলেই তো কাল রাত্রে হাওয়ায় ছিঁড়ে গেছে ওটা। আজ তুমি তুলবে। দেখবে কিচ্ছু হবে না।

কাবুল কিন্তু সায় দিল না আমার কথায়, বললে : ড্যাডির কি দোষ? ঝড় হ'লে—

কিন্তু আমার তখন অন্যদিকে মন। তাঁবুর ভিতর কি নিয়ে যেন দুজনের উষ্ণ বাক্য বিনিময় হচ্ছে। চাপা স্বর দুজনেরই—তবু মনে হয় কোন একটা কিছু নিয়ে দুজনের বচসা হচ্ছে। পরমুহূর্তেই বেরিয়ে এল প্রিয়দা! বসল আমাদের সঙ্গে কাজ করতে; কিন্তু লক্ষ্য করে দেখলুম কাজে উৎসাহ নিবে গেছে তার। কাঠিগুলো নিয়ে নাড়া-চাড়াই করছে শুধু—কাজ করছে না। আমি বললুম : সরো, তোমার দ্বারা হবে না।

প্রিয়দা বললে : দূর। থাক এসব ছেলেমানুষী। আয় গল্প করি বরং।

কাবুল বলে : বা রে! আজকে আমি আকাশ-পিদিম দেব বলেছি যে!

অহেতুক ধমক দিয়ে ওঠে প্রিয়দা : না!

pathagar.net

আমি কাবুলের পক্ষ নিয়ে বলি : তা চলবে না ! আজই সন্ধ্যার আগে শেষ করতে হবে এটাকে। কি বল কাবুল ?

কাবুল তো খুব খুশী। প্রিয়দা রাগ করে উঠে গেল।

সন্ধ্যার আগেই মেরামত হয়ে গেল আকাশ-প্রদীপ। প্রিয়দা সরে দাঁড়ালে কি হবে, আমরা দুজন বদ্ধপরিকর। এল প্রদীপ, পাকানো হল সল্‌তে। রঞ্জনাও এসে বাধা দেবার চেষ্টা করলে, বললে : এসব থাক। চলুন নদীর ধার থেকে একটু বেড়িয়ে আসা যাক সবাই মিলে।

আমি বললুম : সে সব পরে হবে। আগে আকাশ-প্রদীপ উঠবে তারপর।

ক্রমে সূর্যের শেষ রশ্মিটুকুও মিলিয়ে গেল। পশ্চিম আকাশে ফুটে উঠল সন্ধ্যাতারা। কার্তিকের সান্ধ্য আকাশে ফুটে উঠল ক্রমে ক্রমে ফার্স্ট ম্যাগনিচুডের তারাগুলি। প্রিয়দাকে ডেকে বলি : অমন হুঁকোমুখোর মতো বসে থাকলে তো চলবে না। এস, শ্রীমান কাবুলচন্দ্র এবার আকাশ-প্রদীপ তুলবেন।

দড়িটা কাবুলের হাত দিয়ে বলি, মন্ত্রটা আমার জানা নেই, এসে বলে দাও।

প্রিয়দা আমার কথার জবাব না দিয়ে কাবুলকে বললে : তুমি এখনও ছোট আছ, দাও ওটা আমিই তুলে দিই।

আমি ধমক দিয়ে বললুম : না, কাবুলই ওটা তুলবে।

প্রিয়দা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললে : নরেন, তুই তো এসব বিশ্বাস করিস না, তাহলে তুই কেন খামোকা এমন জিদ করছিস ? কাবুলের দিকে ফিরে বললে : দড়িটা দাও আমাকে।

আমি বললুম : প্রিয়দা, জিদ আমি করছি না তুমি করছ। আর বিশ্বাসের কথা বলছ, আকাশ-প্রদীপের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বিশ্বাস না করলেও এর পিছনে যে একটি কাব্য আছে—

কিন্তু আমার কথা শেষ হল না। তার আগেই প্রায় জোর করে

pathagar.net

কাবুলের হাত থেকে কপিকলের দড়িটা কেড়ে নিয়ে প্রিয়দা সেটাকে তুলে দিল আকাশে।

সামান্য ব্যাপার; কিন্তু ভয়ানক অপমানিত মনে হল নিজেকে। দুহাতে মুখ ঢেকে কাবুল এক ছুটে ঢুকে গেল তাঁবুতে। আমিও কোন কথা না বলে স্থান ত্যাগ করলুম। প্রিয়দা পিছন থেকে একবার ডাকল—নরেন, শোন।

কিন্তু না। আমি মনস্থির করে ফেলেছি। হতে পারে জিনিসটা সামান্য। এ নিয়ে মান অভিমান করতে বসার বয়স পার হয়েছি আমরা। তবু স্থির করলাম এরপর রাত্রে আর সেখানে থাকব না। নিজের মালপত্র গুছিয়ে নিলুম। রাত্রের ট্রেনেই ফিরে যাব আমি।

প্রিয়দা বাধা দিল না। রঞ্জনা দেবীও বুঝে নিয়েছেন—কী একটা কারণে আমাদের মনোমালিন্য ঘটেছে। তিনিও কিছু বললেন না।

শুধু কাবুল এসে বললে: আপনি এখনই চলে যাবেন?

আমি ওকে আদর করে বললুম: হ্যাঁ কাবুল। কলকাতা ফিরে গিয়ে তোমার জন্য কি পাঠিয়ে দেব বল?

ও অভিমান করে বললে: কিছুই না।

প্রিয়দা নিজেই ড্রাইভ করে নিয়ে এল স্টেশনে।

গাড়ি চালাতে চালাতে বললে: তুই রাগ করে ফিরে যাচ্ছিস!

আমি কোন জবাব দিলুম না।

গিয়ার বদলাতে বদলাতে আবার বলে: এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে—

আমি বাধা দিয়ে বলি: আমারও তো সেই প্রশ্ন। ব্যাপারটা যখন সামান্য—

আমাকে বাধা দিয়েও আবার বলে: ভুল করছিস নরেন। তোর কাছে এটা সামান্য ব্যাপার—কারণ আকাশপ্রদীপ তোলা তোর কাছে

pathagar.net

ছেলেবেলা আমার কাছে না। আমি এটাকে ছেলেবেলা থেকেই ধর্মের একটা অঙ্গ বলে বিশ্বাস করে এসেছি।

আমি বললুম: থাক প্রিয়দা, এ আলোচনা আর ভাল লাগছে না আমার।

প্রিয়দা বললে: থাক তবে।

খানিক পরে মনে হল—সত্যি, এভাবে রাগ করে যাওয়ার কোন মানে হয় না। একটু সহজ হবার উদ্দেশ্যে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করি। বলি—তোমার দাদু রঞ্জনাকে চোখে দেখেননি?

একভাবে গাড়ি চালাতে চালাতে প্রিয়দা বলে: না।

একবার ওদের নিয়ে নবদ্বীপে গেলে পারতে—

সে চেষ্টা করেছিলাম। ফল হয়নি তাতেও।

ফল হয়নি কেন?

প্রায় স্বগতোক্তির সুরে প্রিয়দা বললে: দাদুকে মাঝে মাঝে মনি অর্ডার করে টাকা পাঠাতুম। বিয়ের পর মনি অর্ডার ফেরত এল। পর পর তিন-চারখানা চিঠি লিখেও যখন জবাব পেলাম না তখন লিখলাম সস্ত্রীক নবদ্বীপ যাচ্ছি। তারও কোন জবাব নেই। নবদ্বীপে গিয়েছিলাম। রাসের সময়। আমাদের বাড়িতে রাসের সময় উৎসব হয়। ঠাকুরের রাসমঞ্চ সাজানো হয়—অনেক লোক খাওয়ানো হয়। বিয়ের পর মাস আষ্টেক পরে রাসের সময় ছুটি নিয়ে নবদ্বীপে গেলাম। গিয়ে দেখি দাদু নেই। আয়োজন সমস্ত হয়েছে। ওঁর একজন শিষ্য সব কিছু ব্যবস্থা করেছেন। দাদু চলে গেছেন কোন যজমানের বাড়িতে। দশরথদা ঘর খুলে দিল; কিন্তু সে ঘরে আমি ঢুকতে পারিনি। ধুলো পায়েই ফিরে এসেছিলাম আবার।

আমি বললুম: সে তো বিয়ের পর একেবারে আদি পর্বে। বিয়ের মাস আষ্টেক পরের কথা বললে। পরে আবার চেষ্টা করে

pathagar.net

দেখলে না কেন? নাতবৌকে প্রত্যাখ্যান করেছেন বলেই বংশের শেষ প্রদীপটিকেও তিনি প্রত্যাখ্যান না করতে পারেন।

প্রিয়দা আবার ম্লান হাসলে। সে হাসি দেখে শিউরে উঠলুম আমি। প্রিয়দা বললে: প্রথমবার শুধু সস্ত্রীকই যাইনি—সপুত্রও গিয়েছিলাম।

আমি চমকে উঠে বলি: সে কি? বিয়ের আটমাস পরে—

প্রিয়দা বললে: হ্যাঁ, কাবুলের বয়স তখন দেড় মাস মাত্র। তাকে নিয়েই গিয়েছিলাম আমরা—

আমি ভয়ে ভয়ে বলি: তার মানে?

প্রিয়দা তেমনি হেসেই বললে: তারও মানে শুনতে চাস?

আমার সারা শরীরে যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল। তাড়াতাড়ি ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে উঠি: না, না, না!

প্রিয়দাকে আমি আর কথা বলতে দিইনি। জানতুম সত্য কথা ছাড়া সে বলতে পারবে না। যে সত্যকে সহ্য করেছে প্রিয়দা, প্রতিনিয়ত সহ্য করে চলেছে তাকে সইবার ক্ষমতা আমার ছিল না। তাই কি প্রিয়দা অমন অকালে বুড়িয়ে গেল? তাই কি ওর সংসারে শান্তি নেই? কাবুলের কি অধিকার নেই আচার্য বংশের পূর্বপুরুষকে আকাশপ্রদীপ জ্বালিয়ে পথ দেখাবার?

হয়তো তাই। হয়তো কেন নিশ্চয়ই তাই। এই কথাটাই সেদিন বলতে চেয়েছিল প্রিয়দা। এই কথাটাই তার বুকে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে। সে মনস্থির করে উঠতে পারছে না। একদিকে তার আজন্মের সংস্কার, অন্যদিকে এ যুগের শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাব। দুদিক থেকেই টান পড়ছে ওর উপর: বাকটন মেশিনের সেই লোহার টুকরোটির মতো—দুদিকের এই প্রবল আকর্ষণকে প্রতিহত করবার চেষ্টায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে বেচারা। এ বেদনার কেউ ভাগীদার নেই। আপন মনেই গুমরে মরছে সে।

Pathagar.net

আজ তাই তার মনে প্রশ্ন জেগেছে—যে সত্যের পিছনে শিব নেই, সুন্দর নেই, সে সত্যকে সে অগ্রাধিকার দেবে কিনা। মানুষের গড়া এ সামাজিক ব্যবস্থায় কাবুল জারজ! কিন্তু এ নিষ্ঠুর সত্যটা অকপটে স্বীকার করার মধ্যে আর যাই থাক কারও মঙ্গল নেই। অপরের অন্যায়ের অপরাধে কাবুলকে ধুলোর মধ্যে আছড়ে ফেলার ভিতরে কী মহত্ত্ব থাকতে পারে? প্রিয়দা তো তাকে স্বীকার করে নিয়েছে, মেনে নিয়েছে রঞ্জনা—সমাজই বা তাকে স্বীকার করে নিতে পারবে না কেন? পারবে, যদি প্রিয়দা সত্য প্রকাশের দম্ভে সর্বনাশ না করে বসে। বোধকরি এই সংশয়ের মধ্যেই প্রিয়দা অসময়ে বুড়িয়ে যেতে বসেছে!

ট্রেনে সারারাত ঘুম হল না। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে সামান্য পৌঁছানো সংবাদটাও দিইনি। পাছে উত্তর দেবার সময় সত্যান্ধ মূর্খটা লিখে বসে কাবুলের কথা। প্রিয়দা পাষাণ, ও সইতে পারে—কিন্তু আমি পারব না। হঠাৎ খুঁজে পাওয়া যোগসূত্রটায় তাই ইচ্ছে করেই আলগা দিয়েছি। পাছে টানাটানি করতে গিয়ে একেবারে ছিঁড়ে যায় সূতোটা।

কিন্তু কী ছোট এই দুনিয়া! আবার দেখা হয়ে গেল ওর সঙ্গে। আমি তখন বর্ধমানে পোস্টেড। উনিশ শ' ছাপান্ন সাল। আমি ততদিনে আর এক ধাপ ওপরে উঠেছি, সরকারী সিঁড়ির ধাপে। একদিন হঠাৎ সরকারী ছাপমারা চিঠি এল আমার অফিসে। চীফ এঞ্জিনিয়ারের অফিস থেকে জানানো হচ্ছে আমার অধীনস্থ অ্যাসিস্টেন্ট এঞ্জিনিয়ারের শূন্যপদে পাবলিক সার্ভিস কমিশন যাঁকে নির্বাচন করেছেন তাঁর নাম শ্রীসত্যপ্রিয় আচার্য বি ই! স্তম্ভিত হয়ে গেলাম পত্র পেয়ে। এতদিনে আবার কেঁচে গণ্ডুষ করছে আমাদের প্রিয়দা? কলেজ ত্যাগ করার আট বছর পরে নূতন করে সরকারী চাকরিতে ঢুকছে? সামান্য অ্যাসিস্টেন্ট এঞ্জিনিয়ার হয়ে?, কেন, তার প্রাইভেট ফার্মের চাকরির কি হল?





pathagar.net

ব্রীজ কন্সট্রাকসনের কাজে এত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে শেষ পর্যন্ত আবার পুনর্মূষিক !

কিন্তু হল তাই ! খবর পেলাম—প্রিয়দা জয়েন করেছে তার কর্মস্থলে। আসানসোল সাবডিভিসনে। তখনই ছুটলুম জীপ নিয়ে। ব্যাপারটা জানতে হবে। কেমন যেন একটু অস্বস্তিও বোধ করছি। প্রিয়দাকে চিরকাল দাদা ডেকেছি—সে আমার অধীনে কাজ নিল ! জীপ থেকে নেমে সোজা গিয়ে ঢুকলাম ওর ঘরে। এ ঘরে ওর প্রেডিসেসরের আমলে বহুবার এসেছি। অফিসের সবাই আমাকে চেনে। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই যেভাবে প্রিয়দা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো,—হাত দুটি বুকের কাছে জড়ো করে নমস্কার করার ভঙ্গি করল, যে আমি থতমত খেয়ে গেলুম। আমি কিছু বলার আগেই গম্ভীরভাবে বললে : লেট মি ইন্টোডিয়ুস মাইসেল্‌ফ। আয়াম য়োর নিউ এ. ই. স্যার। এস্‌. পি. আচারিয়া।

আমার বাক্যস্ফূর্তি হল না। বসে পড়লুম ওর ভিজিটার্স চেয়ারে। প্রিয়দাও বসল। সিনিয়র ওভারসিয়ার—যে এতদিন অফিসিয়েট করছিল সেও আমায় পিছু পিছু ঘরে ঢুকেছে। প্রিয়দা কি তার সামনে স্বীকার করতে চায় না, যে সে আমার পূর্ব পরিচিত, সহপাঠী ? সম্ভবত তাই। ইতস্তত করে তাই বললুম—একলা এসেছ, না ফ্যামিলি নিয়ে ?

আই হ্যাভ কাম উইথ্‌ মাই ফ্যামিলি স্যর !

প্রিয়দা কি সব কথার শেষেই একটা করে 'স্যর' লাগাবে না কি ? আর আপনি-তুমির হাঙ্গামা এড়াতে ক্রমাগত ইংরাজি চালিয়ে যাবে ?

ওভারসিয়ারবাবুকে বলি আমার ড্রাইভারকে নিয়ে একবার অটোয়ালের গ্যারেজে যান। জীপ-রিপেয়ারের একটা এস্টিমেটের কোটেশান দেবার কথা ছিল তার।

pathagar.net

ওভারসিয়ারবাবু বোধহয় ইঙ্গিতটা বুঝতে পারেন। নীরবে প্রস্থান করেন তিনি।

ঘর খালি হতেই বলি : তুমি কি পাগল হয়ে গেলে প্রিয়দা? আবার মরতে এ চাকরি নিলে কেন? ঝগড়া করেছ সেখানে?

প্রিয়দা জবাব দিল না। কাগজচাপাটা নিয়ে অহেতুক নাড়াচাড়া করতে থাকে।

বললুম : কাবুল কোথায়?

হোস্টেলে আছে।

যাক্ বাঙলা ভাষাটা ভোলনি তাহলে! আর রঞ্জনা?

প্রিয়দা জবাব দিল না। মুখ নিচু করে গোঁজ হয়ে বসেই থাকল। পিয়নটা ঢুকল দু কাপ চা হাতে। আমার সামনে একটা কাপ নামিয়ে রেখে নমস্কার করল। তাকেই শেষ পর্যন্ত বলতে হল—উপরে গিয়ে মেমসাহেবকে বলে এস, আমি এসেছি। উপরে যাব দেখা করতে।

একতলায় অফিস, দ্বিতলে কোয়ার্টার্স। পথঘাট আমার জানাই। প্রিয়দা রাম গঙ্গা কিছুই বললে না। পিয়নটা চলে গেল দ্বিতলে, আমার আগমন বার্তা জানাতে।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে ধরলুম ওর সামনে।

নো থ্যাংক্স। প্রত্যাখ্যান করল প্রিয়দা।

বললুম : ব্যাপার কি? হঠাৎ এত ফর্মাল হয়ে পড়লে কেন?

প্রিয়দা ইংরাজিতেই জবাব দিল—না, ফর্মালিটির কিছু নেই। সিগারেট সে ছেড়ে দিয়েছে। ডাক্তারের বারণ।

ডাক্তারের বারণ! কেন?

থ্রোট ট্রাবল!

বললুম : ডাক্তার কি বাঙলা ভাষাতে কথা বলতেও বারণ করেছে?

pathagar.net

প্রিয়দা কিছু বললে না। হাসলে না পর্যন্ত।

পিয়নটা এসে খবর দেয় মেমসাহেব আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। প্রিয়দাকে সরাসরি অগ্রাহ্য করে উঠে গেলুম দ্বিতলে। প্রিয়দা কিন্তু আমার সঙ্গে উঠে এল না। অবাধ্য ছোট ছেলের মতো গোঁজ হয়ে বসে থাকল তার চেয়ারে।

মাথায় আধো ঘোমটা দিয়ে রঞ্জনা আমার জন্য অপেক্ষা করছে সিঁড়ির উপরপ্রান্তে। হাত তুলে নমস্কার করল। ঘরে নিয়ে গেল। মালপত্র প্যাকিং কেসে ঘর বোঝাই। সম্প্রতি এসেছে ওরা। ফার্নিচারের ক্রেটিং খোলা হয়নি এখনও। ঘরটা সাজানো হয়নি। বসবার মতো উপযুক্ত আসন নজরে পড়ল না। পিয়নটা এসেছিল আমার পিছন পিছন। তাকেই বললুম : নিচে থেকে খান-দুই চেয়ার নিয়ে এস তো হে।

পিয়নটা কি জানি কেন কুণ্ঠিতভাবে একবার তাকায় তার মেমসাহেবের দিকে।

রঞ্জনাও কি জানি কেন হঠাৎ বিব্রত হয়ে পড়ে। ইতস্তত করে বলে : কেন? এটার উপরেই বসুন না।—আঁচল দিয়ে একটা প্যাকিং কেসের উপর থেকে সে তাড়াতাড়ি ধুলো ঝেড়ে দেয়।

আমি বললুম : কী দরকার? ও নিচে থেকে খান-দুই চেয়ার নিয়ে আসুক না।

পিয়নটা মাথা চুলকে নেমে গেল নিচে। একটু পরে ফিরে এল একখণ্ড ছিন্নপ্রায় বেতের মোড়া হাতে। সেটা নামিয়ে রেখে একরকম ছুটেই পালাল। আমি কিছু বলবার অবকাশই পেলুম না। রঞ্জনাও তার ব্যবহারে লজ্জায় যেন মিশে গেল মাটিতে।

একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করতে হল : ব্যাপার কি বলুন তো?

রঞ্জনা বেতের মোড়াটা আমার দিকে ঠেলে দিয়ে নিজে বসে পড়ে সেই প্যাকিং বাক্সটার উপরেই। বললে : এ মোড়াটা আগের এস. ডি. ও. ফেলে রেখে গেছেন।

pathagar.net

আমি বলি : সে তো বুঝতেই পারছি—নিয়ে যাবার মতো অবস্থায় এটা আর নেই। কিন্তু আমার প্রশ্ন তা নয়। লোকটা অমন ছুটে পালিয়ে গেল কেন ?

রঞ্জনা আঁচলটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে বললে : ও বেচারার অবস্থা হয়েছে দুর্গেশ দুমরাজের মতো। দোষ ওর নয়।

তার মানে ?

ওর সাহেব ওকে বারণ করেছেন নিচের চেয়ার ওপরে আনতে। আপনার আগে এখানকার প্রতিবেশিনীর দল আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। চেয়ার এপিসোড এর আগেই হয়ে গেছে।

আমি বললুম : ঠিক বুঝতে পারছি না। চেয়ার উপরে আনা বারণ কেন ?

রঞ্জনা মুখ তুলে আমার চোখে-চোখে তাকাল। বলল : আপনার বন্ধুর মতে অফিসের চেয়ারগুলি সরকারী সম্পত্তি। উপরের কোয়াটার্সে সেগুলিকে এনে ব্যবহার করাটা হচ্ছে সরকারী সম্পত্তির অপব্যবহার।

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হতে হল আমাকে।

রঞ্জনা ফের বলে : এইসব খুঁটিনাটি কারণেই বারে বারে বিবাদ বেধেছে, বিরোধ ঘনিয়ে উঠেছে। একের পর এক চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছেন উনি। না হলে আপনার সহপাঠী উনি, অথচ আজ—হঠাৎ সঙ্কোচে থেমে পড়ে বেচারী।

আমি বললুম : সব জিনিসেরই সীমা আছে রঞ্জনা দেবী। পরিচ্ছন্নতার আতিশয্য যেমন শুচিবায়ুগ্রস্ততা—সততার আধিক্যও তেমনি ক্ষেত্রবিশেষে অসহ্য হয়ে পড়ে। গতবারই লক্ষ্য করেছিলুম প্রিয়দা যেন ক্রমশ সিনিক হয়ে উঠেছে।

রঞ্জনা অন্তরঙ্গতার সুরে বললে : কিন্তু একথা ওকে কে বোঝাবে বলুন ? কোন্ ঠিকাদার বুঝি ওকে এক কাপ চা খাইয়েছিল। উঠে



pathagar.net

আসার সময় দু-আনা পয়সা ও রেখে এসেছিল প্লেটের উপর! এইভাবে লোককে ও ক্রমাগত অপমান করে, মনে করে এ এক-রকমের বাহাদুরী!

থ্রোট ট্রাবলের কথা কি বলছিল?

হ্যাঁ, গলায় ব্যথা হয়। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

ডাক্তার দেখিয়েছে?

দেখিয়েছে। তিনি বড় ডাক্তারের পরামর্শ নিতে বলেছেন। শীঘ্রই কলকাতা যাব একবার।

কিছুদিনের মধ্যেই প্রণিধান করলুম প্রিয়দাকে দিয়ে কাজ চলবে না। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, সব চেয়ে দুঃখের কথা প্রিয়দা অকেজো হয়ে পড়ছে তার তথাকথিত গুণের আধিক্যবশত। সে বড় বেশী খাঁটি, বড় বেশী সৎ। খাঁটি সোনায় কাজ হয় না—অল্প কিছু খাদ না মেশালে সে সোনায় গহনা গড়া চলে না। প্রিয়দা বড় বেশী নিখাদ সোনা। খাঁটি লোহাতেও কাজ হয় না—অল্প কার্বণ তার সাথে না মেশালে। অথচ এই সহজ সত্যটা বোঝানো গেল না বিজ্ঞানের ছাত্র সত্যপ্রিয় আচার্যকে।

আমাদের সময়টাই বড় বিচিত্র। আমাদের ট্র্যাজেডিটা তাই বড় বেশী করুণ। আমরা কলেজ থেকে ছাপ মারা এঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম একটি যুগসন্ধিক্ষণে। ঠিক তার আগেই শেষ হয়েছে বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধে লোকে লাখ লাখ টাকা অসৎ উপায়ে উপার্জন করেছে তা আমরা চোখের ওপর দেখেছি—অর্থনৈতিক কারণে তারা সমাজের মাথায় চড়ে বসেছে; কিন্তু নৈতিক কারণে তাদের আমরা ঘৃণা করতে শিখেছিলাম কলেজে থাকতেই। দুর্ভিক্ষকে আমরা চোখের উপর দেখেছি, আর মর্মে মর্মে অনুভব করেছি তার কারণ। কালোবাজারী মজুতদার, আর ঘুষখোর সরকারী কর্মচারীদের আমরা আন্তরিক ঘৃণা করতে শিখেছিলাম। আমরা যখন বেরিয়ে এলাম কলেজ থেকে তখন আমাদের দাদাদেরও বের

Pathagar.net

হয়ে আসতে দেখেছি বিদেশী শাসকদের জেলখানা থেকে। সদ্যস্বাধীন এ মহান উপদ্বীপে আমরা দেশগঠনের ব্রত নিতে সেদিন উন্মুখ ছিলাম। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি আমার সহপাঠীরা অনেকেই সেদিন চাকরিকে চাকরি হিসাবে দেখেনি— ব্রত হিসাবে গ্রহণ করছিল। রেল, ডি. ভি. সি., সিন্ধ্রি, পূর্তবিভাগে তারা যেগে দিল যুদ্ধে আর বিদেশী শাসনে জর্জরিত ভারতবর্ষকে নূতন করে গড়ে তুলতে। ঠিক প্রিয়দার মতো না হলেও এরা অধিকাংশই ছিল সৎ ও কর্তব্যনিষ্ঠ। তারপর তিল তিল করে দুনিয়াকে চোখের সামনে বদলে যেতে দেখলুম। আমাদের যে সব দাদারা এতদিন জেল খেটেছেন অন্তরীণে নির্বাসিতের জীবন কাটিয়েছেন, নানাভাবে অত্যাচারিত হয়েছেন, তাঁদেরই বদলে যেতে দেখলুম সবার আগে। প্রথমটা বিশ্বাস করতে মন চায়নি; তর্ক করেছি, ঝগড়া করেছি—কিন্তু একের পর এক প্রমাণ জড়ো হয়েছে চোখের সামনে। শেষ পর্যন্ত খদ্দরের টুপির উপরেই জন্মালো বিজাতীয় ঘৃণা। আমার সেই সব সতীর্থ বন্ধুদেরও বদলে যেতে দেখলুম। কেউ বললে—এ এমন একটা মেশিনারী যে তুমি একা এর ভিতর খাঁটি হয়ে থাকতে পার না। কেউ কেউ তা মানতে চায় না; অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে থাকে উপরওয়ালার কাছে। উপর উপর উপর আরও উপর। তারপর বুঝতে পারে ভ্রান্তিটা। সত্যপ্রিয়দার ভাষায় বুঝতে শেখে—'টপ টু বটম্ চোর; আগা-পাছ-তলা।'

অধিকাংশই গা ভাসালো সে স্রোতে। যাঁদের হাতে নেতৃত্ব তুলে দিয়েছে দেশ, ভোট দিয়ে পাঠিয়েছে পথ নির্দেশ করতে তাঁরাও বোধকরি নিশ্চিন্ত হলেন। যা ছিল ঘৃণার বস্তু তাই হয়ে গেল জীবনযাত্রার স্বাভাবিক অঙ্গ। কালোবাজারের প্রকাশ্য লেনদেনে আর আপত্তি নেই কারও। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা পাত্রের পিতাকে অসঙ্কোচে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন—ছেলেটির উপরি আয় কত?



Pathagar.net

নিত্য নূতন স্ক্যাণ্ডেলের মুখরোচক খবর পড়লাম আমরা সংবাদপত্রে এবং নিত্য তা ধামাচাপা পড়তেও দেখলুম। নূতন পরিবেশে একে একে সকলেই খাপ খাইয়ে নিল নিজেকে।

শুধু একমাত্র ব্যতিক্রম,—আমার জানা দুনিয়ার—সত্যপ্রিয়দা। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দেখতে পেলুম চালু কাজগুলো একে একে সব বন্ধ হয়ে গেল! এর বালি খারাপ, ওর ইট ফার্স্ট ক্লাস নয়, তার মজুরেরা ঠিক মত মজুরি পায় না। বাধ্য হয়ে প্রতিবাদ করতে হল, —মজুরেরা ঠিক মতো পেমেন্ট পাচ্ছে কি পাচ্ছে না সে ঠিকদার বুঝবে। তার হিসাব দেখার দায় সরকারী এঞ্জিনিয়ারের নয়। প্রিয়দা তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে—আমি সে কথা মানি না। সে দায়িত্বও এঞ্জিনিয়ারের। ঠিকাদার মুনাফা পাচ্ছে, অথচ মজুরদের ন্যায্য মজুরি যদি সে মিটিয়ে না দেয় তা আমাদের দেখতে হবে বৈকি।

আমি বিরক্ত হয়ে বলি: না! সরকার সে জন্য মাইনা দেয় না তোমাকে। তারা যদি ঠিকমতো মজুরি না পায় তাহলে আদালতে নালিশ করতে পারে। তোমার অত মাথাব্যথা কেন?

প্রিয়দা ইংরাজিতে জবাব দিলে: মাথাব্যথা এইজন্যে যে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় টাকা যার, আদালত তার।

আমিও চটে উঠে বলি: তাহলে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সমাজ সংস্কারের কাজে লেগে যাও!

প্রিয়দা বললে: থ্যাংক্‌স্ ফর দ্য সাজেসন্!

পরদিনের ডাকেই পেলুম তার পদত্যাগ পত্র।

আবার দৌড়াতে হল আসানসোল। এখন ভাবি কেন গিয়েছিলুম আমি? আমার কি গরজ ছিল? সত্যপ্রিয় আচার্য চাকরিতে ইস্তফা দিক না দিক তাতে আমার কি? সে কি আমাদের বন্ধুত্বের খাতিরে? আমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে প্রিয়দা চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে এটা আমার কাছে ভাল লাগেনি বলে? না তা নয়;—প্রিয়দার প্রতি তখন আমার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি, কণামাত্র

pathagar.net

দুর্বলতাও ছিল না। আমি গিয়েছিলুম শুধু রঞ্জনার মুখ চেয়ে। পঙ্কিল গ্লানিকর জীবনের অনিবার্য পরিণাম থেকে প্রিয়দা তাকে উদ্ধার করে এনেছিল। সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। সেজন্য প্রিয়দা আমার নমস্য। কিন্তু প্রতিদানে রঞ্জনাও কিছু কম করেনি। সে ছায়ার মতো অনুগামিনী হয়েছে প্রিয়দার। সাথীর মতো, সচিবের মতো, ললিত কলাবিধির দরদী নর্মসহচরীর মতো। এ সমাজের আদবকায়দা যে রপ্ত করেছে—শিখেছে বাঙালীর রীতিনীতি ; বাঙলা ভাষা। মাত্র কয় বছর আগে যে মেয়ে 'চন্দ্রনাথ, বইয়ের মলাটের উপর লেখাটাও পড়তে পারত না, সে আজ দুর্গেশ দুমরাজের রেফারেন্স দিয়ে কথা বলতে শিখেছে। আমার তো মনে হয় বিয়ের আগে রঞ্জনা যে কারণে যেভাবে ওকে ভালবাসতো—আজ তা ছাড়া আরও অন্য একটি কারণে তাকে ভালবাসে। পুরুষের মধ্যে যে অসাধারণত্ব যে অস্বাভাবিকত্ব তার প্রতি মেয়ে-মনের আলাদা একটা আকর্ষণ আছে। তুমি যদি সাধারণ স্বাভাবিক হও তোমার ঘর করতে এসে ওরা ঘরনী হবে। সুখী হবে। কিন্তু তুমি যদি হও ব্যতিক্রম তাহলে তোমার ঐ ব্যতিক্রমটুকুর জন্যেই ওদের মনের কোণে সঞ্চিত হবে শ্রদ্ধাবিজড়িত একটা আলাদা জাতের মাধুর্য। বিজ্ঞানী, শিল্পী, সাধক আদর্শবাদীদের প্রতি মেয়ে-মনের একটা ভিন্ন জাতের আকর্ষণ আছে, এটা আমি বারে বারে অনুভব করেছি। দণ্ডকারণ্যে এক পাগল ডাক্তারের স্ত্রীকে দেখেছি, আমার পরিচিত একজন আত্মভোলা অন্ধ অধ্যাপকের সহধর্মিণীকে দেখেছি—তাঁদের প্রেমের মৌল উপাদান ঐ পাগলামি, ঐ অস্বাভাবিকত্ব ? বোধকরি রঞ্জনাও তার স্বামীর এই আদর্শ-বাতিকটাকে একটা অবিমিশ্র শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শুরু করেছিল।

সে যাই হোক আজ আর জনান্তিকে স্বীকার করতে বাধা নেই একরকম ক্ষমা চেয়েই প্রিয়দাকে বাধ্য করলুম পদত্যাগ পত্রখানা প্রত্যাহার করতে।

pathagar.net

তা তো হল। কাবুলের লেখাপড়া বন্ধ হল না, রঞ্জনার উনুনে আঁচ পড়ল। কিন্তু আমার কী গতি হবে? আমি কিভাবে কাজ চালাই? ক্রমাগত অভিযোগ আসতে থাকে প্রিয়দার বিরুদ্ধে। গোপনে এবং প্রকাশ্যে। ওভারসিয়ারবাবুরা বিরক্ত। ঠিকাদাররা বিদ্রোহী। বাধ্য হয়ে দ্বারস্থ হলুম আমার উপর-ওয়ালার। সুপারেন্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার সাহেবকে বলি: আপনি তো জানেন প্রিয়দা আমার সহপাঠী। একরকম সিনিয়ারই। কলেজ থেকেই তাকেই দাদা ডাকি। আমার পক্ষে তাকে ম্যানেজ করা সত্যই মুশকিল হয়ে পড়েছে। আপনি একটা ব্যবস্থা করুন। চীফ এঞ্জিনিয়ারকে বলে প্রিয়দাকে অন্য কোন ডিভিসনে—

বাধা দিয়ে এস.ই-সাহেব বলেন: সবই জানি। কিন্তু কি করব বল। পারলে তুমিই পারবে ওকে সামলে রাখতে। কলেজে তোমাদের দুটিতে তো খুব বন্ধুত্ব ছিল শুনেছি। অন্য কারও ডিভিসনে আচার্যকে বদলি করে দিলে দু'দিনেই মাথা কাটাকাটি হয়ে যাবে।

এস. ই-সাহেবও বি. ই. কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। প্রিয়দার অনেক কথাই জানতেন তিনি। বস্তুত এঞ্জিনিয়ার-মহলে আধপাগলা আচার্যি-সাহেবের নামে অনেক মুখরোচক কাহিনী ততদিনে চাউর হয়ে গেছে।

বাধ্য হয়ে ব্যর্থ মনোরথেই ফিরে আসতে হল আমাকে।

কোনদিকে আর কুল-কিনারা দেখতে পাই না। অফিসসুদ্ধ লোক ওর বিরুদ্ধে গেছে। এত বেশী সৎ-অফিসারকে কেউ সহ্য করতে পারছে না। ধুম করে ওদের সাব্‌ডিভিসনে বিশ্বকর্মা পূজা হত। আট-দশ বছরের পূজা। এবার বন্ধ থাকল। অফিস থেকে ইলেকট্রিক কানেকশান সে নিতে দেবে না। ফুটো না করে বাঁশ বেঁধে সরকারী টিনে যে মণ্ডপ বানানো হত তাতেও সাহেবের আপত্তি। এমনকি ঠিকাদারদের কাছে কেউ চাঁদাও চাইতে পারবে না।



pathagar.net

প্রিয়দার সত্তা অসীম কি না জানি না, কিন্তু আমার সহ্যের একটা সীমা আছে। একদিন সুযোগ হয়ে গেল। খবর না দিয়েই আসানসোলে গেছি। গিয়ে শুনি প্রিয়দা নেই। কোথায় বুঝি কাজ দেখতে বেরিয়েছে। সেই সুযোগে সব কথা খুলে বললুম রঞ্জনাকে। আমার আশঙ্কার কথা, বস্তুত প্রিয়দার বিপদের কথা। যেভাবে সে চলছে ওভাবে কাজ চল্‌তে পারে না। বৎসরান্তে বাজেটে বরাদ্দ টাকা খরচ করতে না পারলে যখন কৈফিয়ত দেবার ডাক আসবে তখন আমি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বললে ভবি ভুলবে না! রঞ্জনাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলুম যে আমিই তার এসব অত্যাচার সহ্য করছি, অন্য কেউ হলে এতদিনে তার চাকরি যেত। কিন্তু আমি ভাল করে মন খুলবার আগেই একেবারে ভেঙে পড়ল রঞ্জনা। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে সে। আমি তো অপ্রস্তুতের একশেষ। রঞ্জনা কিন্তু কোন সংকোচ করল না। খুলে বলতে থাকে তার দুঃখের কথা।

বুঝতে পারি সেদিন যা মনে হয়েছিল তা ভুল। হয়তো একদিন প্রিয়দার সততায় মুগ্ধ হয়েছিল রঞ্জনা—কিন্তু পারিপার্শ্বিকতার চাপে ওর মনটাও মরে গেছে। যেমনভাবে মরেছে আমার সতীর্থদের সঙ্কল্প—নূতন ভারতবর্ষকে গড়ে তোলার অঙ্গীকার স্পষ্টই বুঝতে পারি ওদের দুজনে বোঝাপড়ায় গোঁজামিল আছে। অত সৎ আর নিখাদ মানুষ নিয়ে রঞ্জনাও সুখী হতে পারেনি। বোধকরি প্রিয়দার সততা আর সত্যবাদিতাকে সে শ্রদ্ধার চোখেই দেখতে শুরু করেছিল প্রথমটায়; কিন্তু তার ফলাফলটা ক্রমাগত আঘাত করে করে ওর মনটাকে আজ ভিন্ন ধারায় নিয়ে যেতে চাইছে। সে বুঝি ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠেছে প্রিয়দার এই বাড়াবাড়িতে। প্রিয়দা, ওর মতে, দিন দিন সিনিক হয়ে উঠেছে। সততা আর সত্যবাদিতার শুচিবায়ুতে পেয়ে বসেছে তাকে। কোনও সমাজে, কোনও পরিবেশেই সে যেন আর স্বাভাবিক নয়। সর্বত্র সজারুর মতো সে

pathagar.net

তার বিবেকের কাঁটা ফুলিয়েই আছে। হয়তো এতটা সিনিক সে হয়ে উঠত না ; তার বিশ্বাস নবভারতের কর্মকর্তাদের অসাধুতাই তাকে এই পথে টেনে নিয়ে গেছে। সে যেন একক বিদ্রোহী ! স্বাধীন ভারতবর্ষ তার সততার দাম দিচ্ছে না—অতএব এর কোন কিছুই ভাল নয়। রঞ্জনা বলে : ও এতদূর সিনিক হয়ে উঠেছে যে রেডিওর সঙ্গে পর্যন্ত ঝগড়া করে।

অবাক হয়ে বলি : সে কি রকম ?

রঞ্জনা ম্লান হেসে বলে : রোজ সকালে সাড়ে সাতটায় ওর নিউজটুকু শোনা চাই। রেডিও যদি বলে—পরিকল্পনা কমিশন অমুক প্রকল্প বাবদ এত কোটি টাকা স্যাংসন করেছেন, অমনি ও বলবে—তার মধ্যে কত কোটি কে পকেটস্থ করবেন ? রেডিয়ো ওর কথায় কান না দিয়ে তার প্রচারকার্য চালায়, ও রেডিওর কথায় কান না দিয়ে আপন মনে গালাগালি দেয়। এই চলে নিত্য ত্রিশ দিন !

প্রশ্ন করি : আচ্ছা ওর আগের কাজটা গেল কেন ?

আপনি শোনেননি ?

না তো।

রঞ্জনা সে কাহিনীও আমাকে সবিস্তারে শোনাল। ওদের সেই ব্রীজটি তৈরি হতে বিলম্ব হচ্ছিল বলে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী স্বয়ং তদন্তে আসেন। তিনি নাকি প্রিয়দাকে জনান্তিকে ডেকে প্রশ্ন করেন—ঠিক করে বলত, কাজ বন্ধ হয়ে গেল কেন ?

প্রিয়দা নাকি অম্লান বদনে বলেছিল : আপনার এ. ই. ঘুষ চায়।

তাহলে তার উপরওয়ালার কাছে অভিযোগ করনি কেন ?

কারণ তিনিও তাই চান !

তাহলে তাঁর উপরওয়ালার কাছে—

বাধা দিয়ে প্রিয়দা বলেছিল : কিন্তু তাঁর উপরওয়ালার উপরালা তো আপনি। এই তো আপনাকেই বলছি। ব্যবস্থা একটা করে দিন না !

pathagar.net

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিব্রত হয়ে বলেছিলেন : তাহলে লিখিত অভিযোগ দাও !

প্রিয়দা বলেছিল—কিন্তু ওঁরা তো লিখিত ঘুষ চান না, প্রমাণ কোথায় আমার ?

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হেসে বলেছিলেন : কিন্তু তুমি আমার কাছে আমার ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে মৌখিক ডিফামেটারি কথা বলেছ। তারজন্যই যদি আমি তোমার বিরুদ্ধে মামলা আনি ?

প্রিয়দা নাকি বলেছিল : তাহলে আমি খুশী হব স্যর্। বিকস্ মাই সলিসিটর উড দেন আস্ক ইয়ু কোশ্চেনস্ ইন এ কোর্ট অফ ল, হুইচ আই কাণ্ট আস্ক !

ক্ষতিপূরণ দিয়ে অসমাপ্ত কাজ ছেড়ে চলে এসেছিল প্রিয়দা ! শুনলুম ওদের আর্থিক অবস্থাও ভাল নয়। যত্র আয় তত্র ব্যয়। বছর কয়েক আগে একটি মানহানির মামলায় যা কিছু সঞ্চয় ছিল তা গেছে। প্রশ্ন করে জানতে পারি নবদ্বীপের তর্করত্নমশাই এখনও আছেন। তিনি এদের কোন সংবাদ রাখেন না। এখনও নাকি অথর্ব হয়ে পড়েননি। স্বপাক আহার করেন। চতুষ্পাঠীতে মাঝে মাঝে গিয়ে বসেন এখনও সেই নব্বই বছরের বৃদ্ধ !

আমার মনে হল প্রিয়দা আর রঞ্জনার মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির মূল কারণ বোধহয় আরও গভীরে নিহিত। বিবাহের বৎসরেই রঞ্জনার একটি সন্তান হয়েছে, তারপর দীর্ঘদিন আর কিছু হয়নি। কিন্তু কে জানে, কাবুলের পিতৃত্বের দায় প্রিয়দার কিনা। যদি না হয় ? তাই কি দ্বিতীয়বার মাতৃত্বের গৌরবলাভে বঞ্চিত হয়েছে রঞ্জনা ? তাই যদি হয় তা হলে প্রিয়দার মহত্ত্ব কোথায় ? যে সংস্কারবশে ওর পিতামহ রঞ্জনাকে স্বীকার করে নিতে পারেননি—প্রিয়দাও তো তাহলে সেই সংস্কারেরই দাস। শুধুমাত্র সমাজের চোখে রঞ্জনাকে স্ত্রীত্বে বরণ করে নেওয়ার মধ্যে বীরত্ব কোথায়, যদি না জীবন দিয়ে বাকীটুকু পুরিয়ে নেওয়া যায় ? আজ রঞ্জনাকে দেখে মনে হল

pathagar.net

প্রিয়দা শুধুমাত্র রঞ্জনাকেই বঞ্চনা করেনি, নিজেকেও বঞ্চিত করেছে। প্রিয়দাকে মনে মনে যে উচ্চাসনে বসিয়েছিলুম তা থেকে তাকে নামিয়ে আনতে পেরে মনে মনে স্বস্তি পেলাম। মনে মনে বললুম —অমন লোক দেখানো সাধুতা আমরাও দেখাতে পারি।

তখন কিছু মনে হয়নি, কিন্তু আজ লিখতে বসে মনে হচ্ছে আমি কি প্রিয়দাকে ঈর্ষা করতুম? না হলে এ-মনগড়া ব্যাখ্যা খাড়া করে সান্ত্বনা খুঁজব কেন আমি? রঞ্জনা আর প্রিয়দার অন্তরালের জীবন সম্বন্ধে যখন কিছুই আমার জানা নেই তখন এসব কথা কেন ভাবতে গিয়েছিলুম সেদিন?

সমাধান যে আসন্ন তা কিন্তু আমিও আন্দাজ করতে পারিনি। চারদিক থেকে অভিযোগে কান যখন ঝালাপালা হয়ে উঠবার উপক্রম করেছে তখন হঠাৎ কে যেন খবর দিল প্রিয়দা গুরুতর অসুস্থ। সংবাদ-প্রাপ্তি মাত্র গিয়ে খবর নিতে পারিনি। জরুরী কাজে কদিন বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়েছে। ফিরে এসে খবর পেলুম প্রিয়দা ছুটির দরখাস্ত রেখে কলকাতা চলে গেছে। আসানসোলে ওরা কেউ নেই। সস্ত্রীক সে কলকাতা গেছে চিকিৎসা করাতে।

মার্চ মাস। বিল পেমেণ্ট নিয়ে নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ নেই। তবু ওরই মধ্যে খবর পাওয়া গেল কলকাতায় কোন হাসপাতালে নাকি প্রিয়দা ভর্তি হয়েছে। কিন্তু রঞ্জনা তাহলে কোথায় আছে? ওর তো তিনকুলে কেউ নেই। অবস্থার বাড়াবাড়ি? কাবুলকে স্কুল থেকে আনিয়েছে? কোন খবর পাইনি। আমার অফিস তখন বর্ধমানে। রাজবাড়ির পিছনে পায়রাখানায়। প্রচণ্ড কাজের চাপে সময় পাচ্ছি না সংবাদ নেবার। আসানসোলের অফিসে কেউ কিছু বলতে পারল না। এতদূর বিরাগভাজন হয়েছিল সে অফিসস্টাফের। শেষকালে একজন ঠিকাদারই খবর আনলে—খবর শুনেছেন স্যার? আচার্যি-সাহেবের?

চমকে উঠে বলি: না! কী হয়েছে তার? কোথায় আছে?

pathagar.net

চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালে। ফিরে আর আসতে হচ্ছে না। আপনি স্বচ্ছন্দে সাবস্টিট্যুট চাইতে পারেন।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। এমন একটা মানুষের শেষ পর্যন্ত ক্যানসার হল? না হবেই বা কেন? ঈশ্বর যে করুণাময়। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণরও তো তাই হয়েছিল!

একদিন ওরই মধ্যে সময় করে চলে এলুম কলকাতায়। হাসপাতালে গিয়ে একটু খোঁজ করতেই হদিস পাওয়া গেল। ভিসিটিং আওয়ার্স সবে শুরু হয়েছে। নানান জাতের নানান বয়সের লোক আসছে। সকলেরই মুখে একটা নিরাশা, একটা আতঙ্কের ছায়া। আমার পাশ দিয়েই একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রমহিলা নেমে গেলেন রুমাল দিয়ে নাক মুছতে মুছতে।

প্রিয়দার দেখা পেলুম তার চিহ্নিত বেড-এ। আধ শোয়া করে শুইয়ে রেখেছে। পিঠের দিকে খান-কয়েক বালিশ। টেবিলের উপর গ্লাসে মরশুমি ফুলের একটি গুচ্ছ। ওর চোখ দুটো যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। চুলগুলি অবিন্যস্ত। তবু ওরই মধ্যে আমাকে দেখে হাসল। বললে: খবর পেয়েছিস্ দেখছি, আয় বোস্।

ওর খাটের পাশেই একটি টুল। তার উপর আমার দিকে পিছন ফিরে বসেছিলেন একজন ভদ্রলোক। দামী স্যুট-পরা। আমাকে দেখেই টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। চিনতে পারলুম ভদ্রলোককে। প্রেমচাঁদ লাডিয়া। আমারই ঠিকাদার। প্রিয়দার সাবডিভিসনে একটি বড়ো ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট তৈরী করছেন। কয়েক লক্ষ টাকার বড় কাজ। প্রিয়দার সঙ্গে এঁর মনোমালিন্যটাই সবচেয়ে তীব্র হয়ে উঠেছিল। ভদ্রলোক অতি ধূর্ত আর সুযোগসন্ধানী। ইনি যে ব্যাধিগ্রস্ত প্রিয়দাকে দেখতে হাসপাতালে আসবেন তা ভাবতেই পারিনি। আমাকে কোন কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই ভদ্রলোক বলেন: আপনি বসুন স্যার, আমি এবার মিসেস্ আচার্যকে নিয়ে আসি।

pathagar.net

বললুম : মিসেস আচার্যি কোথায় ?

ফিরে এসে বলব স্যার ! এখন প্রতিটি মিনিট মূল্যবান। মিসেস্ আচার্যি সমস্তদিন এই সময়টুকুর জন্য প্রহর গুণছেন।

তা বটে। আমি আর দ্বিরুক্তি না করে বসে পড়ি ওঁর পরিত্যক্ত টুলে। কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই। মিস্টার লাডিয়া আবার আমাকে জনান্তিকে ডাকলেন : এক মিনিট স্যার !

উঠে আসতে হল বাইরের বারান্দায়। লাডিয়া বললেন : ওঁকে যেন বেশী কথা বলতে দেবেন না। ডাক্তারের বারণ আছে। দ্বিতীয়ত সিগারেট চাইলে দেবেন না। তৃতীয়ত, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত যদি কাইণ্ডলি—

আমি বাধা দিয়ে বলি : বিলক্ষণ ! আপনি না আসা পর্যন্ত নিশ্চয়ই অপেক্ষা করব : কিন্তু রোগীর অবস্থা কেমন, বুঝছেন ডাক্তারেরা ?

লাডিয়া দার্শনিকের হাসি হেসে বলেন : এ রোগের আবার ভাল থাকা, মন্দ থাকা !

প্রশ্ন করি : আপনার ফিরে আসতে কতক্ষণ লাগবে ?

দশ মিনিট। গাড়ি নিচেই আছে। মিসেস্ আচার্য আমার ওখানেই আছেন।

মনে হল ভদ্রলোককে এতদিন ভুল বুঝেছি। প্রিয়দার বিরুদ্ধে একসময় সেই ছিল সব চেয়ে মুখর। কী একটা সাপ্লিমেণ্টারি ক্লেম নিয়েনাকি বেধেছিল দুজনের। প্রিয়দা কিছুতেই রাজী হয়নি ক্লেমটা দিতে। দিলে লাডিয়া অন্তত হাজার বিশেক টাকা পেয়ে যেত। এখন আর সে টাকা পাইয়ে দেওয়ার ক্ষমতাও নেই প্রিয়দার। অথচ ভদ্রলোক এখন সর্বতোভাবে তাকে সাহায্য করতে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে এগিয়ে এসেছেন।

ব্যস্তসমস্তভাবে উনি সিঁড়ির দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। আবার হঠাৎ ফিরে এলেন কি ভেবে। আমাকে বারান্দায় রেলিং-এর কাছে

pathagar.net

নিয়ে গিয়ে নিচের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন : ঐ ছোকরাকে চেনেন ?

দেখলুম দুজন ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন দ্বিতলে ওঠার সিঁড়ির দিকে। দুজনেরই প্যাণ্ট-শার্ট, কৃষ্ণবর্ণ,—বোধহয় অবাঙালী। বললুম : না, চিনি না !

ভদ্রলোক রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে বললেন : আমিও চিনি না। কিন্তু ঐ বাঁ দিকের ভদ্রলোকের আচরণ সন্দেহজনক। উনি নাকি কোন একসময় মিস্টার আচারিয়ার অধীনে কাজ করতেন। সেই সুবাদে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ভদ্রলোক এখানে আসেন।

আমি বলি : তাতে আপত্তির কি আছে ?

আছে স্যার, একটু পরেই টের পাবেন। মিস্টারের চেয়ে মিসেস্ আচার্যির দিকেই ওর নজর বেশী। আপনি নিশ্চয় জানেন আচার্যি-সাহেবের স্ত্রী বাঙালী নন। ঐ ছেলেটি—

তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি ভেবে থেমে যান। তাড়াতাড়ি বলেন : নাঃ, আর দেরি করব না। আমি চলি।

ফিরে গিয়ে বসলুম প্রিয়দার পাশে।

প্রিয়দা একগাল হেসে বলে : আয় বোস, কেমন রাজ-রোগ বাধিয়ে বসেছি ছাখ।

সরকারী চাকরিতে যোগ দেবার পর থেকে এ ভাষায় প্রিয়দা আমার সঙ্গে কথা বলে না। সর্বদা ইংরাজিতে কথা বলেছে। ইংরাজিতে আপনি-তুমির বালাই নেই। হয়তো আমার অধীনে চাকরি নিতে বাধ্য হয়ে বেচারার আত্মাভিমান আহত হয়েছিল। আজ সে, বাধা ঘুচে গেছে। পুরানো সেই সুরে সে আবার তুই-তোকারী শুরু করেছে।

ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতেই ধমক দিয়ে ওঠে : হতভাগা, আমার সাহচর্যে এ্যাদ্দিনেও সত্যি কথা বলতে শিখলি নে ? এখনও অপ্রিয় সত্য এড়িয়ে যাবার চেষ্টা ? এ রোগ কখনও ভাল হয় ?





pathagar.net

জবাব দেবার বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পেলুম সেই দুজন ভদ্রলোক এসে পড়ায়। বাঁ দিকের সেই চিহ্নিত ভদ্রলোকটি এসেই প্রিয়দাকে ধমক লাগালো, ইংরাজিতে বললে : আবার আপনি কথা বলছেন স্যার ? আপনি যদি এভাবে কথা বলেন তাহলে ভিজিটিং আওয়ার্সে আমরা কেউ আসব না। কই, ভাবিজী কই ? এখনও আসেননি বুঝি ?

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন : স্যারকে ইন্ট্রোডিউস্ করতে দেব না। আসুন আমরা নিজেরাই নিজেদের পরিচয় দিই। আমার নাম নটরাজা নিজলিঙ্গাপ্পা রামালু, আর ইনি—না আমি কেন বলব ?

ওর সঙ্গী হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে বললে : এস· এল· শ্রীবাস্তব। আমরা দুজনে একই অফিসে কাজ করি।

আমি নিজ পরিচয় দিয়ে রামালুকে বলি : আপনার কথা আচার্যির কাছে অনেক শুনেছি। এমন কি এ কথাও শুনেছি আপনি জ্যান্ত মানুষকে মেরে ফেলতে পারেন।

রামালু হেসে বললে : দ্যাটস্ নো কম্প্লিমেন্ট। খুনী আর জল্লাদই শুধু নয় আপনিও তা বহুবার করেছেন !

অবাক হয়ে বলি : আমি ?

রামালু রসিক। সে সব খোঁজ রাখে। প্রিয়দা বলত এমন লোককে কর্মচারী পাওয়া বড় ভাগ্যের কথা। রামালু বলে : আপনার অনেক কথা যে আমিও শুনেছি ভাবিজীর কাছে। শুনেছি আপনি একজন বেঙ্গলী নভেলিস্ট। মানুষ খুন তো আপনাকে আকছারই করতে হয়।

আমরা সবাই হেসে উঠি। রামালু এক মুহূর্তে হাল্কা করে দিল হাসপাতালের আবহাওয়া।

রামালু আবার বলে : মিস্টার লাডিয়াকে আজ দেখছি না যে বড় ?

pathagar.net

আমি বললুম : সে গেছে মিসেস্ আচারিয়াকে আনতে।

ও! বলে চুপ করে গেল রামালু।

একটু পরেই রঞ্জনা আর কাবুলকে নিয়ে মিস্টার লাডিয়া ফিরে এলেন। কিন্তু লাডিয়াকে আবার বেরিয়ে যেতে হল। ডাক্তারে কয়েকটি ইনজেকসান না ওষুধ এনে দিতে বলেছেন। রঞ্জনা আর প্রিয়দাকে নিভৃতে দুটো কথা বলার সুযোগ দিয়ে আমি রামালুকে নিয়ে বেরিয়ে এলুম বারান্দায়।

রামালুর কাছ থেকে সব খবর পাওয়া গেল। প্রিয়দাকে ছেলেটি সত্যই শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। ওর ধারণা কয়েক শ' বছর আগে জন্মালে প্রিয়দা ঈশ্বরের অবতার বলে স্বীকৃত হত। যেটাকে আমাদের চোখে বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়েছে ওর চোখে তা নাকি নিতান্ত স্বাভাবিক। স্বাভাবিক তোমার আমার কাছে নয়, মহাপুরুষদের কাছে। প্রিয়দা নাকি তেমনি একজন মহাপুরুষ। বললে : যীশুখৃষ্ট বা সক্রেটিশ যদি এই বিংশশতাব্দীতে জন্মাতেন তাহলে আবার তাঁকে আমরা ঢিল ছুঁড়তাম, বিষ এনে দিতাম। প্রিয়দাকে যেমন আমরা সবাই মিলে ক্রুশবিদ্ধ করেছি, 'হেমলক' পান করিয়েছি। তর্ক করে লাভ নেই। ওর কাছ থেকে খবর পেলুম এখনও নবদ্বীপে কোন সংবাদ দেওয়া হয়নি। এতে নাকি প্রিয়দার ঘোর আপত্তি। আমি বললুম : তা হয় না। বৃদ্ধকে খবর একটা দিতেই হবে। এবং সেটা অবিলম্বেই দেওয়া উচিত।

রামালু প্র্যাকটিকাল মানুষ। বললে : প্রথমটায় আমারও সেই রকম মনে হয়েছিল। কিন্তু ভেবে দেখুন তাতে কী লাভ? প্রথমত তিনি হয়তো আর ছ'মাস কি এক বছর বাঁচবেন। কোন খবর তিনি রাখেন না। তাঁকে শান্তিতেই মরতে দেওয়া উচিত আমাদের। তবু তিনি এ বিশ্বাস নিয়ে মরতে পারবেন, যে তাঁর নাতি সুখে আছে। দ্বিতীয়ত ভেবে দেখুন, তিনি নিষ্ঠাবান অতি বৃদ্ধ গোঁড়া ব্রাহ্মণ। কলকাতায় এলে কোথায় উঠবেন? কাই বা সাহায্য করবেন তিনি

pathagar.net

এসে ? তৃতীয়ত, রোগীর যা মনের অবস্থা তাতে এতদিন পর এভাবে ওঁদের দেখা-সাক্ষাৎ হতে গিয়ে দু'জনের যে কেউ হার্টফেল করতে পারেন। চতুর্থত, রঞ্জনাদেবীর সঙ্গে—

সঙ্কোচে থেমে গেল সে। মনে হল, রামালু ঠিক বিশ্লেষণ করেছে। এক্ষেত্রে নবদ্বীপে সংবাদ দিলে সুবিধা তো কিছু হবেই না, উপরন্তু পরিস্থিতিটা আরও জটিল হয়ে পড়বার আশঙ্কা আছে। কলকাতা শহর বড় ছোট, নিষ্ঠাবান তর্করত্নমশায়ের এখানে স্থান সঙ্কুলান হওয়া শক্ত। রঞ্জনার সঙ্গে একই ছাদের নিচে নিশ্চয়ই তিনি থাকতে রাজী হবেন না।

ক্রমে ঘণ্টা পড়ল হাসপাতালে। প্রিয়দাকে মামুলি সান্ত্বনা দেবার আর চেষ্টা করলুম না। বিদায় নিয়ে চলে আসব, প্রিয়দা ইঙ্গিতে কাছে ডাকল। ওর কাছে যেতে কানে কানে বললে, ওদের কী হবে ?

কী বলব !

রঞ্জনা আর কাবুলের কি হবে এ কথা আমিও ভেবেছি। কোন কূলকিনারা করতে পারিনি। সত্যপ্রিয় আচার্যের পৈত্রিক বাস্তু ভিটা আছে, কিন্তু সেখানে ওদের ঠাঁই হবে না। নিয়তির কী পরিহাস। মধ্যভারতের এক রাজার কুমার যার সর্বাঙ্গ সোনায় মুড়ে দিতে চেয়েছিল তার ভরণ-পোষণের কথা ভাবছে এমন একটি মানুষ যে ধনকুবেরের হাত থেকে পেয়েছিল ব্ল্যাঙ্ক চেক !

বললুম : কিছু ভেব না তুমি, আমরা তো আছি !

প্রিয়দা কিছু বলতে চাইল। পারলে না। যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেল ওর মুখটা। নিঃশব্দে পালিয়ে এলুম। দু'চোখ বন্ধ করে প্রিয়দা তখন যন্ত্রণা সহ্য করছে। সে টেরও পেল না।

রামালু নমস্কার করে বিদায় হল। লাডিয়া আমাকে জোর করে নিয়ে গেল তার বাড়ি। ভাবলুম সেই ভাল, রঞ্জনার সঙ্গে কিছু পরামর্শ করা দরকার।



pathagar.net

দেখা গেল স্থানটা লাডিয়ার বাড়ি নয়। ওর গাড়ি থাকে যে গ্যারেজে তারই উপরে আধতলার মেজানাইন ঘরে আশ্রয় নিয়েছে রঞ্জনা। কৈফিয়তের ভঙ্গিতে লাডিয়া বললে : সে ব্যাচিলার, একা থাকে। তাই এই বিকল্প ব্যবস্থা। অসুবিধা অবশ্য কিছু নেই। পৃথক বাথরুম আছে। স্টোভেই দুটি ফুরিয়ে নেয় রঞ্জনা।

আমি বললুম : কাবুলকে মিছামিছি আটকে রেখে কী লাভ? এ তো দু-চারদিনে মিটবার নয়। সে হস্টেলেই যাক।

রঞ্জনা তৎক্ষণাৎ বললে : না, ও এখানেই থাকবে।

মনে হল লাডিয়ার সামনে সে ইতস্তত করছে। কিছু একটা বলতে চায় রঞ্জনা, আর ঠিক তাই যেন লাডিয়া আঠার মতো সেঁটে থাকল আমার সঙ্গে। অগত্যা তার সম্মুখেই আমাকে প্রশ্ন করতে হল : টাকা-পয়সার কি রকম ব্যবস্থা হচ্ছে?

রঞ্জনা সে কথার জবাব না দিয়ে লাডিয়াকে বলে : কিছু জল-খাবার আনলে হ'ত। সাহেব অফিস থেকে সোজা এসেছেন।

বুঝলুম বুদ্ধিমতী মেয়েটি ফন্দী করেছে ভাল। লাডিয়া গেল খাবার আনতে। কাবুলও গেল গাড়িতে। রঞ্জনা তৎক্ষণাৎ বললে : এই লাডিয়া লোকটা কেমন বলুন তো?

আমি বললুম : যতদূর জানি উদার পরোপকারী নয়।

তাই তো জিজ্ঞাসা করছি। কিন্তু আমার বিপদে খুবই সাহায্য করেছেন। আপনি টাকার কথা তখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—টাকা আমার হাতে নগদ কিছুই ছিল না। একছড়া মালা আর চুড়ি বিক্রি করেছি, কলকাতা এসে। শ' আড়াই টাকা এখনও আছে তা থেকে। মিস্টার লাডিয়াও টাকার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আমি জানিয়েছি যে, প্রয়োজনমতো টাকা আমার হাতে আছে।

কেমন যেন সন্দেহ হল, বললুম : লাডিয়ার ভয়েই কি কাবুলকে আটকে রাখতে চাইছ?

pathagar.net

রঞ্জনা লজ্জা করল না। খোলাখুলি বললে : ঠিক তাই। অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে চাও ?

এর চেয়ে নিরাপদ আশ্রয় হলে নিশ্চয়।

নিরাপদ! কেন কিছু কি হয়েছে ?

একটু ইতস্তত করে রঞ্জনা বললে : আপনি তো আমার সব কথাই জানেন; আমি মানুষের চোখ দেখেই বুঝতে পারি। অনেক তো দেখা আছে আমার।

বললুম : আচ্ছা দেখি কি করতে পারি।

একটু ভেবে নিয়ে ফের বলি : নবদ্বীপে খবর দেওয়ার বিষয়ে তোমার মত কি ?

আয়ত চোখ দুটি আমার মুখের উপর মেলে বললে : লাভ আছে কিছু ?

আর কিছু না হোক আর্থিক দিকটায় হয়তো কিছু সুবিধা হত—

দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে রঞ্জনা বললে : না! এতে আপনার বন্ধুর ঘোরতর আপত্তি।

আবার ইতস্তত করে বলি : কিন্তু ধর যদি ভালমন্দ কিছু একটা হয়েই যায়—

বাধা দিয়ে রঞ্জনা বলে : ভালমন্দ হয়ে যায় মানে ?

কি করে বোঝাই ? একি 'ভালমন্দ' শব্দটার সম্বন্ধে ঐ অবাঙালী মেয়েটির অজ্ঞতা, নাকি চরমতম দুর্ঘটনার কথাটা সে আন্দাজই করেনি! ক্যানসার রোগটার সম্বন্ধে ওর কি ঠিক মতো ধারণা নেই ? ওকি ভেবেছে এটা ইন্‌ফুয়েঞ্জা, ব্রঙ্কাইটিসের সমগোত্রীয় কোন ব্যাধি ? ভুল ভাঙলো পরমুহূর্তেই। রঞ্জনা পরিষ্কারভাবে বললে : এ অসুখে তো ভালমন্দ হবার কিছু নেই। শুধু দিন গোনাই সার।

সামলে নিয়ে বলি : তাহলে ?

pathagar.net

তাহলেই বা কি ? নবদ্বীপে খবর দেওয়া হলেও তো কোন সুরাহা হবে না। আমাকে অন্য কোনভাবে বেঁচে থাকতে হবে। কাবুলকে মানুষ করতে হবে।

অবাক হয়ে ভাবছিলুম—কী ধাতুতে ঐ নারীমূর্তিটিকে বিধাতা গড়েছিলেন ?

বললুম : প্রিয়দা ইন্সিওর করেনি কিছু ?

এত দুঃখেও রঞ্জনা ম্লান হাসলে। বললে : সেসব কথা ভাববার অবকাশ পরেও পাওয়া যাবে। যদি ইন্সিওর না করে থাকেন তাহলে এখন তো আর তা করানো যাবে না। অন্য জরুরী কথাগুলি বরং আলোচনা করে নেওয়া যাক ওরা ফিরে আসার আগে।

আমি বললুম : তুমি এ আশ্রয় ত্যাগ করতে চাইছ ? কলকাতায় আমার আত্মীয়-বন্ধু কিছু আছেন তাঁদের কাছে চেষ্টা করে দেখব ?

রঞ্জনা বললে : দেখতে পারেন, মর্যাদা নিয়ে মাথা গুঁজে থাকতে পারলেই আমি খুশী। আর একটা কথা। হাসপাতাল থেকে যেন বেশী দূরে না হয়। আমি তো একা একা ট্রামে-বাসে যাতায়াতে অভ্যস্ত নই।

আবার বলি : আচ্ছা রুস্তমজীকে খবর দিলে কিছু লাভ আছে ?

রঞ্জনা বলে : আপনি জানেন না ? তিনি বছর তিনেক আগেই মারা গেছেন।

বাধ্য হয়ে বলতে হল : তোমার দাদামশায়ের নামটা আমি জানি না। শুনেছি তিনি পূর্ব-বাংলায় নামকরা একজন ডাক্তার ছিলেন। তোমার মামাও ছিলেন একজন। তাঁদের ঠিকানা না জানলেও নামগুলো জান কি ?

রঞ্জনা একটু চুপ করে থেকে বলে : এতদিন পরে সে সব খোঁজ কি আপনি পাবেন ? আর পেলেও তাঁরা কি স্বীকার করে নেবেন আমাকে ?

pathagar.net

তা ঠিক।

এর একটু পরেই লাডিয়া ফিরে এল এক ঠোঙা খাবার হাতে।

দিন সাতেক পরে আবার ফিরে এলাম কলকাতায়।

ইতিমধ্যে রঞ্জনার জন্য আশ্রয়ের সন্ধান করেছি নানান স্থানে এ পাড়ায় আমার চেনা-জানা বাড়ি বিশেষ নেই। যাও বা আছে সেখানে স্থানাভাব। একজন প্রায় রাজী হয়েছিলেন, কিন্তু মেয়েটির বয়স ও রূপের কথা শুনে বলেন: দুঃখ তো হয় বাবা কিন্তু ঘরে বড় বড় ছেলেরা আছে, সখ করে কে আগুন আনবে বল?

সপ্তাহখানেক পরে ফের যেদিন হাসপাতালে দেখা করতে গেলাম সেদিন লাডিয়াকে দেখিনি। রামালু ছিল হাসপাতালে। রঞ্জনাও ছিল। কাবুলকে আর হাসপাতালে নিয়ে আসা হচ্ছে না। প্রিয়দার অবস্থা ক্রমশ খারাপ হয়ে পড়েছে। কথাবার্তা বলা একদম বারণ। কষ্ট হয় ওর কাছে গিয়ে বসলে। জ্ঞান আছে টনটনে। বড় বড় চোখ মেলে দেখছে সব কিছুই। আমাদের প্রশ্নে মাথা নেড়ে সায়ও দিচ্ছে। কথা বলা বারণ বলে নয়, কথা সে বলতে পারে না আর। ওর জ্ঞান যদি না থাকত তাহলেই খুশী হতুম। তাহলে যন্ত্রণাটার বোধও থাকত না ওর। একটা প্রবন্ধে পড়েছিলাম বিলাতে নাকি একদল ডাক্তার আন্দোলন করছেন এই জাতীয় মরণোন্মুখ রোগীকে বিষপ্রয়োগে নিষ্কৃতি দেওয়া উচিত। একদল এ মতের নাকি ঘোরতর বিরোধী। প্রিয়দার অবস্থা দেখে মনে হল—যাঁরা এ মতের বিরোধিতা করেছেন তাঁরা কি কখনও স্বচক্ষে কোন ক্যানসার রোগীর যন্ত্রণা দেখেননি? আর আশ্চর্য মানুষ ঐ রঞ্জনা;—যার স্বামী এমন তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, দুনিয়ায় যার দাঁড়াবার আর কোন ঠাঁই নেই তাকে এমন শান্ত সমাহিত চিত্তে দুর্দৈবকে স্বীকার করে নিতে দেখিনি!

ক্রমে ঘণ্টা পড়লো হাসপাতালে। বার হয়ে এলাম আমরা।

pathagar.net

ফ্যালফ্যালে দৃষ্টি মেলে প্রিয়দা তাকিয়ে থাকে। বাইরে এসে রামালুকে প্রশ্ন করি : লাডিয়াকে দেখলুম না যে ?

রামালু জবাব দেবার আগেই রঞ্জনা বললে : আজকাল আর তিনি বড় একটা আসেন না।

আমি বলি : সে কি ? তুমি তাহলে আর গাড়িতে আস না ?

না। আমি আর ওখানে থাকি না আজকাল।

কোথায় থাক তাহলে ?

রামালু বলে : চলুন, সেখানেই যাচ্ছি আমরা।

বেশী দূর নয় ; হাঁটতে হাঁটতে চলে এলুম সবাই। হাসপাতালের কাছেই একটা মেসবাড়ি। দাক্ষিণাত্যের কতকগুলি মানুষ গোটা দ্বিতল বাড়িটা ভাড়া নিয়ে মেস করে আছে। রামালু দীর্ঘদিন এখানকার বাসিন্দা। সে-ই উদ্‌যোগী হয়ে রঞ্জনাকে এনে তুলেছে এখানে। প্রথমটায় মেসের ম্যানেজার বালসুব্রহ্মনিয়মের প্রচণ্ড আপত্তি ছিল ব্যাপারটায়। পুরুষমানুষে ভর্তি মেসে মেয়েছেলে আনা ঠিক নয়। দ্বিতীয়ত, ভদ্রমহিলা বাঙালী, এখানকার বাঙালী সমাজ যদি এ নিয়ে গণ্ডগোল করে তাহলে একটা প্রাদেশিক ঝামেলার মধ্যে পড়ে যাবে ওরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর আপত্তি টেকেনি। সম্মিলিত সম্মতির কাছে তাঁকেও নতি স্বীকার করতে হয়েছে। সিঁড়ির উপর চিলেকোঠায় ছিল একটা সিংগল সীটের ছোট ঘর। কোন সদাগরী অফিসের অ্যাকাউণ্টাণ্ট কৃষ্ণমূর্তিজী ছিলেন সেটায়। বঙ্গবাসী মহিলার বিপদের কথা শুনে স্বেচ্ছায় তিনি তাঁর ঘরখানা ছেড়ে দিয়ে নিচের একটি চার সীটের ঘরে সাময়িকভাবে আশ্রয় নিয়েছেন। আমরা ওদের মেসে গিয়ে পৌঁছাতেই কয়েকজন যুবক এগিয়ে এসে রামালুকে তাদের ভাষায় কি সব প্রশ্ন করতে থাকে। হস্‌পিটাল, ইলেকট্রোথেরাপী ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারে বুঝতে পারি প্রিয়দার কথাই আলোচিত হচ্ছে। রামালু তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। তাঁরা আমাকে জানালেন

মিসেস্ আচার্য সম্বন্ধে আমি যেন ভাবিত না হই। তাঁদের পক্ষে যেটুকু সম্ভব তাঁরা নিশ্চয়ই করবেন।

ত্রিতলের ঘরে গিয়ে বসলুম আমরা। কাবুলকে দেখতে পেলুম না। প্রশ্ন করে জানা গেল সন্ধ্যাবেলায় রামালুর বন্ধু শ্রীবাস্তব তাকে পড়ায়। রামালু তার বিচিত্র উচ্চারণে বললে: য়ু সী উই মাস্‌ট নেগ্‌লেক্টঅ হিস্‌স্টাডিস!

রঞ্জনাও স্বীকার করলো এদের ভদ্রতার কথা। সকলেই তার খোঁজখবর নিচ্ছে—যার যেটুকু সাধ্য করছে। কলকাতাবাসী আমাদের অফিসের কেউ কেউ খোঁজ নিতে আসছে। হাসপাতালে ভিজিটিং আওয়ার্সেও অনেকে আসেন। রঞ্জনা আমাকে জানাল অন্যত্র আশ্রয় সন্ধানের আর প্রয়োজন নেই। যে কদিন থাকতে হবে, এখানেই সে থাকবে।

আর রঞ্জনার সঙ্গে আরও খোলাখুলি কথা হল। প্রিয়দার নগদ সঞ্চয় কিছুই নেই। হাজার পাঁচেক টাকার লাইফ ইন্সিওর করেছিল—কিন্তু সময়ে প্রিমিয়াম না দেওয়ায় তাও ল্যাপ্‌স্ হয়ে গেছে। প্রিয়দা নেশাভাঙ করে না, খরচে নয়, এতদিন চাকরি করছে অথচ সঞ্চয় কিছু নেই কেন প্রশ্ন করায় শুনলাম বছর কয়েক আগে একটা মানহানির মামলায় সে সর্বস্বান্ত হয়েছে। মামলায় প্রিয়দা জিতেছিল। মান রক্ষা হয়েছে, কিন্তু তহবিলও সেই সঙ্গে নিঃশেষ হয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম লাডিয়ার কথা।

রঞ্জনা বলে: সে আবার এক কাণ্ড। আমি যে আশঙ্কা করেছিলাম তা ঠিক নয়। মিস্টার লাডিয়ার নজর আমার উপর ছিল না। তিনি আপনার বন্ধুর প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন।

আমি বলি: সে কি রকম?

আপনি জানেন, আমি ক্রমশ তাঁর উপর নির্ভর করতে বাধ্য হচ্ছিলাম। আমি অবশ্য সর্বদাই সতর্ক থাকতাম। ওঁর কিছু একটা

pathagar.net

হলে আমি কোথায় যাব, কি করব এসব জিজ্ঞাসা করতেন। কোথায় যে যাব তা আমি নিজেই জানি না, তা কি বলব ?

ওঁর প্রশ্ন শুনে আরও বিব্রত হয়ে পড়তাম আমি। আমার আর্থিক সঙ্গতি কি আছে তাও জানতে চাইতেন। আমি অবশ্য খোলাখুলি কিছুই কোনদিন তাঁকে বলিনি, তবু আমার পুঁজি যে দিন দিন ফুরিয়ে আসছে তা উনি বুঝতে পারছিলেন। একদিন হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে মিস্টার লাডিয়া বলেন—মিসেস্ আচার্যি আপনাকে বন্ধু-ভাবে একটা প্রশ্ন করব, জবাব দেবেন ?

আমি বিব্রত বোধ করলেও বলি : বলুন ?

প্রশ্নটা এর আগেও অনেকবার করেছি। আপনি জবাবটা এড়িয়ে গেছেন। আজ আবার তাই জিজ্ঞাসা করছি। আচার্যি সাহেবের অবস্থাটা তো বুঝতে পারছেন। তাঁর কিছু একটা হলে আপনি কোথায় দাঁড়াবেন, কি করবেন ?

একই প্রশ্ন বারে বারে শুনতে শুনতে সেদিন আমি আর ধৈর্য রাখতে পারিনি। বলেছিলাম আপনি তো জানেনই মিস্টার লাডিয়া—সে কথা আমি জানি না !

কিন্তু এভাবে চোখ বুজে থাকলে তো চলবে না রঞ্জনা দেবী। সেদিনের জন্যে এখন থেকেই আপনাকে চিন্তা করতে হবে, ব্যবস্থা করতে হবে। আপনি দুনিয়ায় একা নন,—আপনার ছেলেটিকে মানুষ করতে হবে।

সবই তো বুঝছি, কিন্তু—আমি কী করতে পারি বলুন ?

সে কথা বলব বলেই তো এ প্রসঙ্গে এসেছি। শুনুন, আমার প্রস্তাব। যদি পছন্দ হয় তাহলে গ্রহণ করবেন আমার প্রস্তাব।

ভদ্রলোক ক্রমে ক্রমে তাঁর প্রস্তাব পেশ করেন।

বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছাকাছি বড় রাস্তার উপর লাডিয়া সাহেবের একখানা বাড়ি আছে। একতলায় একসার দোকান

pathagar.net

দ্বিতল ও ত্রিতল ফ্ল্যাট-সিস্টেমে ভাড়া দেওয়া। ঐ একতলার দোকানের একটি হচ্ছে ডাইং-ক্লিনিং। দোকানটির ভাড়া মাসে পঞ্চাশ টাকা। যে ভদ্রলোক দোকানটি চালাতেন তিনি সম্প্রতি মারা গেছেন। চালু দোকানে তালা পড়েছে। আমি যদি দোকানটির ভার নিই, তাহলে উনি আমাকে সেটা ভাড়া দিতে পারেন।

আমি বলি: কিন্তু যে ভদ্রলোক মারা গেছেন তাঁর স্ত্রী-পুত্র—

বাধা দিয়ে, উনি বলেন: না। ভদ্রলোক বিপত্নীক। একটি ছেলে আছে, বিদেশে চাকরি করে। সে দোকান চালাতে পারবে না আমি খাতাপত্র দেখেছি। দোকান থেকে মাসে দু শ' আড়াই শ' টাকা রোজগার হয়। আপনাকে শুধু কাউণ্টারে বসে কাপড়-জামা নিতে হবে, ধোপাদের হিস্যা বুঝিয়ে দিতে হবে, আর ডেলিভারি দিতে হবে। সে সব আমি আপনাকে শিখিয়ে দেব। তা ছাড়া ঐ বাড়ির একটি এক কামরার ঘরও খালি আছে। সেটায় না হয় থাকবেন আপনি।

কী জবাব দেব বুঝে উঠতে পারি না, কিন্তু আমাকে ভাববার সময় না দিয়ে ভদ্রলোক আমাকে দোকানটা দেখিয়ে আনলেন। যারা কাপড় কাচে তাদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলিয়ে দিলেন। তারা খুবই উৎসাহ দেখাল। আমি অনেক ভেবে-চিন্তে দেখলুম এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আমার পক্ষে আর কিছু হতে পারে না। আমি রাজী হয়ে গেলুম।

লাডিয়া তখন বললেন: এ জন্য তাহলে হাজারখানেক টাকা আপনার খরচ হবে।

আমি বলি: কেন? টাকা কিসের?

বাঃ! দোকানের জন্য সেলামী দিতে হবে না? না, না আমাকে নয়, যে ভদ্রলোক মারা গেছেন তাঁর ছেলেকে এই টাকা দিতে হবে আপনাকে। এ ছাড়া ধোপাদের বকেয়া পাওনাও কিছু

pathagar.net

আছে,—শ' তিনেক টাকা। তার মানে হাজার দেড়েক টাকা আপনার ক্যাপিট্যাল ইনভেস্টমেণ্ট দরকার হবে।

আপনি অন্তত জানেন—দেড় হাজার টাকা আমার হাতে নেই। তাই চুপ করে থাকতে হল আমাকে।

লাডিয়া আমার অবস্থাটা অনুমান করে বললেন: বুঝেছি! আচ্ছা দেখি কি করতে পারি।

এর পর দু চার দিন ও বিষয়ে আর কিছু উচ্চবাচ্য করলেন না। শেষে আমি নিজে থেকেই আমার প্রসঙ্গটা তুললুম। তার কারণও ছিল। বদ্রীদাস এসে আমাকে ধরেছিল, যেন এ সুযোগ আমি না ছাড়ি।

আমি বাধা দিয়ে বললুম: বদ্রীদাস কে?

রঞ্জনা বললে: ধোপার সর্দার। বস্তুত সে-ই দোকানের কাপড় জামার হিসাব জানত। সে বললে: মাঈজী, এমন সুযোগ আপনি ছাড়বেন না। আমাকে বিশ্‌ওয়াস করুন। আমি ঠিক চালিয়ে নিব কারবার।

তা আমি নিজে থেকেই যখন ও প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম তখন লাডিয়া বললেন: কিন্তু আপনার কাছে তো দেড় হাজার টাকা নেই।

আমি লজ্জার মাথা খেয়ে বলি: সেটা না হয় আপনিই আমাকে ধার দিন। ক্রমে ক্রমে শোধ করে দেব আমি।

লাডিয়া সে কথার জবাবে বললেন: মিসেস্ আচার্যি, আমি কিন্তু অন্য একটা আর্জি নিয়ে আপনার কাছে এসেছি! আপনি যদি আমার একটা উপকার করে দেন তাহলে আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকব।

আমি তো অবাক! এমন মানুষের কী উপকার করতে পারি আমি? উনি বললেন: কাজটা আপনার পক্ষে খুবই সহজ অথচ আমার পক্ষে অসম্ভব।

pathagar.net

আমি বললুম : কী এমন কাজ ?

কিন্তু লাডিয়া এক কথায় তার জবাব দিলেন না। ভূমিকাই করে চলেন তখনও—মিসেস আচার্যি, আপনার স্বামী একজন সাচ্চা আদমি। আমি তাঁর ঠিকাদার—আমি জানি তিনি ঘুষ নেন না। কিন্তু তাতে কী ফয়দা হয়েছে তাঁর ? কী পেয়েছেন আপনি ? দুনিয়ার হাল তো দেখছেন। সাচ্চা আদমিদের জমানা এখন নেই। তা এতদিন তিনি যা করেছেন, করেছেন—এখন আপনাদের দুজনের একটা ব্যবস্থা করে যাওয়া তার কর্তব্য, নয় কি ? সরকারের স্বার্থ দেখাও যেমন তাঁর কর্তব্য, স্ত্রী-পুত্র যেন পথে না বসে তাও দেখা উচিত তাঁর—না কি বলেন ?

আমি বাধা দিয়ে বলি, আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

মিস্টার লাডিয়া হেসে বলেন : এখনই বুঝবেন।

এই বলে তিনি ফোলিও ব্যাগ খুলে একখণ্ড কাগজ আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেন : আপনি এইখানে আচার্যি সাহেবকে দিয়ে একটা সহি করিয়ে আনবেন। সইয়ের নিচে কোন তারিখ দেবেন না। এতে তাঁর কোন অসুবিধা নেই। অথচ আমি অনেকগুলো টাকা পেয়ে যাই।

কাগজখানা হাতে নিয়ে আমি স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকি। আমাকে এক নজর দেখে নিয়ে উনি বলেন : আর ভুল বুঝবেন না আমাকে, এর পারিশ্রমিক হিসাবে নয়, আপনার বিপদের কিছুটা ভাগ নিতে চাই বলে এটা রেখে গেলাম।

রঞ্জনা একটু ইতস্তত করে বললে : খামটা টেবিলের উপর রেখেই তিনি চলে গেলেন। অনেকক্ষণ আমি সেটা খুলে দেখিনি। তারপর সেটা খুলে দেখলুম। পঁচিশখানা একশ' টাকার নোট !

আমি বললুম : তারপর ?

pathagar.net

বিচিত্র হেসে রঞ্জনা বললে : আপনার কাছে সব খোলাখুলি বলব। লজ্জা করব না। ওঁর সঙ্গে আমার মতের ঠিক মিল হয়নি। প্রথম প্রথম অবশ্য আমি ওঁকে বুঝবার চেষ্টা করতাম—ওঁর কথামত এটাকে ঘৃণার চোখেই দেখতাম। তারপর ক্রমশ আমার মন ঘুরে গেল। যেসব জায়গায় উনি কাজ করেছেন সেখানে দেখেছি ওঁর সহকর্মীদের জীবন। তারা প্রচুর খরচ করে, তাদের সংসারে অভাব নেই। নিত্য-নতুন শাড়ী, গাড়ী, গহনা। আর আমাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায়। তাও সহ্য করেছি কিন্তু যখন দেখতুম প্রতিবেশীর ছেলের নিত্য-নতুন স্যুট হচ্ছে, খেলনা আসছে, আর কাবুল তার পুরানো রবারের বল নিয়ে ম্লানমুখে ঘরের কোণে বসে আছে তখন মাঝে মাঝে কেমন যেন অসহ্য বোধ হত। মনে হত এ এক জাতের পাগলামি। এই যখন যুগের রেওয়াজ তখন এভাবে কৃচ্ছ্রসাধন করার মানে কি? কিন্তু তবু ওকে আঘাত দিতে মন সরত না—হাজার হোক আমার জন্য তো ও কম ত্যাগ স্বীকার করেনি। এমন মানুষকে অশ্রদ্ধা করি কেমন করে? কিন্তু তবু আবার সময় সময় মন বিদ্রোহ করে উঠত।

একটু থেমে আবার বলে : এসব কথা শুনে আপনার নিশ্চয়ই খুব ঘৃণা হচ্ছে, না?

কী বলব? তবু ভদ্রতার খাতিরে বলি : তা কেন? আপনি তো সত্যি কথাই বলেছেন।

সহানুভূতি পেয়ে আবার মুখর হয়ে ওঠে রঞ্জনা। বলতে থাকে—নিজেকে বঞ্চনা করেছি; কিন্তু কাবুলের বেলা আমি আর স্থির থাকতে পারিনি। কাবুলকে একজন একটা এয়ারগান উপহার দিয়েছিল—ও তখন ট্যুরে। ফিরে এসে তাই নিয়ে সে কি কেলেঙ্কারি। কাবুল তো দুধের বাচ্চা, সে কি বুঝবে বলুন? তবু তার কাছ থেকে সেটা ছিনিয়ে নিয়ে তখুনি ফেরত দিয়ে এল। কাবুল কেঁদে-কেটে সারাদিন কিছু খেল না। আমি রাগ করে বললুম—তা হলে তুমিই



pathagar.net

একটা কিনে এনে দাও। ও জবাবে বললে—একটা এয়ারগানের দাম কত জান?

জবাবে আমি যে কথাটা বলেছিলাম তা আর আজ আপনার কাছে বলতে পারব না। কিন্তু অনেক দুঃখে কথাটা আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল সেদিন। ও সে আঘাতে একেবারে নীল হয়ে গেল। একটাও জবাব দিল না। কিন্তু বিশ্বাস করুন আপনি, আমার কেমন যেন রোখ চেপে গিয়েছিল সেদিন, আমার মনে হয়েছিল যে ও কাণ্ডটা কিছুতেই করতে পারত না, কাবুল যদি,··· কাবুল যদি—

হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ে রঞ্জনা। আমি বাধা দিয়ে বলি: থাক ও কথা!

না থাকবে না! রঞ্জনা অনেক কষ্টে সামলে নেয় নিজেকে। বলে: আজ আমাকে মন খুলে সব কথা বলতে দিন। সেদিন আমার মনে হয়েছিল—ও কিছুতেই কাবুলের হাত থেকে ওভাবে ঐ এয়ার গানটা কেড়ে নিতে পারত না, ও যদি সত্যই কাবুলের বাবা···

রঞ্জনা!

উত্তেজনায় আমি দাঁড়িয়ে উঠি। রঞ্জনাও যেন সংবিৎ ফিরে পায়।

বলি: মিসেস্ আচার্যি, আপনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। যেসব কথা বলার নয়, তাই বলতে যাচ্ছেন আপনি। না, না আর একটি কথা নয়। আমি এবার যাই।

রঞ্জনাকে সেদিন আর কিছু বলবার সুযোগ আমি দিইনি। এক রকম ছুটেই পালিয়ে এসেছিলুম।

এ নিয়ে পরে চিন্তা করেছি। সেদিন হঠাৎ রঞ্জনা অমন কথা কেন বলতে গেল আমাকে? এ কথা কি মুখে উচ্চারণ করবার? এ কথা কি কান পেতে শুনবার? তাই মাঝপথেই আমি বাধা দিয়ে থামিয়ে দিয়েছিলাম ওকে।

কিন্তু ঠিক কি তাই? এ আমার আত্মচরিত নয়, তবু ঔপন্যাসিক



pathagar.net

হিসাবে আজ এই 'আমি' চরিত্রটাকে একবার বিশ্লেষণ করবার ইচ্ছে জাগছে। বোধকরি সেদিন ওকে থামিয়ে দেবার আর একটা প্রেরণা ছিল আমার অবচেতন মনে। সে প্রেরণা রঞ্জনার সতীত্ব-সংক্রান্ত গোপনীয়তার জন্য নয়। সে ঐ পঁচিশখানা এক শ'টাকার নোটের কথা। আমি শুনতে চাইনি সে টাকা রঞ্জনা রেখেছিল না ফেরত দিয়েছিল। আমার অবচেতন মন বলছিল যে সেটা শোনার পর তোমাকে বলতে হত—ও টাকা আপনি আমার কাছ থেকেই বরং ধার নিন। কিংবা কে জানে, রঞ্জনা, নিজেই যদি বলত—সে টাকা আমি লাডিয়ার মুখের উপর ছুঁড়ে মেরেছি, ভাল করিনি ?

তাহলে আমাকে বলতে হত—বেশ করেছেন, ভাল করেছেন।

আর তারপর রঞ্জনা যদি বলত—আপনার তো অনেক টাকা, আমাকে কিছু ধার দিন না ? মাসে মাসে শোধ দিয়ে দেব আমি।

না, সজ্ঞানে এসব কথা আমি ভাবিনি। যদি ঘটনা এই খাতেই বইত তাহলে হয়তো রঞ্জনাকে কিছু টাকা ধারই দিতাম আমি, শোধ পাওয়ার আশা না রেখেই। সত্যপ্রিয় আচার্যের স্ত্রীকে দেড়-দু হাজার টাকা দান করা আমার পক্ষে কি একেবারেই অসম্ভব হত ? কি জানি। কিন্তু ঘটনা তো সে খাতে বয়নি।

দু-চার দিন বাদে আবার আমাকে অন্তরালে পেয়ে রঞ্জনা বললে : আপনার সঙ্গে সেই কথাটা আমার শেষ হয়নি।

আমি কণ্টকিত হয়ে বলি : কোন কথাটা ?

সেই আড়াই হাজার টাকাটা—

সেটা কি তোমার কাছেই আছে ?

মাথা নীচু করে রঞ্জনা বললে : হ্যাঁ !

একবার মুখে এল বলি—সেটা তুমি ফিরিয়ে দাও। কিন্তু সাহস করে তাও বলতে পারলুম না। ওকে পরখ করবার জন্য বরং বললুম, সই করেছে প্রিয়দা ?

না !

pathagar.net

সে চেষ্টা করেছিল নাকি ?

এতক্ষণে রঞ্জনা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। বললে : সই সে করেনি, কিন্তু তাকে বলেছি সব কথা। কাগজখানা তার কাছেই আছে !

কী আশ্চর্য ! তা শুনেও আমি বল্‌তে পারলুম না—ছি, ছি, ছি ! যাও এখনি যাও ! নিয়ে এস সে কাগজখানা ফিরিয়ে। আর এই নাও আড়াই হাজার টাকার চেক্। যবে পারবে শোধ দিও।

আমার কি তখন মনে পড়েছিল আমার ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের অঙ্কটা ? আমার কি স্মরণ হয়েছিল, যোধপুর পার্কের জমিটা আমাদের পছন্দ হয়েছে—বায়না করা বাকি ? আমার কি মনে ছিল আগামী পূজার ছুটিতে সপরিবারে কাশ্মীর ভ্রমণের একটা পরিকল্পনা ছিল আমার মনে ?

রঞ্জনা আপন মনে বলতে থাকে—আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু তার সে দৃষ্টি আমি জীবনে ভুলব না। প্রথমটা সে অস্বীকার করেছিল, কিন্তু আশ্চর্য পাষাণ আমি, যে লোকটা মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে, যে লোকটার দুনিয়ায় ঐ আদর্শটুকু ছাড়া আপনার বলতে আর কিছু নেই তাকেও আঘাত দিতে আমি পিছপাও হইনি। আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি—এ দুনিয়ায় ও একেবারে একলা। স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ওর কেউ নেই—থাকার মধ্যে আছে একটা ব্রহ্মাণ্ড-জোড়া মূর্খামি—সে ওর আদর্শ ! আপনি তো জানেন, মানুষটা একদিন লাখ টাকা প্রত্যাখ্যান করেছিল তার আদর্শকে বাঁচাতে, আর সেই লোকটাকে মাত্র আড়াই হাজার টাকার জন্য আমি—

একেবারে কান্নায় ভেঙে পড়ল রঞ্জনা।

এমন বিপদে আমি জীবনে পড়িনি।

রঞ্জনা হঠাৎ উঠে গিয়ে বাক্স থেকে বার করে আনল একখানা খাম। সেটা আমার হাতে দিয়ে বললে : এটা আপনি মিস্টার

pathagar.net

লাডিয়াকে ফেরত দিয়ে দেবেন। ও থেকে কিছুই খরচ করিনি আমি।

যন্ত্রচালিতের মতো খামখানা হাত বাড়িয়ে নিলুম। বললুম: আর সেই কাগজখানা?

সেখানা ওর বালিশের নিচে আছে। কাল বিকালেই গিয়ে ছিঁড়ে ফেলব সেখানা।

এ কাহিনীর আর অহেতুক জের টেনে লাভ নেই। সদ্যোস্বাধীন এক মহান উপদ্বীপে আমার যে সহপাঠী 'অনেস্টিকে' 'বেস্ট পলিসি' করে জীবনযাত্রায় তরী ভাসিয়ে ছিল তার কাহিনীর এখানেই শেষ। না, ভুল বললুম। 'অনেস্টিকে' সে 'বেস্ট পলিসি' বলত না। প্রিয়দার ভাষায়—যারা বলে 'অনেস্টি ইস্ দ্য বেস্ট পলিসি' আমি তাদের দলে নই, বুঝলি নরেন! তারা একেবারে হস্তিমূর্খ! তাদের জাতও যায়, পেটও ভরে না। পলিসি হিসাবে অনেস্টি নয়, ডিসঅনেস্টিই ফলপ্রসূ। আজকের দুনিয়ায় তার হাতে হাতে প্রমাণ সর্বত্র। কিন্তু সততাকে তো আমি পলিসি হিসাবে গ্রহণ করিনি—করেছি ক্রীড হিসাবে। আদর্শ হিসাবে। তাতে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশী হয়। সেটাই স্বাভাবিক। তা জেনেই তাকে বরণ করেছিলাম। জানতাম, তাতে দুঃখই পাব শুধু। পেয়েছিও তাই। কিন্তু দুঃখ পেয়েছি বলে দুঃখ পাইনি।

আরও দিন দশেক বেঁচে ছিল প্রিয়দা। প্রায় শেষ পর্যন্ত কিন্তু টনটনে জ্ঞান ছিল তার। শেষ কদিন অবশ্য বাকরোধ হয়ে গিয়েছিল একেবারে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত আমাদের দিকে। সে দৃষ্টি মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদের আত্মতৃপ্তির দৃষ্টি নয়,—সে দৃষ্টি পরাজিত সৈনিকের। বোধকরি একেবারে শেষ দিকে প্রিয়দা তার ভুল বুঝতে পেরেছিল। বোধকরি ওর অনুশোচনাও হয়েছিল সেজন্য। কিন্তু সে কথা সে স্বীকার করে যেতে পারেনি। স্বীকার করার ক্ষমতা ছিল না বলেই। তবু ওর নীরব অশ্রুপাতে আমি উপলব্ধি করেছি প্রিয়দা শান্তিতে মরতেও পায়নি।



pathagar.net

ডাক্তারবাবুরা যখন শেষ নিদান হাঁকলেন তখন রঞ্জনা আমাকে ডেকে বললে : হয় আপনি, নয় রামালু, এবার আপনারা একজন নবদ্বীপে যান ! তাঁকে নিয়ে আসুন।

আমি বলি : সে কি ! তাঁকে খবর দেওয়া হবে না এমনই তো স্থির হয়ে আছে।

দৃঢ়স্বরে বললে : না। তা হবে না।

কিন্তু কী প্রয়োজন ? আজ সাত আট বছর তিনি প্রিয়দার কোন সংবাদ রাখেন না। তাঁর জীবন থেকে ও নিঃশেষে মুছে গেছে। হয়তো আর ছ'মাস কি এক বছর বাঁচবেন বৃদ্ধ। তাঁকে এ আঘাত দিয়ে কী লাভ ?

জবাব দিতে গিয়ে ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠল রঞ্জনার ; তবু দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বললে : ওঁর শেষ কাজ কে করবে তা'হলে ?

বললুম : কেন, কাবুল ?

সরল সারঙ্গ দুটি চোখের দৃষ্টি মেলে রঞ্জনা আমার দিকে তাকালো। মরমে মরে গেলুম আমি। কী ভুলই করে বসেছি। তাড়াতাড়ি সংশোধন করে বলি : অথবা তুমি !

রঞ্জনা মুখ নীচু করে শুধু বললে : না !

না কেন ?

এবারও জবাব দিতে দেরি হল ওর। তবু বললে : আপনার বন্ধু তো সে অধিকার দিয়ে যাননি আমাকে !

কী বলতে চায় রঞ্জনা ? এ কথার অর্থ কি ? সামাজিক মর্যাদা দিয়েই সে রঞ্জনাকে গ্রহণ করেছিল। রেজিস্ট্রী মতে বিবাহ করেছে। আইনত প্রিয়দার পারলৌকিক কাজ করার অধিকার আছে রঞ্জনার। তাহলে সে কেন বলছে, প্রিয়দা তাকে সে অধিকার দিয়ে যায়নি ? তবে কি···? কে জানে ! হয়তো আমার অগোচরে আরও কিছু রহস্য রয়ে গেছে ওদের দাম্পত্য জীবনে। হয়তো আজন্মের



pathagar.net

সংস্কারকে প্রিয়দা কোন দিনই কাটিয়ে উঠতে পারেনি। লোকচক্ষুর অন্তরালে যে গোপন দাম্পত্য-জীবন সেখানে হয়তো প্রিয়দা রঞ্জনার মর্যাদা মিটিয়ে দেয়নি। তা যদি ঘটে থাকে তাহলে প্রিয়দার মহত্ত্ব কোথায়? তাহলে তাকে নায়ক করে এ কাহিনী লেখার কী প্রয়োজন ছিল?

কিংবা হয়তো এসব আমার উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা। হয়তো সংস্কারবদ্ধ রঞ্জনাই। সে মনে করে, যেহেতু হিন্দু মতে তার বিবাহ হয়নি, যেহেতু আচার্যবংশের পূর্বপুরুষকে আকাশ-প্রদীপ জ্বেলে পথ দেখাবার অধিকার নেই রঞ্জনার সন্তানের তাই সে প্রিয়দার পারলৌকিক কাজ করতে অশক্ত।

জানি না কী বলতে চেয়েছিল রঞ্জনা।

মোট কথা রামালুকে পাঠিয়ে দিলুম নবদ্বীপে। বৃদ্ধকে আনতে।

সব চেয়ে মুশকিল হয়েছে কাবুলকে নিয়ে। সে বোধকরি বুঝছে সবই, কিন্তু বোবা জন্তুর মতো কোন কথা বলছে না। সবাই কাঁদছে—কিন্তু বোবা জন্তুটা কাঁদছে না। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে শুধু।

বৃদ্ধকে নিয়ে রামালু ফিরে আসার আগেই প্রিয়দা আমাদের ছেড়ে চলে গেল।

অফিস থেকে অনেকেই এসেছেন। বড় বড় ফুলের তোড়া আর মালার পাহাড় জমে গেল হাসপাতালের গেটে। শেষ সময়ে শুধু রঞ্জনা ছিল তার কাছে। কাবুল ছিল না। কোথায় মুখ লুকিয়ে বসেছিল কে জানে। আমরা ব্যস্ত ছিলাম। খোঁজ করিনি তার। রামালু নবদ্বীপে; কিন্তু তার মেসের অনেকেই এসেছেন খবর পেয়ে। শ্রীবাস্তব, বালকৃষ্ণম্ আরও যেন কারা সব।

মুখুজ্জে-মশাই সস্ত্রীক এসেছিলেন খবর পেয়ে। মিসেস্ মুখার্জি আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন: শ্মশানযাত্রীরা রওনা হয়ে গেলে

তিনি রঞ্জনাকে তাঁর বাসায় নিয়ে যাবেন। সদ্যোবিধবার যে সব ক্রিয়াকলাপ বাকি আছে তা তিনিই প্রথামতো করিয়ে দেবার দায়িত্ব নিলেন স্বেচ্ছায়।

প্রশ্ন উঠল, কে মুখাগ্নি করবে। সবাই একবাক্যে বললে: কাবুল।

আমি রঞ্জনার মনোগত ইচ্ছা জানি। শুধু তাই বা কেন, প্রিয়দার আন্তরিক ইচ্ছাটাও আমার অজানা নয়। আমি করি বা না করি, প্রিয়দা আত্মায় বিশ্বাস করত—এতক্ষণে সে সত্যসিন্ধু সত্যশরণদের স্বগোত্র হয়ে উঠেছে। যে কাবুল ওঁদের জন্যে আকাশ-প্রদীপটাও জ্বালতে পারে না—সে কেমন করে মুখাগ্নি করবে? কিন্তু এ কথা তো বলা যায় না। ওদিকে প্রিয়দার মতো একজন আচার-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণের সৎকারে এত বড় ত্রুটি থেকে গেলে যে আমারও অনুশোচনার অন্ত থাকবে না। সমস্যার কোনরকম সমাধানই যখন খুঁজে বার করতে পারলুম না—তখন দেখি হাসপাতালের গেটে এসে থামল একখানা ট্যাক্সি।

উপর থেকেই দেখতে পেয়েছি আমি। গাড়ি থেকে রামালু হাত ধরে নামাচ্ছে নব্বই বছরের বৃদ্ধকে। নবদ্বীপতিলক তর্করত্নমশাই। তাঁর আর একটি হাত ধরে আছে প্রিয়দার দশরথদা।

তাড়াতাড়ি নেমে আসি দ্বিতল থেকে।

দীর্ঘদিন পরে আবার দেখলুম বৃদ্ধকে। একেবারে অথর্ব হয়ে পড়েছেন। দৃষ্টি গেছে, মাথার চুলগুলো ধপধপে সাদা। আবক্ষ সাদা দাড়ি। অর্কফলায় সেই লাল করবী ফুলটি কিন্তু আজ দশ বছরেও শুকিয়ে যায়নি। ফ্রেজার হাসপাতালে দেখেছিলাম তাঁকে খাড়া হয়ে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে আসতে। হাসপাতালে সেদিন যতগুলি রোগী ছিল তাদের সকলেরই উপর ছিল তাঁর আশীর্বাদ-নিষিক্ত সাম্য দৃষ্টি। কিন্তু আজ আর তা নয়। সিঁড়ির প্রথম ধাপেই থপ্ করে বসে পড়লেন তিনি। আমি গিয়ে তাঁর ডান

pathagar.net

হাতটা ধরে বললুম: মনকে শক্ত করুন! ভেঙে পড়লে তো চলবে না।

ঘোলাটে দুটি চোখ মেলে বৃদ্ধ আমাকে দেখলেন একবার। কিছু বললেন না। ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠল শুধু।

নামিয়ে আনা হল প্রিয়দাকে।

ফুলে ফুলে সাজিয়ে দিল তাকে সবাই।

বলহরি—হরিবোল!

বাহকেরা ওকে তুলবার উপক্রম করছে হঠাৎ কোথা থেকে কাবুল এসে ছিটকে পড়ল তার পায়ের উপর। কোথায় মুখ লুকিয়ে ছিল হতভাগা ছেলে। এতদিনের নিরুদ্ধ কান্নার বাঁধ ভাঙলো বুঝি তার আজ। রঞ্জনা তাকে সান্ত্বনা দেবে কি, সেও মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে মুখার্জি-গিন্নির কোলের কাছে। হাসপাতালের একজন অল্প বয়সী ডাক্তার এসে আমার কানে-কানে বলেন: আপনাদের অবস্থা বুঝি, কিন্তু এখানে এ রকম মৃত্যুপথযাত্রী আরও অনেকে প্রহর গুণছে। একটু তাড়াতাড়ি করুন, কাইগুলি।

তা তো ঠিকই। আমি বলি: তোমরা একটু হাত লাগাও ভাই।

কিন্তু প্রিয়দার দুটি পা কাবুল এমন করে আঁকড়ে ধরে আছে যে তাকে সরানো অসম্ভব। রামালু, বালকৃষ্ণম্ এবং আমি বারে বারে তাকে বলে বুঝিয়ে কিছুতেই ছাড়াতে পারছি না। সে সবলে জড়িয়ে ধরে আছে বাপের হাঁটুটা। এ তো মহা বিপদে পড়া গেল!

বৃদ্ধ তর্করত্ন এতক্ষণ বসেছিলেন প্রিয়দার মাথার কাছে। চোখে তাঁর জল নেই। অন্ধ উদাস দৃষ্টি মেলে তিনি কি দেখছিলেন তা তিনিই জানেন। শুধুমাত্র তাঁর ডান হাতখানা প্রিয়দার অবিন্যস্ত চুলের মধ্যে খেলা করে ফিরছিল এতক্ষণ। ধীরে ধীরে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। টল্‌তে টল্‌তে এগিয়ে আসেন শবদেহের পায়ের দিকে। দশরথ ধরতে গেল তাঁকে। বাধা দিলেন বৃদ্ধ। এসে বসলেন কাবুলের কাছে। বলিরেখাঙ্কিত বাম বাহু দিয়ে একেবারে বুকের

মধ্যে জড়িয়ে ধরেন কাবুলকে—কানে কানে কি যেন বললেন মনে হয়।

আশ্চর্য! মুহূর্তমধ্যে কাবুল বাপের হাঁটু ছেড়ে সবলে জড়িয়ে ধরল বৃদ্ধকে। এতক্ষণে হুহু করে কেঁদে ওঠেন জ্ঞানবৃদ্ধ ঐ একফোঁটা কাবুলকে তাঁর পাঁজর-সর্বস্ব বুকের ভিতর জড়িয়ে ধরে।

বলহরি—হরিবোল!

বৃদ্ধ কারও বাধা মানলেন না। নিজেই গেলেন ট্যাক্সি করে কাবুলকে নিয়ে শ্মশানে। আমার দায়িত্ব চুকল। তর্করত্নমশাই যা ভাল বোঝেন তাই করবেন। রঞ্জনাকে নিয়ে মুখার্জি সাহেবও সস্ত্রীক চলে গেলেন। রামালু শ্রীবাস্তবেরাও গেল শ্মশানযাত্রীদের সঙ্গে।

আমি রয়ে গেলাম। হাসপাতালে আমার কাজ বাকি ছিল। হিসাবপত্র মিটিয়ে চলে আসব, হাসপাতালের একজন কর্মচারী বললেন প্রিয়দার জিনিস-পত্র বুঝে নিতে। সামান্যই জিনিস, কিন্তু তার মধ্যে পেলাম একখণ্ড টাইপকরা কাগজ। এটি পাওয়া গেছে মৃতের বালিশের নিচে থেকে।

প্রিয়দার মৃত্যুতে আমি কাঁদিনি। মূর্ছাহত রঞ্জনার অসহায় ভূলুণ্ঠিতা মূর্তি, আর্ত কাবুলের আত্মসমর্পণ, কিংবা দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন স্থিতপ্রজ্ঞ আচার্যের হুহু করে কেঁদে ওঠা দেখে বুকের ভিতর মুচড়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে এ দৃশ্য চোখ চেয়ে দেখা যায় না। কিন্তু তবু চোখ ফেটে আমার জল আসেনি। এই টাইপকরা কাগজখানা হাতে পেয়ে আমার চোখের জল আর বাধা মানল না। ঝরঝর করে ঝরে পড়ল দু-চোখ বেয়ে। কাগজখানা বুকে চেপে ধরে বললুম: ছি ছি ছি! এ তুমি কী করলে প্রিয়দা? শেষ পর্যন্ত তুমিও হেরে গেলে ঐ বাকটন মেশিনটার কাছে!

প্রিয়দার মৃত্যুতে নয়, আমি মর্মাহত হলুম তার মৃত্যু-স্বাক্ষর! মিস্টার লাডিয়ার সাপ্লিমেন্টারী ক্লেম স্বীকার করে নিয়েছে সে। টাইপকরা কাগজখানার নিচে আঁকাবাঁকা অক্ষরে সই করা আছে

pathagar.net

তারিখহীন সত্যপ্রিয় আচার্যের নাম। সারাজীবন যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত অন্তিমশয়নে বেচারা লিখে দিয়ে গেছে তার শেষ দাসখৎ!

কাহিনী আমার শেষ হয়ে গেছে। ঐ আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা সইটাই বোধকরি এ বিয়োগান্ত নাটকের শেষ ট্র্যাজেডি!

ছেলেবেলায় ঠাকুরমায়ের কাছে রূপকথার গল্প শুনতাম। রাজপুত্র আর রাক্ষসের যুদ্ধের গল্প। নরখাদক রাক্ষসের বিক্রমের তুলনায় রাজপুত্র কতটুকুন? তবু কাহিনী শেষে দেখা যেত অত বড় দৈত্যটাকে বধ করে রাজকন্যাকে উদ্ধার করে এনেছেন রাজপুত্র! তারপর আর একটু বড় হয়ে বুঝতে শিখলুম শিশুসাহিত্যের সঙ্গে এ দুনিয়াটার মিল নেই একতিল। বন্দিনী রাজকন্যা সব ক্ষেত্রেই উদ্ধার পান না,—হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ রাক্ষসের আক্রমণে রাজপুত্র ক্ষত-বিক্ষত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। নূতন করে বুঝতে শিখলুম—জয় নয়, রাজপুত্রের মহান মৃত্যুতেই তার সান্ত্বনা। থার্মপলি-হলদিঘাট-চিতোর-বুড়িবালামের তীরে আর কোহিমার জঙ্গলে রাজপুত্রদের পরাজয়ের কাহিনী পড়লাম। সে পরাজয়ই যে জয়। কৈশোরে তাই শিখেছিলুম! তারপর বয়স আরও বাড়ল। দেখলুম রাজপুত্রের সাজ বদল হয়েছে—রক্ষসেরও। রাজপুত্রের হাতের তলোয়ার ভোল পালটে কোথাও হয়েছে কাস্তে কোথাও হাতুড়ি কোথাও বা নিছক কলম। আর রাক্ষসও যুদ্ধে নেমেছে নতুন অস্ত্র নিয়ে লোভ আর মোহ, অর্থ আর পদমর্যাদা, ভোট আর ঘোঁট! ছেলেবেলায় পড়েছিলুম—কুয়াশা কখনও শাশ্বত হতে পারে না—তাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে জ্যোতির্ময়-সূর্যের প্রকাশ হবেই! বাস্তবে দেখলুম—সূর্যও চিরভাস্বর নয়। আবার নতুন করে কুয়াশায় তাকে ঢাকা পড়তে হবে। এ দুনিয়ায় সূর্য যদি সত্য, তবে কুয়াশাও সত্য!

কিন্তু সত্যদা, তুমি যে বলেছিলে আমরা বলে যাব: দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয় গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়! তুমি যে আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলে গদা ঘোরাতে না পারি তবু

বিকর্ণের পার্টটুকু আমরা প্লে করে যাব। তোমার সে প্রতিশ্রুতি তো তুমি রাখতে পারলে না? আমিও পারিনি অবশ্য! নির্যাতনের ভয়ে, চাকরি খোয়াবার ভয়ে সব সত্য কথা সব সময় বলতে পারিনি; কিন্তু আমি তো সত্যপ্রিয় নই! তোমার উপর যে বড় ভরসা ছিল আমার! তোমাদের পাঁচপুরুষের ঐতিহ্য এইভাবে তুমি লুটিয়ে দিলে ধুলায়? রঞ্জনা আর কাবুলকে এত ভালবেসেছিলে তুমি? তাই আজ বেণীর সঙ্গে মাথাটা আর দেওয়া হল না তোমার!

একটা প্রচণ্ড হাহাকারে মনটা ভরে গেল আমার। মনে হল প্রিয়দার মৃত্যুর ট্র্যাজেডি কিছুই নয়।—তার আদর্শের মৃত্যুই হল চরম ট্র্যাজেডি! রঞ্জনা আর কাবুল হয় তো বাঁচল—কিন্তু কী প্রচণ্ড মূল্য দিয়ে বাঁচল তারা!

কিন্তু আমি কি করতে পারি? আমি কি করতে পারতুম!

শ্মশানে এসে যখন পৌঁছালুম তখনও দাহকার্য শেষ হয়ে যায়নি। শ্মশান বন্ধুরা অপেক্ষা করছে। চিতায় জ্বলছে প্রিয়দার দেহটা। রামালুকে বলি: পণ্ডিতমশাই কোথায়?

রামালু আঙুল দেখিয়ে দিল।

শ্মশান থেকে একটু দূরে দেশবন্ধুর স্মৃতিচিহ্ন। তারই পায়ের কাছে পদ্মাসনে বসে আছেন বৃদ্ধ তর্করত্ন। তাঁর কোলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে কাবুল। অন্ধ উদাস দৃষ্টি মেলে বৃদ্ধ তাকিয়ে আছেন জ্বলন্ত চিতাটার দিকে। ধীরে ধীরে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াই। অস্ফুটে কী যেন আবৃত্তি করছিলেন তিনি, ঠোঁট দুটি নড়ছে। আমার আগমন জানতে পারেন না। আমি নিঃশব্দে বসে পড়ি তাঁর পায়ের কাছে। একটু পরে বৃদ্ধের মন্ত্রোচ্চারণ শেষ হল; হাত দুটি কপালে স্পর্শ করে উদ্দেশে প্রণাম করলেন কাকে। তারপর আমার দিকে ফিরে বলেন: সতুর খবর আমি অনেকদিন রাখি না। কি করে কি হল বল তো?

বললুম: পণ্ডিতমশাই, সে সব কথা আলোচনা করবার সময়

Pathagar.net

অনেক পাব। আপনি আজ অত্যন্ত ক্লান্ত। আপনি বরং আমার সঙ্গে এবার চলুন, বিশ্রাম নেবেন চলুন। সায়ংসন্ধ্যা তো আজ নেই, কিছু মুখেও তো দিতে হবে।

বৃদ্ধ বললে : মাসের মধ্যে আট-দশদিন আমাকে উপবাস করতে হয়। সেজন্য ব্যস্ত হয়ো না। আগে আমাকে সব কথা খুলে বলতো।

আমি ইতস্তত করতে থাকি। কতদূর বলা উচিত? উনি কতদূর জানেন? সব কথা খুলে বলায় তো কোন লাভ নেই।

আমাকে ইতস্তত করতে দেখে বৃদ্ধ নিজে থেকেই বলেন : জান বাবা, আজ এই একফোঁটা ছেলেটার কাছে আমি হেরে গেছি!

আমি কোন প্রশ্ন করি না। আমার কৌতূহলী দৃষ্টিটা ওঁর ঘোলাটে চোখ দুটি দেখতে পাচ্ছে কিনা জানি না, তবু আমার দিকে ফিরে উনি বলতে থাকেন—এখানে আসার পর সবাই কাবুলকে ডাকলে—বাপের মুখাগ্নি করতে হবে তাকে। কিন্তু···

হঠাৎ মাঝপথেই উনি থেমে পড়েন।

বললুম : আমি জানি পণ্ডিতমশাই! প্রিয়দা সব কথা আমাকে বলেছিল···

তোমাকে কি বলব বাবা, আমি সর্বসমক্ষে বলতে পারলাম না, যে···

আবার থেমে পড়েন উনি।

আমি বাধা দিয়ে বলি : ও কথা থাক পণ্ডিতমশাই।

না, না, না! থাকবে না! শোন, আমি বলব। যে কথা আমি বলতে পারিনি ঐ একফোঁটা ছেলেটা তাই বলল! বললে : না আমি আগুন দেব না। আমার দিকে ফিরে বললে : আপনি যান। মা আমাকে বারণ করে দিয়েছেন!

ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন বৃদ্ধ। ভাঙা গলায় বলতে থাকেন : তোমাকে কি বলব বাবা, বলতে লজ্জায় আমি মাটিতে মিশিয়ে যাচ্ছি। তবু বলতে আমাকে হবেই। সারাজীবনে যা

pathagar.net

আমি করিনি আজ তাই করে ফেললাম। আমি মিথ্যার আশ্রয় নিলাম! ওদের বললাম—থাক, ও ছেলেমানুষ আমিই সতুর শেষকৃত্য করব! চল, আমিই মুখাগ্নি করছি!

আমি বলি: ভালই করেছেন!

দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বৃদ্ধ বলেন: না! না! ভাল করিনি! অন্যায় করেছি! আমি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছি! ও ছেলেমানুষ বলে নয় আমি যে অন্য কারণে ওকে এ কাজ করতে দিইনি—তা সর্বসমক্ষে আমি স্বীকার করতে পারিনি!

আমি চুপ করে থাকি।

বৃদ্ধ আবার বলেন: কিন্তু ওখানেই তো শেষ নয়! মুখাগ্নি করে আমি যখন ফিরে এলাম ও তখন ছোট হরিণ শিশুর মতো আবার আমার কোলে মুখ লুকালো। ওকে জড়িয়ে ধরে আমি যেন ভরতমুনির মতো জড়ভরত হয়ে গেলাম। অপাপবিদ্ধ ছেলেটি তখন আমাকে কি বললে জান বাবা? আমাকে প্রশ্ন করল—মা আমাকে কেন বারণ করেছিলেন? আমি···আমি ঐ শিশুর প্রশ্নের সত্য জবাব দিতে পারিনি। বলেছিলাম—তুমি ছোট কিনা তাই! আর তার জবাবে ও কি বললে জান?

আমি চুপ করে অপেক্ষা করি।

বৃদ্ধ নিজে থেকেই বলেন: ও আমাকে তিরস্কার করে বললে —না! আপনি মিছে কথা বলছেন! মা আমাকে বলেছেন। উনি ···উনি আমার বাবা নন!

হা-হা করে কেঁদে উঠলেন জ্ঞানবৃদ্ধ। বলেন: ঐ একফোঁটা ছেলেটা যেন চাবুক মারলে আমাকে। আজীবন ব্রহ্মবিদ্যার চর্চা করে আমি যে সত্য কথা উচ্চারণ করতে পারিনি সতুর স্ত্রী সত্যাশ্রয়ী জবালার মতো তা স্বীকার করেছে সন্তানের কাছে! মনে হল, কিসের অভিমান নিয়ে সরে আছি সংসারের একান্তে? কোন অধিকারে ওদের অস্বীকার করেছি?

pathagar.net

আবার একদল নূতন শ্মশানযাত্রী এল মহাশ্মশানে।

বল হরি—হরিবোল!

বৃদ্ধ উদ্দেশে কাকে যেন আবার নমস্কার করলেন। তারপর শান্ত সমাহিত কণ্ঠে আমাকে বলেন: আমাকে সব কথা খুলে বল তুমি।

অগত্যা যতদূর জানা ছিল সব কথা খুলে বললুম। প্রথমে মনে হয়েছিল কাজটা বুঝি খুবই শক্ত হবে। সব কথা বুঝি বলা যাবে না। সঙ্কোচে বাধবে। কিন্তু বলতে শুরু করে দেখি কাজটা মোটেই কঠিন নয়। ওঁর সান্নিধ্যে অকপট সত্য কথাই অনায়াসে বার হয়ে আসছে আমার মুখ থেকে। সত্যপ্রিয়দার জীবনের শেষদিকের অংশে যতটুকু আমার জানা ছিল সব খুলে বললুম। রঞ্জনার পরিণাম কি হবে এটাই ছিল তার শেষ দুশ্চিন্তা—সে কথাও অকপটে জানিয়ে দিই। সঞ্চয় সে কিছুই রেখে যেতে পারেনি; রঞ্জনা লেখাপড়াও কিছু শেখেনি, তার আত্মীয়স্বজনও কেউ কোথাও নেই। বললুম,—রঞ্জনা কোথায় থাকবে, কেমন করে মানুষ করে তুলবে কাবুলকে, কেমন করে দুটি অনাথের দিনান্তে দুটি অন্নের সংস্থান হবে—এই চিন্তাই শেষ সময়ে প্রিয়দার মৃত্যু-যন্ত্রণাকেও ছাপিয়ে উঠেছিল।

বলতে যখন বসেছি তখন সবই বলব। আমার কাহিনীর উপসংহার হিসাবে অবশেষে ব্যক্ত করি রঞ্জনার সঙ্গে আমার শেষ কথোপকথন। এটাই রঞ্জনার শেষ সম্বল। টাকাটা সে আমাকে ফেরত দিয়েছে; কিন্তু তা এখনও আছে আমার কাছে। লাডিয়াকে এখনও তা দিইনি আমি। সত্যদার বালিশের তলা থেকে উদ্ধার করে আনা চিঠিখানার উল্লেখ করতেও ভুল হল না আমার।

সব শুনে বৃদ্ধ বললেন: কই সে চিঠি, দেখি।

পকেট থেকে বার করে দিলুম কাগজখানা।

চোখের খুব কাছে এনে দেখতে থাকেন। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘনিয়ে এসেছে দিনান্তের তমশা। প্রিয়দার চিতার আগুনের আলোয় বৃদ্ধ পড়বার চেষ্টা করলেন সেই কাগজখানা। কিন্তু বৃথাই।

pathagar.net

তারপর বলেন : নাঃ সবই অন্ধকার। তুমি বাবা ভাল করে দেখে বল তো—একি সতুর হাতের স্বাক্ষর ?

সত্যের সংজ্ঞা নিয়ে এই সেদিনও তর্ক করেছি প্রিয়দার সঙ্গে। মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্। প্রিয়দা আমাকে ধমক দিয়ে বলেছিল : আমি ওকথা মানি না। 'তুমি ভাল', একথা বলার মধ্যে কোন মহত্ত্ব নেই; 'তুমি মন্দ' একথা বলতে পারার সাহস থাকা চাই! তার চিতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আজ দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে আমি দুলতে থাকি। কী বলব ?

বৃদ্ধ আমার হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলেন : বল, একি তার স্বাক্ষর ?

না। পারলুম না, কিছুতেই বলতে পারলুম না মিথ্যা কথা। বলি : আজ্ঞে, হাঁ, এ তারই সই!

উত্তেজনায় বৃদ্ধ আমার হাতে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলে ওঠেন : না! তুমি মিছে কথা বলছ।

আমি স্থির হয়ে বসে থাকি। মুখ নীচু করে। বুঝতে পারি, কী মর্মান্তিক আঘাতে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ এভাবে সংযম হারিয়েছেন! তাঁর সমস্ত দেহটা থরথর করে কাঁপছে। অনেকক্ষণ সাড়াশব্দ না পেয়ে ফের মুখ তুলে দেখি তাঁর দু চোখে নেমেছে জলের দুটি ধারা। আবার আমার হাত দুটি ধরে বলেন : কিছু মনে ক'র না বাবা! আমি সংযম হারিয়ে ফেলেছিলাম। না, আমি বুঝতে পারছি—তুমি মিছে কথা বলনি! কিন্তু সতু শেষ পর্যন্ত···

কি ভেবে আবার বলেন : নাঃ ওর দোষ নেই। এ আমার পাপ! হ্যাঁ, আমারই ভ্রান্তি! আমারই শাস্তি!

আমি বাধা দিয়ে বলি : পণ্ডিতমশাই, এদিকে অনেক দেরি হয়ে গেল যে—

উনি তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন : না, না। দেরি কিছুই হয়নি! ভুল ভুলই। তা সংশোধনের কখনও বিলম্ব হয় না—এখনও সময় আছে।

আমি বলি : না, আমি বলছিলাম, এবার যেতে হয়—



pathagar.net

হ্যাঁ, চল !

চিতায় গঙ্গাজল ঢেলে দিয়ে আমরা প্রিয়দার শেষ চিহ্নটুকু ধুয়ে মুছে দিলুম। বৃদ্ধ গঙ্গার দিকে মুখ করে প্রিয়দাকে সম্বোধন করে বললেন : বিমুখা বান্ধবাঃ যান্তি ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলম্ !

হ্যাঁ, এ দুনিয়ায় যারা তোমার বান্ধব ছিল তারা এই পর্যন্তই তোমার সহগামী হতে পারে। এখান থেকে তারা আবার ফিরে যাবে সংসারাশ্রমে—হে এককযাত্রী, এখন তোমার একলা চলার পথ শুরু হল। তোমার একমাত্র সাথী শুধু তোমার ধর্ম। ধর্মপুত্রের মতো ঐ 'ইতিগজের' স্বাক্ষরটুকু সমেত ধর্মের যষ্টিতে ভর দিয়ে মহাপ্রস্থানের পথে এগিয়ে যাও তুমি—

বৃদ্ধকে নিয়ে যখন ট্যাক্সি করে ফিরে এলুম মুখার্জি সাহেবের বাড়িতে তখন একপ্রহর রাত। হাত ধরে বৃদ্ধ তর্করত্নকে নামিয়ে নিয়ে এসে বসালুম বারান্দায়। রঞ্জনাও বেরিয়ে এসেছিল ট্যাক্সির শব্দে। কাবুল ছুটে এসে তার কোলে মুখ লুকালো। অগ্নিস্পর্শ ইত্যাদি সামান্য যা কিছু লোকাচার বাকি ছিল তাও প্রথামতো সারা হল। বৃদ্ধ ইঙ্গিতে আমাকে কাছে ডাকলেন, বলেন : সেই কাগজখানা দেখি।

আমি বলি, সেসব পরে হবে। আপনি মুখ হাত ধুয়ে নিন।

জল নিয়ে এসেছিল একজন। উনি আর আপত্তি করেন না। বারান্দার প্রান্তে এসে মুখ হাত ধুয়ে নেন।

রঞ্জনা এগিয়ে এসে আমাকে বলে : উনি আজ রাত্রে এখানেই থাকবেন।

কথাটা তর্করত্নের কানে গেল। বলেন : না, আমাকে এখনই রওনা হতে হবে। গৃহদেবতার কোন ব্যবস্থাই করে আসতে পারিনি তাড়াতাড়িতে।

রঞ্জনা আর কিছু বলে না, নতনেত্রে চুপ করে থাকে।

বৃদ্ধ এসে বসেন একটা আসনে। গৃহস্বামিনী মিসেস্ মুখার্জি একগ্লাস শরবত নিয়ে এসে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে। অন্ধ বৃদ্ধ

pathagar.net

বোধকরি তাঁর আগমনের কথা টের পাননি, তাই বলি : আপনার জন্য উনি একটু শরবত নিয়ে এসেছেন।

বৃদ্ধ বলেন : হ্যাঁ, তৃষ্ণাও পেয়েছে, কিন্তু কই, সত্যকাম কই ?

সত্যকাম ! সে কে ?

সতুর ছেলে !

বারান্দার ও-প্রান্তে মায়ের হাঁটু দুটি আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়েছিল অবোধ শিশু। রঞ্জনা তাকে একটু ঠেলে দেয়। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে কাবুল।

বৃদ্ধ বলেন মিসেস্ মুখার্জিকে : জলের পাত্রটা ওর হাতে দাও। তখনও বুঝতে পারিনি তার অর্থ। কাবুল শরবতের গ্লাসটা বাড়িয়ে ধরে। বৃদ্ধ তর্করত্নমশাই তার হাত থেকে গ্রহণ করলেন জলের পাত্রটা। হঠাৎ খেয়াল হল আমার। এদিকে ফিরে দেখি রঞ্জনার দু'চোখে নেমেছে জলের ধারা। আর কেউ না বুঝলেও সে বুঝতে পেরেছে এ অদ্ভুত আচরণের তাৎপর্য। এতক্ষণে সাহস করে এগিয়ে এসে বলে : কিন্তু অন্তত আজকের রাতটুকু আপনি বিশ্রাম করে যাবেন না ?

তর্করত্ন একহাতে জড়িয়ে ধরেছেন তাঁর সত্যকামকে। অন্য হাতে রঞ্জনাকে কাছে টেনে নিয়ে বলেন : না দিদি, এখনই বের হলে রাতের গাড়িটা ধরা যাবে। যাও চট করে তৈরী হয়ে নাও তোমরা।

বিস্ময়াহত রঞ্জনা বলে : আমরা ?

বৃদ্ধ তার জবাবে আমাকে বলেন : কই, সে কাগজখানা কই ?

মন্ত্রমুগ্ধের মতো টাইপকরা কাগজখানা বাড়িয়ে ধরি আমি। নব্বই বছরের নৈয়ায়িক কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন সেখানা।

দশরথ দাঁড়িয়ে ছিল পাশেই। তাকে বলেন : হাতে একটু জল দে তো বাবা !

দশরথ ঘটি থেকে জল ঢেলে দিল।

বৃদ্ধ নোংরা হাতটা ধুয়ে ফেললেন।

---

pathagar.net